আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

পড়ে থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে

বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই

আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ত্রৈমাসিক সাধনা।

আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে সাধনা ত্রৈমাসিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। বর্ত্তমান ত্রিসংখ্যক সাধনা হইতে গ্রাহকগণ ত্রৈমাসিক সাধনার আকার আয়তন কতকটা বুঝিতে পারিবেন। যাহাতে ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান সাধনা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে তৎপক্ষে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকিবে না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রিম মূল্য তিন টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার একমাস মধ্যে যাঁহারা সাধনার মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগকে নগদ ক্রেতা স্বরূপে গণ্য করা যাইবে। ত্রৈমাসিক সাধনার প্রতিখণ্ডের নগদ মূল্য এক টাকা।

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
যোড়াসাঁকো।
১৫ ভাদ্র ১৩০২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র।

১৩০২ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক।

সাধনা।

ঝাঁশির মহারাণী শ্রীমতী লক্ষ্মী বাই।*

এত দিনের পর, প্রখ্যাত বীরাঙ্গনা মহারাণী লক্ষ্মীবাইর একটী প্রামাণিক ও আনুপূর্ব্বিক জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়ায়, আমাদের একটী জাতীয় অভাব মোচন হইল। গ্রন্থটী মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকার মহারাণীর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে, ইংরাজী গ্রন্থ, দেশীয় গ্রন্থ সরকারী কাগজপত্রাদি যেখানে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বার্ত্তা পাইয়াছেন তৎসমুদয় তন্ন তন্নরূপে বিচার করিয়া, স্থানীয় কিম্বদন্তী হইতে ও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত রাণীর অনুচরবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের কথিত বিবরণ হইতে সমস্ত তথ্য স্বাধীনভাবে সংগ্রহ করিয়া এবং ঘটনাস্থলগুলি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া, অতীব নিরপেক্ষভাবে ও প্রভূত শ্রমসহকারে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাণীর সপত্নী মাতা চিমাবাই ও রাণীর দত্তক পুত্র দামোদর রাও—ইঁহাদের নিকট হইতে গ্রন্থকার যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এই ইতিহাসের প্রমাণ-বল আরও দৃঢ়ীভূত ও ইহার মূল্য অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে অশ্বারূঢ়া, বীরবেশধারিণী মহারাণী - তাঁহার দত্তকপুত্র দামোদর রাও—ইংরাজ সেনাপতি সর্ হ্যু রোজ ও লর্ড ক্যানিং - ইঁহাদের চিত্র

* "ঝাঁশী সংস্থানচ্যা মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হ্যাচে চরিত্র"—দত্তাত্রয় বলবন্ত পারসনীস প্রণীত।

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কন ও বহিরাবরণও অতি পরিপাটী। আমরা এই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া রাণীর জীবনের মূল ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবৃন্দের নিকট সাদরে অর্পণ করিতেছি।

ঝাঁশি-সংস্থান। (১)

রাণীর জীবনের ঘটনাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ঝাঁশির পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কতকটা জানা আবশ্যক। ঝাঁশি-সংস্থান বুণ্ডেলখণ্ডের অন্তর্ভূত। প্রথমে ইহা বোরচ্ছার রাজা বীর সিংহ দেবের :শাসনাধীনে ছিল। দিল্লিপতি আকবর বাদশাহের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী আবুল ফজলকে বীর সিংহদেব নিহত করায়, আকবর তাঁহার শাসনের জন্য স্বীয় পুত্র সেলিমকে বুণ্ডেলখণ্ডে প্রেরণ করেন। বীর সিংহদেব ভয়ে পলায়ন করায়, বুণ্ডেলখণ্ড মোগলরাজের হস্তগত হয়। পরে, সেলিম (জাহাঙ্গীর) সিংহাসনারূঢ় হইলে, বীর সিংহের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহাকে বুণ্ডেলখণ্ড প্রত্যর্পন করেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে, শাজাহান বাদশাহের শাসন-কালে, এই দুর্বৃত্ত বীর সিংহদেব, মোগলরাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশে লুটপাট আরম্ভ করায়, তাঁহার জায়গীর পুনরায় বাজেয়াপ্ত হয়। সেই সময় হইতে ১৭০৭ পর্য্যন্ত ঝাঁশি প্রদেশ দিল্লি বাদশাহের শাসনাধীনে ছিল। তদনন্তর, বাহাদুর শা দিল্লির সিংহাসনে অধি-রূঢ় হইলে, তিনি এই ঝাঁশি প্রদেশ হিন্দু রাজা ছত্রশালকে জাই-গার স্বরূপ দান করেন। ছত্রশালের অভ্যুদয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া মালোয়ার মুসলমান সুবেদার ও আলাহাবাদের নবাব তাঁহার রাজ্য বারম্বার আক্রমণ করিতে লাগিল।

(১) ইংরাজী শব্দ state অর্থে "সংস্থান" শব্দ মারাঠী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাজা ছত্রশাল এই সময়ে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হওয়ায় প্রবল যবন সরদারদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে স্বকীয় উদ্ধার সাধনের জন্য, মহারাষ্ট্রাধিপতি বাজীরাও পেশোয়ার শরণাপন্ন হইলেন। পেশোয়া করুণা-পরবশ হইয়া ছত্রশালের সাহায্যে যাত্রা করিলেন, এবং মুসলমান সরদারদিগকে পরাভূত করিয়া ছত্রশালকে স্বরাজ্যে প্রতিস্থাপিত করিলেন। ছত্রশাল কৃতজ্ঞ হইয়া, বুণ্ডেলখণ্ডের কতকগুলি প্রদেশ, পেশোয়াকে নজর-স্বরূপ দান করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, মৃত্যুকালে বাজীরাওকে স্বীয় পুত্র স্বরূপ গণ্য করিয়া তিন কোটী টাকা আয়ের একটী ভূসম্পত্তি দান করিয়া গেলেন। ইহার অন্তর্ভূত ২০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ঝাঁশি-সংস্থান। পরে, ১৭৫৯ অব্দে ঝাঁশির পূর্ব্বাধিকারী “গোসাওয়ী” রাজারা বিদ্রোহী হইয়া পেশোয়ার স্থবেদারকে পরাভূত করিল। পেশোয়া এই সংবাদ শুনিবামাত্র রঘুনাথ হরি নেবালকর নামক একজন পরাক্রান্ত মারাঠী সরদারকে বুণ্ডেলখণ্ডে পাঠাইলেন। ইনি “গোসাবী” রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া তথায় পুনর্ব্বার পেশোয়ার আধিপত্য স্থাপন করিলেন। পেশোয়া ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ঝাঁশীর স্থবেদারী পদ রঘুনাথ হরি নেবালকরকে বংশপরম্পরাক্রমে প্রদান করিলেন। এই রঘুনাথ রাও হরি নেবালকর—ইনি মহারাণী লক্ষ্মীবাইর ভর্ত্তৃ-বংশের আদিপুরুষ।

রঘুনাথ রাওর বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইলে, তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শিবরাও ভাউকে ঝাঁশির স্থবেদারী পদে স্থাপন করিলেন। শিবরাও ভাউ ইনিও একজন বীর পুরুষ। এই সময়ে দ্বিতীয় বাজীরাওর শাসনকালে—মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যসূত্র শিথিল হইয়া পড়ায়, পেশোয়ার অধীনস্থ স্থবেদারেরা নিজ নিজ অধি-

কারের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। বুণ্ডেলখণ্ডে, শিবরাও ভাউও সেই পথ অনুসরণ করেন। এই সময়ে, "বসই" (Bassein) সন্ধির সুযোগে মারাঠী সাম্রাজ্য মধ্যে ইংরাজদিগের চঞ্চুপ্রবেশ হইয়াছিল মাত্র তখনও তাঁহারা প্রবল হইতে পারেন নাই। তখন শিন্দে হোলকার নাগপুরকর ভোঁসলে প্রভৃতি রণশূর মারাঠী সরদারদিগের জোট ভাঙ্গিবার জন্য, ওএলেস্‌লি, লেক্‌ প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ, বাহ্যাৎকারে পেশোয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বুণ্ডেলখণ্ডের সুবেদার শিবরাও ভাউ ইঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। সেই অবধি, ইংরাজ সরকার ঝাঁশি-সংস্থানের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর শিবরাও ভাউ স্বীয় পৌত্র রামচন্দ্র রাওর হস্তে ঝাঁশি রাজ্য ন্যস্ত করিয়া, শ্রীক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রস্থান করেন। এই সময়ে পুণা নগরস্থ পেশোয়া বিলাসের গভীরতম রসাতলে নিমগ্ন থাকায়, মহারাষ্ট্র রাজ্যের সমস্ত আধিপত্য অল্পে অল্পে ইংরাজের হস্তগত হইতেছিল। রামচন্দ্র রাও যখন ঝাঁশির গদিতে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প ছিল, সুতরাং তাঁহার হইয়া তাঁহার মাতুশ্রী সখুবাই ও সংস্থানের পুরাতন দেওয়ান রাও গোপাল রাউ, ইহাঁরাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮১৭ অব্দে সুবেদার রামচন্দ্রের তরফে গোপাল রাও ভাউ এবং ব্রিটিশ সরকারের তরফে পোলিটিকেল সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জন ওয়াকোপ—ইঁহাদের মধ্যে একটা সন্ধিপত্র লেখাপড়া হইল। রাও রামচন্দ্র বংশপরম্পরাক্রমে ঝাঁশি সংস্থানের অধিকারী, এই কথা ব্রিটিশ সরকার এই সন্ধিপত্রে স্বীকার করিলেন এবং উভয় সরকার পরস্পরের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিপদাপদে পরস্পরের সাহায্য করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। এই সন্ধিপত্রের

পণানুসারে রামচন্দ্র রাও বাস্তবিকই ইংরাজদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ ইংরাজ সরকার ১৮৩২ অব্দে একটা দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া, ঝাঁশির সুবেদারকে "মহারাজাধিরাজ" ও "ফিদবী বাদশাহা জামুজা ইংগ্লস্তান" (মহিমান্বিত ইংলণ্ডেশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক) এই উপাধি অর্পণ করিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ইহাঁকে ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ধারণের অধিকার প্রদান করিলেন এবং রামচন্দ্রের অনুরোধ অনুসারে ঝাঁশির কেল্লার উপর ব্রিটিশ পতাকা "য়ুনিয়ন জ্যাক্" স্থাপন করিবার অনুমতি দিলেন। রামচন্দ্র রাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী স্বীয় ভাগিনেয় কৃষ্ণরাও নামক একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অশাস্ত্রীয়তা মূলে ইহার দত্তক বিধান অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্রের খুল্লতাতের এক ঔরসপুত্র তৃতীয় রঘুনাথ রাওকে ঝাঁশির গদিতে স্থাপন করিলেন।

তৃতীয় রঘুনাথ রাও অত্যন্ত দুর্ব্যসনী ছিলেন। তিনি ভোগ বিলাসে বিপুল অর্থ অপব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া, ঝাঁশির অধিকাংশ ভূসম্পত্তি গোয়ালিয়র ও বোর্ছার মহাজনদিগের নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার, ১৮৩৭ অব্দে, ঝাঁশি সংস্থানের কার্য্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তৃতীয় রঘুনাথ রাওর মৃত্যু হইলে, ঝাঁশির গদি অধিকার করিবার জন্য তিন চারিজন দাবীদার খাড়া হইল। তন্মধ্যে, ব্রিটিশ সরকার শিবরাও ভাউর পুত্র গঙ্গাধর রাওর দাবী মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকেই গদিতে স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঝাঁশি সংস্থানের ঋণ পরিশোধ না হয় সে পর্য্যন্ত ইংরাজ সরকারের নিযুক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। তদনুসারে ১৮৪২ অব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত ঋণ কর্জ্জের হিসাব নিষ্পত্তি

হইল; এবং ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৪২ অব্দের মধ্যে বুণ্ডেলখণ্ডের পোলিটিক্যাল এজেণ্ট—উইলিয়াম হেন্‌রি স্লীম্যান সাহেব, গঙ্গাধর রাওর সহিত একটা লেখাপড়া করিয়া, বুণ্ডেলখণ্ডস্থ ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২,২৭,৪৫৮ টাকা আয়ের একটী প্রদেশ লইয়া, গঙ্গাধর রাওকে ঝাঁসির আধিপত্য প্রদান করিলেন। এই মহারাজা গঙ্গাধর রাও, মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেবের ভাবী পতি।

মহারাণী লক্ষ্মীবাই।

মহারাষ্ট্র মধ্যে সাতারার নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণানদী তীরে 'বাই' নামক একটী গ্রাম আছে। তথায় কৃষ্ণরাও নামক একটী 'কর্হাডে' ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি পেশোয়া-সরকারাধীনে মামলৎদারী কাজ করিতেন। বলবন্ত নামক ইহাঁর একটি বীর্য্যশালী পুত্র ছিল। মহারাষ্ট্র-প্রভু শ্রীমন্ত পেশোয়া, কৃপা করিয়া ইহাঁকে আপনার খাশ ফৌজের মধ্যে সরদারী পদ প্রদান করেন। বলবন্তের দুই পুত্র মোরোপন্ত ও সদাশিব রাও। ইহাঁদের মধ্যে, মোরোপন্ত, পিতার সঙ্গে পুণায় বাস করিতেন। ইনি, শ্রীমন্ত দ্বিতীয় বাজীরাও সাহেবের সহোদর চিমাজী আপ্পা সাহেবের প্রসন্ন দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। ১৮১৮ অব্দে শ্রীমন্ত বাজীরাও ম্যাল্‌কম সাহেবের নিকট সমস্ত রাজ্যের ত্যাগ-পত্র লিখিয়া দিয়া, ৮ লক্ষ টাকার বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া অবশিষ্ট জীবিত কাল ব্রহ্মাবর্ত্ত (বিঠুর) প্রদেশে অতিবাহিত করিবেন, এইরূপ স্থির করেন। এই সময়ে, আপ্পা সাহেব দক্ষিণ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পুণার রেসিডেণ্ট সাহেব, তাঁহাকে বলিলেন, "দশ বিশলক্ষ টাকার প্রদেশ তোমাকে দিতেছি, তুমি পুণা-সংস্থানের সংরক্ষণ-ভার গ্রহণ কর।"

কিন্তু ইহাতে চিমাজী অপ্পা সাহেব সম্মত হইলেন না; পরে তিনি কাশীবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ইংরাজ-সরকার তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথা অনুসারে পেশোয়া-বাজীরাওর ছয়মাস কাল পরে, ইনিও রাজ্যত্যাগী হইয়া কাশীধামে গিয়া বাস করিলেন। ইঁহার সমভিব্যাহারে যে সকল লোকজন যা[illegible] তাহার মধ্যে মোরোপন্ত একজন। মোরোপন্তও সপরিবারে কাশীধামে গিয়া বাস করিলেন। ইনি শ্রীমন্ত আপ্পাজীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া ৫০টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। মোরোপন্তের পত্নীর নাম ভাগীরথী বাই। ইনি অতি সাধ্বী ও পতিপ্রাণা ছিলেন। ইনি, কাশীধামে অবস্থিতি কালে ১৮ নভেম্বর ১৮৩৫ অব্দে একটী কন্যারত্ন প্রসব করেন; এই কন্যার নাম—মনুবাই। বলা বাহুল্য, ইনিই ঝাঁশির ভাবী মহারাণী অতুলবীর্য্যবতী শ্রীমতী লক্ষ্মী বাই।

মনুবাইর বয়ঃক্রম তিন ও চারিবর্ষ না হইতেই ইহাঁর মাতুশ্রী পরলোকবাসিনী হইলেন। এই সময়ে শ্রীমন্ত আপ্পা সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় মোরোপন্ত কাশীধাম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। আপ্পাজীর সহোদর পেশোয়া বাজীরাও সাহেব, স্বীয় ঔদার্য্যগুণে মোরোপন্তকে আপনার নিকট আশ্রয় দিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তে, মোরোপন্ত ও শ্রীমন্ত পেশোয়ার বাসস্থান প্রায় সংলগ্ন ছিল। মনুবাই পিতার অত্যন্ত আদরিণী ছিলেন। দুর্দৈবক্রমে মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, কন্যার সমস্ত রক্ষণভার পিতার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। পিতৃসন্নিধানে থাকা প্রযুক্ত মনুবাইকে প্রায় অষ্টপ্রহর পুরুষবর্গের মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইত। এই দিব্যশ্রী ফুল্ল-কপোল বালিকাটী পেশোয়ার অনুচর বর্গ সকলেরই আদরের সামগ্রী ছিল। ইহার উজ্জ্বল বিশালনেত্র ও গৌরবর্ণ মুখকান্তি

দেখিয়া সকলেরই আনন্দোদয় হইত। বাজীরাও সাহেবের অধীন রামচন্দ্র পন্ত সুবেদার, বাবাভট্ প্রভৃতি প্রমুখ-মণ্ডলী এই বালিকার সতেজবৃত্তি অবলোকন করিয়া কৌতুক সহকারে ও আদর ভরে ইহাকে "ছবেলী" (ময়না) বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীমন্ত বাজীরাও পেশোয়ার দত্তকপুত্র নানাসাহেব ও রাওসাহেব এই দুইটি বালক এই সময় অল্পবয়স্ক হওয়ায় নানাপ্রকার খেলাধুলায় প্রবৃত্ত হইত—এই বালিকাটীও তাহাদের খেলায় যোগ দিবার উপক্রম করিত। এই বালবৃন্দের লীলা অবলোকন করিয়া শ্রীমন্ত পেশোয়া অত্যন্ত আনন্দ উপলব্ধি করিতেন। ঝাঁশিরাণীর সপত্নী মাতুশ্রী—শ্রীমতী চিমা বাই, রাণী সাহেবের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এইরূপ বলেন "বাল্যকালে, বিবাহের পূর্ব্বে, ঘুড়িওড়ানো, চাকা-চালানো, মেয়েদের মধ্যে রাণী সাজা, কাহাকে দাসী করা, কাজ না করিলে দণ্ড করা ইত্যাদি বাল্যখেলা রাণীর পছন্দসই ছিল।" নানাসাহেব ও রাওসাহেব—ইহাঁদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য, তৎকালের পদ্ধতি অনুসারে, একজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। এই শিক্ষক ইহাঁদিগকে বর্ণপরিচয়ে শিক্ষা দিতেন। এই সময়ে, মনুবাই ইহাঁদের সান্নিধ্যে থাকাপ্রযুক্ত তাহারও কতকটা বর্ণ-পরিচয় হইয়াছিল। নানাসাহেব ও রাওসাহেব যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইতেন, মনুবাইও তাঁহাদের সঙ্গে যাইত। নানাসাহেবকে তলবার খেলা অভ্যাস করিতে দেখিয়া মনুবাইও তলবার ঘুরাইতে চেষ্টা করিত। নানাসাহেব হস্তি আরোহণ করিলে, মনুবাইও হাতিতে চড়িবার জন্য উৎসুক হইত। শ্রীমন্ত বাজীরাওর নিকট তখন একটী মাত্র হস্তি ছিল। একদিন পেশোয়া বাজীরাও, বালিকাকে লইয়া হাতির উপর বসাইতে নানাসাহেবদিগকে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই কথা শুনে না, বালিকাও জেদ ছাড়ে না। এই

সময়ে, মোরোপন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মনুবাইকে বলিল "তোর অদৃষ্টে হাতি কোথা হইতে আসিবে?" এই কথা শুনিয়া সেই উজ্জ্বল-চেতা বালিকা উত্তর করিল "এক ছেড়ে দশটা হাতি আমার ভাগ্যে আছে।" এইরূপে তেজস্বী রাজকুমারদিগের সংসর্গে থাকিয়া বালিকা মনুবাইর বিবিধ পুরুষোচিত শিক্ষা লাভ হইয়াছিল।

মনু বাইর বিবাহের বয়স উপস্থিত হইলে, তাহার পিতা মোরোপন্ত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া যোগ্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এক দিন, তিনি কন্যার জন্ম নক্ষত্র ও গ্রহাদির ফলাফল জানিবার জন্য তাহার জন্ম-পত্রিকা কোন উৎকৃষ্ট গ্রহাচার্য্যকে দেখাইতে মনস্থ করিলেন। দৈবক্রমে সেই সময়ে জ্যোতিঃশাস্ত্র-পটু বেদশাস্ত্রবিদ্ তাতা-দীক্ষিত নামক এক পণ্ডিত শ্রীমন্ত বাজীরাও সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মোরোপন্ত স্বীয় কন্যার জন্ম পত্রিকা তাঁহার সম্মুখে আনিয়া, তাহার ফলাফল গণনা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কোষ্ঠী দেখিয়া আচার্য্য ঠাকুর বলিলেন, কন্যার গ্রহ ফল এতাদৃশ শুভদায়ক যে, সে একদিন রাণী পদবী প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মোরোপন্ত ইহাতে বিশেষ হর্ষ প্রদর্শন না করিয়া ঝাঁশি প্রদেশে কোন যোগ্য বর পাওয়া যাইতে পারে কি না, সেই বিষয়ে দীক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষী পুনর্ব্বার বলিলেন, "এই বালিকা নিশ্চয়ই রাণী হইবে। সম্প্রতি ঝাঁশির মহারাজ শ্রীমন্ত গঙ্গাধর রাও বাবা সাহেবের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। সেইখানে যদি এই কন্যার বিবাহ ঘটিয়া যায়, তবেই গ্রহের ফলাফল সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে।" এই আশাপ্রদ কথা শুনিয়া মোরোপন্ত শ্রীমন্ত বাজীরাও সাহেবের দ্বারা ঝাঁশির মহারাজ গঙ্গাধর রাওর সমীপে এই বিবাহের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত, জ্যোতিষীকে নিযুক্ত করিলেন। তাত্যা-

দীক্ষিত ঝাঁশির সংস্থানিক গঙ্গাধর রাও বাবা সাহেবের নিকট গিয়া এই কন্যার সৌন্দর্য্যমহিমা ও গ্রহানুকূল্যের ব্যাখ্যা করিলে, তিনি "বিবেচনা করিয়া দেখিব" এই মাত্র উত্তর করিলেন। পরে, বাজিরাওর সাগ্রহ মধ্যস্থতা-প্রভাবে তিনি কন্যাকে দেখিবার জন্য সংস্থানের কোন সভাসদমণ্ডলীকে ব্রহ্মাবর্ত্তে পাঠাইলেন। তাহারা প্রত্যাগত হইয়া বাবা সাহেবের নিকট কন্যার গুণানুকীর্ত্তন করায় গঙ্গাধর রাও বাবা সাহেব কন্যার পাণিগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিবাহের দিনও স্থির হইল।

যে দিন সমারোহ সহকারে নববধূ রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে ঝাঁশির সকল লোকই বলিতে লাগিল, ইনি যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই অবধি তিনি লক্ষ্মীবাই নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। সামান্য বালিকা মনুবাই ঝাঁশির মহারাণী হইবে, ইহা কে জানিত!

"যন্মনোরথশতৈরগোচরং ন স্পৃশন্তি কবয়োঽপি যদ্গিরা।
স্বপ্নবৃত্তিরপি যত্র দুর্লভা লীলয়ৈব বিদধাতি তদ্বিধিঃ"॥

বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় মনুবাইর প্রগল্‌ভতার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। বিবাহের সময় নব পরিণীত বধূ ও বরের পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিবার রীতি আছে। তদনুসারে পুরোহিত গ্রন্থি বাঁধিবার উদ্যোগ করিলে, মনুবাই পুরোহিতকে বলিল "ভাল করিয়া দৃঢ়রূপে গ্রন্থিবন্ধন কর"—এই কথা শুনিয়া সেই সময়ে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, কালক্রমে রাণীর একটী পুত্র সন্তান হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনমাসের মধ্যেই করাল কাল তাহাকে হরণ করিল। এই পুত্রশোকের আঘাতে মহারাজ গঙ্গাধর রাও রোগগ্রস্ত হইয়া, ক্রমে আসন্ন দশায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে

তিনি দত্তকগ্রহণেচ্ছু হইয়া স্বীয় বংশের বসুদেব রাও নেবালকরের পুত্র আনন্দরাওকে, যথাবিধি দত্তক বিধানানুসারে মহাসমারোহ সহকারে, দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। পরে ইহার নাম, দামোদর রাও গঙ্গাধর রাও রাখা হইল। মহারাজা, এই দত্তক-গ্রহণ সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত বুণ্ডেলখণ্ডের পোলিটিক্যাল রেসিডেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে, বংশ-পরম্পরাক্রমে ঝাঁশির মালিকী সত্ব বজায় থাকিবে বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র রাওর সহিত ইংরাজ সরকারের কৃত সন্ধিপত্রে যে উল্লেখ ছিল, সে কথাও এই পত্রের মধ্যে একস্থলে ছিল। এইরূপে মহারাজা, স্বীয় উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। এদিকে, বুণ্ডেলখণ্ডের পোলিটিকেল এজেণ্ট, রাজার গৃহীত দত্তকপুত্র ঝাঁশির প্রকৃত উত্তরাধিকারী কি না এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া হিন্দুস্থান সরকারের নিকট স্বীয় মন্তব্য-লিপি লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার মধ্যে এইরূপ সূচনা ছিল যে, ঝাঁশিসংস্থান খাস করিয়া লইবার অধিকার ব্রিটিশ সরকারের আছে এবং এই অবসর ত্যাগ করা উচিত নহে। তবে, ঝাঁশি খাস করিয়া লইলে, রাণীকে ৫০০০, টাকার মাসিক বৃত্তি দিলে ভাল হয় ইত্যাদি। যখন এই রিপোর্ট হিন্দুস্থান সরকারের নিকট প্রেরিত হয়, তখন লাট সাহেব ডাল-হৌসী অযোধ্যায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; সেই জন্য ছয় মাস কাল এই পত্রের কোন উত্তর আসে নাই। মহারাণী লক্ষ্মী বাইর সম্পূর্ণ আশা ও ভরসা ছিল যে, কৃপালু ব্রিটিশ-সরকার শ্রীমন্ত দামো-দর রাওর দত্তক-বিধান মঞ্জুর করিয়া তাহাকেই ঝাঁশির গদিতে স্থাপন করিবেন। এই সম্বন্ধে রাণী সাহেবও হিন্দুস্থান সরকার সমীপে এক পত্র প্রেরণ করেন। লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৪ অব্দে

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে পর ইংরাজ সরকারের পররাষ্ট্রীয় সেক্রেটরি জে-পি-গ্রাণ্ট সাহেব ঝাঁশি সংস্থানের সমস্ত বৃত্তান্ত ও ইংরাজ সরকারের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করিলেন। এই রিপোর্টের মুখ্য তাৎপর্য্য, ঝাঁশি সংস্থান খাস করিয়া লওয়া। এই রিপোর্টের উপরেই ভর করিয়া লাট সাহেব স্বীয় আদেশ মন্তব্য প্রচার করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই. যেহেতু ঝাঁশি স্বাধীন রাজ্য নহে—ইংরাজ সরকারের অধীনস্থ মাণ্ডলিক সংস্থান মাত্র অতএব সার্ব্বভৌম অধিপতি ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত মহারাজার দত্তকগ্রহণ করিবার অধিকার নাই। এবং যেহেতু গঙ্গাধর রাওর যে সকল পূর্ব্বপুরুষের সহিত ব্রিটিশ সরকারের বাধ্য-বাধকতা সম্বন্ধ ছিল তাহাদের বংশের কোন সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী নাই অতএব এই দত্তক বিধান মঞ্জুর করিয়া ঝাঁশির গদি স্থায়ী রাখিতে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য নহেন। এতদ্ব্যতীত ঝাঁশি সংস্থান ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ভুক্ত হইলে সমস্ত বুণ্ডেলখণ্ডের রাজ্য ব্যবস্থা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে এবং ব্রিটিশ সুশাসনে সমস্ত প্রজাবর্গেরও কল্যাণ হইবে।

অতএব রাণীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫০০০ টাকার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া ঝাঁশি সংস্থান খাস করিয়া লওয়া হউক।

প্রকৃত কথা লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থান ও জাইগীর তখনও ব্রিটিশ সরকারের অধীন হয় নাই তাহাদিগকে যেন-তেন-প্রকারেণ ব্রিটিশ রাজ্য-ভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা হইয়াছিল। এই সর্ব্বগ্রাসী নীতি অবলম্বন করিলে বচন-ভঙ্গরূপ মহাপাতক হইবে

এবং ইংরাজের শুভ্র যশে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে ড্যুক অফ ওএলিংটন প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিপটু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এইরূপ বারম্বার প্রতিপাদন করা সত্বেও লর্ড ডালহৌসী তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি প্রথমে সাতারায় ছত্রপতি শহাজি মহারাজের গৃহীত দত্তক নামঞ্জুর করিয়া সাতারা আত্মগ্রাস করিলেন। পরে নাগপুর ও তাঞ্জোরের এই গতি হইল। অবশেষে ঝাঁশি সংস্থানের উপর তাঁহার উদ্যত বজ্র সবেগে আসিয়া পড়িল।

আজ হইতে ঝাঁশি-সংস্থান খাস হইল এই আদেশ-লিপি ও বিজ্ঞাপন লইয়া মেজর এলিস সাহেব রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। দরবার-মহলে চীক-পর্দ্দার অন্তরালে রাণী সাহেবের সহিত তাঁহার ভেট হইল। এলিস সাহেব বিজ্ঞাপন পড়িয়া শুনাইলেন এবং "আপনাকে পূর্ণ পরিমাণে বৃত্তি দেওয়া হইবে ও আপনার যথাযোগ্য মান মর্য্যাদা পালিত হইবে" এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন। কিন্তু ঝাঁশি খাস করিয়া লওয়া হইল এই দারুণ বার্ত্তা রাণী শুনিবামাত্র একেবারে বজ্রাহত হইলেন। ইহা দেখিয়া এলিস সাহেব তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বিদায় প্রার্থনা করিলে রাণী সাহেবের সুমধুর কণ্ঠ হইতে এই করুণোক্তি সবেগে উচ্ছ্বসিত হইল; "মেরা ঝাঁশি দেঙ্গা নেই"!

ঝাঁশি ব্রিটিশ রাজভুক্ত হইয়া গেলে, বুণ্ডেলখণ্ডের পোলিটিকেল এজেণ্ট ম্যালকম সাহেব, হিন্দুস্তান সরকারের পর-রাষ্ট্রীয় সেক্রেটরিকে ঝাঁশির রাণী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া এক মন্তব্য-লিপি লিখিয়া পাঠাইলেন। সেই প্রস্তাবগুলির স্থূল মর্ম্ম এই: (১) রাণীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত রাণীকে ৫০০০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়। (২) রাণী সাহেবের বাসের জন্য ঝাঁশির

রাজবাটী তাঁহাকে অর্পণ করা হয়—এবং আরও বলিলেন, সেই রাজবাটী রাণীর নিজ সম্পত্তি, এইরূপ বুঝিতে হইবে। (৩) মহা-রাজা গঙ্গাধর রাওর ইচ্ছানুসারে, সংস্থানের জহরৎ ও তহবিলের অবশিষ্ট নগদ টাকা হিসাব করিয়া রাণী সাহেবকে দেওয়া হয় এবং রাণীর যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব আছে তাহাদিগের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া একটা তালিকা প্রস্তত করা হয়। এই পত্রের উত্তরে লর্ড ডেলহৌসি তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন; এবং ম্যালকম সাহেবের অন্যান্য প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া কেবল এক বিষয়ে অনভিমত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, সংস্থানের জহরৎ ও নিজস্ব সম্পত্তি দত্তক পুত্রের প্রাপ্য, দত্তকপুত্র যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় তাবৎ তাহা গচ্ছিত থাকিবে। আইনানুসারে রাজার গৃহীত দত্তকপুত্র রাজ্যাধিকারী না হইলেও, মহারাজের নিজস্ব সম্পত্তির অধিকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পত্র পাইয়া ম্যালকম সাহেব, কেল্লার অভ্যন্তরস্থ রাজবাটী হইতে জহরৎ ও নগদ তহবিলের টাকা উঠাইয়া আনিয়া সহরের রাজবাটীতে গিয়া রাণী সাহেবের জিম্মা করিয়া দিলেন এবং রাণীকে সহরের রাজ-বাটী ছাড়িয়া দিয়া, কেল্লার রাজবাটী ও সমস্ত কেল্লা, ইংরাজ সরকারের তরফে অধিকার করিলেন।

এদিকে ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়নিষ্ঠার উপর রাণী সাহেবের অগাধ বিশ্বাস থাকায়, তিনি এই সামান্য ৫০০০ টাকার বৃত্তি গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন এবং সমস্ত ঝাঁশি-সংস্থান যাহাতে পুনর্ব্বার ফিরিয়া পান তজ্জন্য বিধিমতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী ও আর এক জন য়ুরোপীয়কে ৬০০০০৲ টাকা দিয়া এবং তৎসঙ্গে একটা দরখাস্ত দিয়া, বিলাতের কোর্টঅফ্ ডিরেক্টরের নিকট পাঠাইয়া

দিলেন। এই দরখাস্তের মধ্যে, একস্থলে এইরূপ লেখা হয় যে, "ইংরাজ সরকার আমাদিগকে ঝাঁশি সংস্থান দান করেন নাই; পেশোয়ার রাজত্ব কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেক পরাক্রমের কার্য্য করায়, তাঁহাদের নিজ বাহাদুরী বলেই উহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—অতএব উহাতে ইংরাজ সরকারের কোন অধিকার নাই।" এই দরখাস্ত লইয়া, ঐ দুই মোক্তার বিলাতে গিয়া যে কি করিলেন, তাহার বার্ত্তা কিছুই জানা যায় না। নানাসাহেবের প্রেরিত মোক্তার আজিম উল্লা খাঁ বিলাতে গিয়া মজা উড়াইয়া ও রুশীয় সৈন্যের সামিল হইয়া সিবাষ্টপুলের লড়াই দেখিয়াছিলেন, এই মাত্র সংবাদ পাওয়া যায় কিন্তু রাণীসাহেবের প্রেরিত মোক্তারদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহা হউক ইতিমধ্যে, কোর্ট অব ডাইরেক্টর, হিন্দুস্থান-সরকারের অবধারিত প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি দিয়া, লাটসাহেবকে পত্র লিখিলেন। এদিকে রাণী সাহেবের তখনও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার মোক্তারেরা বিলাতে তাঁহার দাবী সম্বন্ধে যথাসাধ্য আন্দোলন করিতেছে। উহা যে বৃথা আশা, অন্তঃপুরচারিণী মহারাণী তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ঝাঁশি ইংরাজের অধীন হইলে, শ্রীমান সাহেব ঝাঁশির কমিশনর পদে প্রথম নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে, ব্রিটিশ সরকারের মিত্র শিবরাও ভাউর ঝাঁশি-সংস্থান তাঁহার উত্তরাধীকারীদিগের হস্ত হইতে চিরকালের মত বিচ্যুত হইল এবং

"ইদমেব নরেন্দ্রাণাং স্বর্গদ্বারমনর্গলং
যদাত্মনঃ প্রতিজ্ঞা চ প্রজা চ পরিপাল্যতে"

এই নীতি সর্ব্বথা পরিপালিত না হওয়ায় পরিণামে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইল তাহা কেনা জানে! ঝাঁশির এইরূপ শোচ-

নীয় অবস্থা দেখিয়া, "আরাধনা-বলে সর্ব্বফল মেলে" রামদাস স্বামীর এই উক্তিতে রাণী কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা অনুভব করিয়া স্বীয় অবশিষ্ট জীবিতকাল ঈশ্বরারাধনায় অতিবাহিত করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। পতির পরলোক প্রাপ্তির পর কিছু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিতান্ত ঔদাস্য উপস্থিত হইয়াছিল! তিনি রাত্রি চারিটার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, স্নানাদি সমাধা করিয়া আট ঘটিকা পর্য্যন্ত পূজার্চ্চনা করিতেন। তদনন্তর পোষাক পরিয়া রাজবাটীর অঙ্গনে চারি পাঁচটা ঘোড়া দৌড় করাইতেন, এগারটা বাজিলে নিত্যনিয়মিত দানক্রিয়া করিয়া আহার করিতেন। ভোজনের পর তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত এক হাজার এক শত রামনাম কাগজে লিখিয়া মৎস্যদিগের নিকট নিক্ষেপ করিতেন। সায়ংকাল হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত পুরাণ শ্রবণ করিতেন এবং কেহ দেখা করিতে আসিলে দেখা করিতেন। পুরাণ শ্রবণ হইলে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া দেবপূজা করিতেন। প্রতি শুক্রবার উপবাস করিতেন ও সূর্য্যাস্তকালে শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর দর্শনে নির্গত হইতেন।

ঝাঁশি খাস করিয়া লইবার পর, সংস্থানের পুরাতন দরবারী লোকদিগকে অবসর দেওয়া হয়, এই জন্য রাণী সাহেবের পিতা মোরোপন্ত ও লক্ষ্মণ রাও এই দুই ব্যক্তি কেবল রাণী সাহেবের কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন। এক্ষণে রাজবাটীর সমস্ত বৈভব-মহিমা তিরোহিত হইয়া, রাণী সাহেবের দৈন্যদশা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে আর একটী ঘটনা হওয়ায় তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট উপস্থিত হইল। দত্তকপুত্র দামোদর রাওর প্রতি রাণী সাহেবের প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। দামোদর রাও সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তাঁহার উপনয়নের সূচনা হইল। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার নিকট যথেষ্ট অর্থ না থাকায়, দামোদর

রাজার নামীয় জমা টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কমিসনরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। কমিসনর সাহেব তাঁহার বরিষ্ঠ পদবীর কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জানাইলেন। সেই স্থান হইতে এই উত্তর আসিল, চারি জন প্রতিষ্ঠিত লোকের জামানতিতে যদি এইরূপ লিখিয়া দেওয়া হয় যে, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন এই টাকা দাবী করিবে তখনই এই টাকা সরকারী তহবিলে পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলে এই টাকা দেওয়া যাইতে পারে। এই কথা অনুসারে রাণীমাতা ৪ জন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে জামিন দিয়া এক লক্ষ টাকা লইয়া দামোদর রাওর উপ-নয়ন অনুষ্ঠান সমাধা করিলেন।

এইরূপে কারক্লেশে ও মনঃকষ্টে রাণীর জীবন অতিবাহিত হইতেছিল এমন সময়ে জগৎপ্রসিদ্ধ ১৮৫৭ অব্দের ভীষণ [illegible] ভারত-গগনে উড্ডীন হইল। এই সময়ে স্বয়ং দামোদর রাওর লেখনী হইতে যে খেদোক্তি নির্গত হইয়াছে তাহা এই:— "এইরূপে, রাণী লক্ষ্মী বাই সাহেব সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, [illegible] আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, স্বীয় জীবনের কষ্টচর্য্যায় দিন দীর্ঘ চিন্তায় অতিবাহিত করিতেছিলেন কিন্তু সেই পূর্ব্ব দুর্ভাগ্যের অবসান না হইতে হইতেই অভিনব দুর্ভাগ্য দারুণভাবে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। ধ্যানে, মনে বা স্বপ্নেও যাহা অকল্পনীয় ছিল সেইরূপ এইরূপ সঙ্কটে তিনি পতিত হইলেন এবং নিজের ও সেই সঙ্গে আমাদিগের সুখসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া ও পরিশেষে স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিয়া, এই অজ্ঞান-দেশে এই জগতীতলে আমাদের জন্য কোন আশ্রয়-স্থান রাখিয়া গেলেন না।"

মহারাণী লক্ষ্মীবাই ঔদাস্যব্রত ত্যাগ করিয়া, কিরূপে প্রবল বেগে বিপ্লব-তরঙ্গের মধ্যে—ঘোর সমরাবর্ত্তের মধ্যে নীত হইয়াছিলেন,

তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। আপাতত এই বলিয়া উপসংহার করি,

"ভবিতব্যং ভবত্যেব, কর্ম্মণামীদৃশীগতিঃ।"

নাম কৌতুক।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহোদয় ভারতী (১৩০০ সাল, জ্যৈষ্ঠ) পত্রিকায় "নাম কৌতুক" শীর্ষক এক অতি মনোহর ও কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে সাধারণকে এবিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য আহ্বান ও অনুরোধ করা হইয়াছিল। তদনুসারে আমরা শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কতিপয় কৌতুকাবহ নাম সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি লিখিতেছি।

মাননীয় রাজনারায়ণ বাবু এক স্থলে বলিয়াছেন,—"ইংরাজগণের ন্যায় এক্ষণে অনেক বাঙ্গালী স্ত্রী স্বীয় নামে বংশের উপাধি যোগ করিয়াছেন। যথা,—শরৎকুমারী চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদি। আমার বিবেচনায় এরূপ বংশোপাধি-যুক্ত নাম পুরুষের নামের মত শুনায়।" মহারাষ্ট্রদেশে রমণীগণের নামের সহিত বংশোপাধি-যোগ করিবার প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সচরাচর "ঈণ" প্রত্যয় করিয়া বংশোপাধিগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া লওয়া হয়। এই কারণে সে দেশের কামিনীগণের নামে বংশোপাধি যোগ করিলেও পুরুষের নামের মত শুনায় না। যথা,—"অহল্যা বাই হোলকরীণ" "সৌভাগ্যবতী পার্ব্বতী বাই

দেশীদার (১) এখানে "হোলকর" ও "জোশী" (জ্যোতিষী) এই দুই বংশোপাধি বাচক শব্দে "ঈণ" প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ করা হইয়াছে। এই হল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আজকালকার শিক্ষিতা মহিলাগণ আর এই নিয়ম মানিয়া চলিতে রাজী নহেন—আর তাঁহারা "ঈণ" প্রত্যয়ান্ত উপাধি ব্যবহার করিতে বড় ভাল বাসেন না। ইহার উদাহরণ স্বরূপ "সৌভাগ্যবতী ডাক্তার আনন্দী বাই জোশী" ও তাঁহার জীবনী লেখিকা "সৌভাগ্যবতী শ্রীমতী কাশী বাই কানিটকর" (২) প্রভৃতি দুই একটি নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইংরাজীর অনুকরণে বাঙ্গলা ভাষায় আজকাল মিসেস্ বোস, মিসেস্ সরকার প্রভৃতি নামের সৃষ্টি হইয়াছে। মারাঠী ভাষায় অনুরূপ স্থলে, "হোলকরীণ বাই," "কানিটকরীণ বাই" ও "জোশীণ বাই" প্রভৃতি নামের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, ইহা প্রাচীন রীতি।

বৈদ্যনাথ দেওঘরের পাণ্ডাগণের মধ্যে স্ত্রীলোকগণের নাম রাখা সম্বন্ধে এক অতি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। বাঙ্গালী রমণীগণের নামে বংশোপাধি সংযুক্ত হইলে উহা কতকটা পুরুষের নামের মত শুনায়; কিন্তু দেওঘরের পাণ্ডা মহিলাগণের নামের সহিত তাঁহাদের বংশোপাধি যোগ না করিলেও উহা অবিকল পুরুষের নাম বলিয়া ভ্রম হয়। উদাহরণ স্বরূপ [illegible]

---

১ এই রীতিঅনুসারে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সধবা রমণীগণের নামের পূর্বে "সৌভাগ্যবতী" ও বিধবাদের নামের পূর্বে "গঙ্গাভাগীরথী" শব্দ ব্যবহার হয়।

২ স্ত্রীলোকের নামের পূর্বে "শ্রীমতী" শব্দের প্রয়োগ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এই "কাশী বাই" এর নাম ভিন্ন অপর কোনও মহারাষ্ট্রীয় মহিলার নামের সহিত "শ্রীমতী" শব্দযুক্ত হইতে এ পর্যন্ত দেখি নাই।

প্রচলিত নাম এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—শিব-নারায়ণ বাবু; সোহাগ সুন্দর বাবু; সদা সুন্দর বাবু; ফুল সুন্দর বাবু; প্রভাসুন্দর; আম্মান্ সুন্দর; (৩) ধনপতি; সর্দ্দার বাবু, বাবু সাহেব; বাবুজী; সুকুমার বাবু; বাবু ধন; ঠাকুর; শনি; সংসার ইত্যাদি। এইগুলি হইল, পাণ্ডারমণীগণের বিশেষ আদরের ও গৌরবের নাম। সৌভাগ্য যে,ইহাঁরা স্বীয় নামের সহিত বংশোপাধি সংযোগ করেন না!

উপরি-লিখিত নামগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত ও হিন্দী মূলক, এই কারণে তাদৃশ শ্রুতিকঠোর নহে। কিন্তু পাণ্ডারমণীগণের খাঁটি দেশীয় নামগুলি শ্রবণ করিলে বোধ হয় পাঠকগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কয়েকটি অত্যন্ত প্রচলিত নাম পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া গেল।—"ঝোঞ্চা, উব্রাস, হুরুনী, ফোঁদার, ঝল্‌ঝল্, ভোভো, ফুচিয়া, ভুক্কা, বুচ্চি; অঝায়।" (৪) আবার কতকগুলি ভাল নামও আছে,—যথা—চঞ্চল, অম্বালিকা, "টাকামণি," কুসুম, ত্রিপুরা; মহারাণী, জয়া, চন্দ্রা ইত্যাদি। কতকগুলি নাম উচ্চারণ দোষে বিকৃত হইয়া গিয়াছে; যথা—আনন্দমহী (আনন্দময়ী), করুণামহী, সোবরমহী, গৌরা; কমেশ্রী (কামেশ্বরী) ইত্যাদি।

৩ এখানকার ইতর জাতীয়া রমণীগণের মধ্যে "সুন্দরী" নামের প্রচার দৃষ্ট হয়। পাণ্ডা রমণীগণ কিন্তু উহা পছন্দ করেন না; তাঁহারা "সুন্দরী না হইয়া "সুন্দর" হইতে সমধিক ভাল বাসেন।

(৪) এই সকল নামের মধ্যে অনেকগুলিই অর্থশূন্য ও অযত্নসূচক। কোনও কোনও শিক্ষিত পাণ্ডা তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণের এই সকল অর্থসৌন্দর্য্যশূন্য নামের জন্য বোধ হয়, কিছু লজ্জিত ও দুঃখিত। এ সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে এক বিশেষ সুবিধা এই যে, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়া কন্যার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন কন্যাকে পিতামাতার অযত্নরক্ষিত নাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শাশুড়ির ইচ্ছামত কোনও শ্রুতিমধুর নাম গ্রহণ করিতে হয়; এবং তদবধি তিনি সেই নামেই পরিচিত হয়েন।

উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, মহারাষ্ট্রীয়গণ “দাস” “চরণ” ও “প্রসাদ” প্রভৃতি হীনতা ও অধীনতাসূচক শব্দযুক্ত নাম কদাচিৎ ব্যবহার করেন। রামচরণ; কৃষ্ণদাস; ভগবতীপ্রসাদ প্রভৃতি নাম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মহারাষ্ট্রীয় নামগুলি অধিকাংশ স্থলেই বীরত্ব সাহস ও কঠোরতাব্যঞ্জক। মান্দ্রাজ প্রদেশের সংস্কৃতমূলক নাম গুলির অধিকাংশ বীরত্ব প্রকাশক। যথা—বীর রাঘব চারিয়র। পার্থ সারথী নায়ডু। আর কতকগুলি নাম সৌম্যভাব প্রকাশক— কল্যাণ সুন্দরং; সোমসুন্দরং; সুব্রহ্মণ্য; দেশসুখচারী ইত্যাদি।

দীর্ঘনাম বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়গণকে কেহ হারাইতে পারিবেন, বোধ হয় না। তাঁহারা স্বীয় নামের সহিত প্রথমে পিতার নাম পরে বংশের উপাধি এবং সুবিধা হইলে আদিম বাসস্থানের নাম পর্য্যন্ত যোগ করিয়া দেন। যথা—“নাগেশরাও বিনায়ক বাপট বাইঁকর” “শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ শাস্ত্রীবিবল্‌কর” ইত্যাদি। বৈদ্যনাথ দেওঘরের পাণ্ডাগণের মধ্যেও দুএকটী অতিদীর্ঘ নাম দেখা যায়। যথা,— “পরম প্রকাশানন্দ দত্ত ওঝা”। “ভবপ্রীতানন্দ দত্ত ওঝা।” শুনিয়াছি, কলিকাতার কোন বঙ্গ মহিলার নাম—“ললিত লবঙ্গলতা শতদলবাসিনী।” এরূপ দীর্ঘ নাম আর কখনও শুনা যায় নাই। মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণের নাম প্রায়ই অতি সংক্ষিপ্ত।

মহারাষ্ট্রীয়গণের বংশ উপাধিগুলি বাঙ্গালী পাঠকের কর্ণে কিছু অদ্ভুত রকম ঠেকিতে পারে বিবেচনায় নিম্নে কয়েকটি লিখিত হইল। “দাম্‌লে; পারথ; খান্‌বল্‌কর; পাথরকর; পল্‌সুলে; থথে; ভড়্‌কম্‌কর; তথড়্‌কর; আপ্‌টে; পিঙ্গলে; ভিড়ে প্রভৃতি।

পাঠক ইহার সহিত দেওঘরের পাণ্ডাগণের উপাধি মিলাইয়া দেখুন,—যজওয়াড়ে; খওয়াড়ে; অঁড়েওয়ার্; কুঞ্জিল্‌ওয়ার; নরৌনে; বলীয়াসে; করমহৈ; পরীহৎ; দত্ত-ওঝা, ইত্যাদি।

গুজরাটে গরবা।

প্রবাসী পথিকের সোৎকণ্ঠ কুতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নূতন অঙ্কের নূতন দৃশ্যপট উত্থিত হইতেছে। বোম্বাইপুরী তাহার বেলাতললীন চিরচঞ্চল ক্ষুব্ধ সমুদ্র, নারিকেলতরুশিরনীলায়িত শৈল-কটিবন্ধ এবং সেই বিপুল লোকারণ্য, বিচিত্র কলকণ্ঠধ্বনি, সেই সতত বৈচিত্র্যময় সুবিস্তীর্ণ রাজপথ, লৌহবর্ত্মে নিরন্তরধ্বনিত রথচক্রঘর্ঘর, সমস্ত লইয়া দূরে অপসারিত হইয়াছে, এবং সম্মুখে শীর্ণস্বচ্ছ শাবরমতীর সৈকত-তটভূমি শরতের রৌদ্রালোকে স্বর্ণবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নব দৃশ্যপট এখনও সম্যক্ উদ্ঘাটিত হয় নাই—অর্দ্ধ-উত্তোলিত যবনিকার অন্তরালে কেবল গুজরাটের তপ্তোজ্জ্বল শ্যামলক্ষেত্র শরৎকালের নির্ম্মল নীলাকাশতলে নবরবিকিরণকীর্ণ কনক রঙ্গভূমির আভাসের মত প্রতিভাত হইতেছে মাত্র।

যখন ধীরে ধীরে যবনিকা সম্পূর্ণ উত্থিত হইল, তখন এই পক্ক-শালীশ্যামল রঙ্গভূমিতে এই শারদরৌদ্রলেখাঙ্কিত স্বর্ণদৃশ্যপটে একটি পুরাতন আনন্দ-উৎসবের অভিনয় প্রকাশিত হইল। বৃহৎ প্রাঙ্গণতলে ম্লান দীপশিখা পরিবেষ্টন করিয়া সহস্র নারীমূর্ত্তি চঞ্চল ছায়াপ্রতিমার মত চিত্তহারী বিচিত্র গতিভঙ্গীতে প্রমত্ত আনন্দাবেগে ঘূর্ণ্যমান—সহস্র শাটিকার তরঙ্গায়িত প্রান্তদেশ হইতে চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে এবং সহস্র তন্বঙ্গের সুনিয়ত তরঙ্গভঙ্গে, সুবলিত বাহুবিক্ষেপে, শুভ্র হাস্যোচ্ছ্বাসে, ক্বণিত করতালিধ্বনিতে তপ্ত উৎসের মত শতধারে বিচিত্র সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। মনে হয়, যেন রাজা উদয়নের সেই চিরন্তন অবন্তীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—যেখানে নর-

যেন নিরন্তর আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে। কারুকার্য্যখচিত বিচিত্র কঞ্চুলিকাবদ্ধ যৌবনতলে যেন সেই আহীরবালিকার আবেগময় হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টিতে, ঈষৎ স্মিতভাষিতে, চঞ্চল গতিভঙ্গে, অঞ্চললুণ্ঠনে পুরাতন বৃন্দাবন তাহার জ্যোৎস্নালোকিত অতীত রজনী লইয়া চক্ষের সমক্ষে অস্ফুটালোকে ফুটিয়া উঠে। যেন সেই প্রাচীন আহীরপল্লীখানি সহসা অতীতকাল হইতে সজীব হইয়া উঠিয়া চিরকালের পথে সশরীরে অভিসারযাত্রা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

প্রাঙ্গণের রঙ্গভূমিতে যখন এই গরবাভিনয় চলিয়াছে এবং প্রমোদপ্রবাহ চঞ্চলা শিপ্রার দুই তটভূমির ন্যায় কৃশাঙ্গী শাবরমতীর দুই কূল প্লাবিত করিয়া প্রবহমান, তখন প্রাঙ্গণের অনতিদূরে পূজাগৃহের নেপথ্যে মৃদুস্বরে আর এক অভিনয় চলিয়াছে—পুরাতন মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে ব্রাহ্মণেরা যথারীতি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে দেবীকে আবাহন করিতেছেন। কিন্তু সে ধ্বনি প্রাঙ্গণের শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণে প্রবেশ করে না—সে ধ্বনি কৈলাসে দেবীসদনে উত্তীর্ণ হয় কি না সে বিষয়েও সন্দেহ। এখানে কৃষ্ণেরই একাধিপত্য—চণ্ডীর আবাহন কেবল তাঁহার প্রচণ্ড কোপ হইতে উদ্ধারের আশায়। বঙ্গগৃহে পার্ব্বতী যেরূপ কন্যার ন্যায় সকল পিতামাতার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং দশমীর দিনে সেই কন্যারূপিণী স্নেহের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত বঙ্গহৃদয় যেরূপ কন্যাবিচ্ছেদবেদনা অনুভব করে, গুজরাটে তাহার কিছুই নাই। সে করুণ আগমনীসঙ্গীতও নাই, সে স্নেহসুকোমল বিচ্ছেদবেদনাভয়ও নাই, সে সুনিবিড় আত্মীয়তাও নাই এবং তদানুষঙ্গিক অনিবার্য্য দুঃখফলও নাই।

গুজরাটের স্নেহরস কৃষ্ণের প্রতিই প্রবাহিত। দুগ্ধঘৃতনবনী-

পরিপুষ্ট যশোদার এই নীলমণিটিকে কে না ভালবাসে? গুর্জ্জর-সুন্দরীগণ বিশেষরূপে তাঁহার অনুরক্ত। যশোদা যেমন করিয়া কৃষ্ণকে আহার করাইতেন, যেমন করিয়া কর্ণে দুল, মস্তকে শিখী-পুচ্ছ, কটিদেশে চন্দ্রহার, চরণে নূপুর দিয়া সাজাইয়া দিতেন, সেই সকল কথা গান করিতে করিতে চঞ্চলাক্ষী গুর্জ্জরাঙ্গনাগণ উৎসাহে প্রমত্ত ও আনন্দে বিবশ হইয়া পড়েন। এবং অনন্যহৃদয়া রাধিকা-সুন্দরী এই বহুপ্রেয়সী প্রিয়জনের আশাপথ চাহিয়া সচকিতনেত্রে উৎকণ্ঠিত অন্তরে কত নিশি যাপন করিয়াছেন, সে গান গাহিতে গাহিতে গরবার সেই চিরন্তন একটানা সুরও যেন রুদ্ধ অশ্রুচ্ছ্বাসে আর্দ্র হইয়া আসে।

এই কৃষ্ণপ্রেম বহুদিন হইতে গুজরাটে অনুশীলিত হইয়া আসি-তেছে। এবং আহারে বিহারে প্রমোদ বিলাসে গোপালই গুর্জ্জরের বহুদিনের পুরাতন আদর্শ। গোপাল গোপগৃহে ক্ষীর সর ঘৃত নবনী সেবনে মানুষ হইয়াছিলেন; গুর্জ্জরেও আহার্য্যের মধ্যে দুগ্ধ ঘৃত শর্করার বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য এবং যজ্ঞস্থলে নরনারীগণ যখন দুই পংক্তিতে আহারে উপবেশন করেন গব্যগন্ধে যজ্ঞভূমি আমোদিত হইতে থাকে। গোপালের স্রক্‌চন্দনপ্রিয় বলিয়া খ্যাতি আছে; ভক্ত গুর্জ্জর এ বিষয়েও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। এমন কি, দাক্ষিণাত্যের জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে গেলে, গুর্জ্জরের নরনারীর হৃদয়বন্ধনেও পুরাতন বৃন্দাবনের প্রগাঢ় প্রেমপ্রভাব স্বীকার করিতে হয়।

একে শ্রীকৃষ্ণের বংশীমোহ, তাহাতে শরৎকালের এই মোহময়ী প্রকৃতি! বর্ষাপগমে আকাশ মেঘমুক্ত, ধরিত্রী স্বর্ণশস্যে সমুজ্জল এবং সুবর্ণ সৈকতভূমিতলে কৃশাঙ্গী নদী-প্রবাহ মুক্তাহারের ন্যায় শোভমান। নবীনা প্রকৃতিও যেন উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া-

ছেন। এবং প্রকৃতির এই নব উল্লাসচাঞ্চল্য নারীহৃদয়ে যেন হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে।

নিরানন্দ বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্রই প্রকৃতির সহিত নারীহৃদয়ের একটা প্রকাশ্য সমবেদনা দেখা যায়। কোথাও বা বর্ষায়, কোথাও বা শরতে, কোথাও বা নববসন্তে— হয়, পর্য্যাপ্ত পুষ্পপল্লবের বিকাশে, নয়, স্নিগ্ধ-সজল-সঘন নবমেঘের সমাগমে, নয়, শিশিরমণিখচিত কনক শস্যরাশির প্রচুর পরিণতিতে রমণীগণ মঙ্গলগান এবং আনন্দনৃত্য সহকারে প্রকৃতির উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। মূঢ় প্রকৃতি যখন কেবল সমীরোচ্ছ্বাসে, ঘনঘটায়, ফুলে ফলে পল্লবে নব নব প্রাণসঞ্চারের আনন্দ মূকভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন দয়মানা প্রমদাগণ তাহাকে সুকণ্ঠের সঙ্গীতময় বাক্যময় ভাষা অর্পণ করিয়া বিশ্বব্যাপী আনন্দপ্রকাশকে সম্পূর্ণতা দান করেন। তাহা দেখিয়া মনে হয়, নারীগণ যেন আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি অন্তরঙ্গভাবে আত্মীয়ভাবে বিশ্বপ্রকৃতির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আছেন;—যে নিগূঢ় প্রাণপূর্ণ পুলক-চাঞ্চল্য মাটির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালে শাখায় শাখায় পুষ্পস্তবক এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শস্যমঞ্জরী বিরচিত করিয়া দেয়, তাহা অলক্ষিতভাবে রমণীগণের সুকুমার দেহলতিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৃত্যে এবং গীতে স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠে। উন্মুক্ত আকাশতলে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যসভায় বিশ্বলক্ষ্মীর সহিত আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের এই কোলাকুলি, এই প্রকাশ্য প্রীতিসম্ভাষণ, এমন শোভন সুন্দর দৃশ্য আর কি কিছু আছে? কিন্তু, হায়, সমস্ত বঙ্গদেশে, বসন্ত হইতে হেমন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ঋতুর পর্য্যায়ে স্ত্রীকণ্ঠের সঙ্গীত একেবারেই নীরব;—প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য যখন নূতন প্রাণে নূতন বেশে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তখন

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য্য সেই নিখিল-সঞ্চারিত নবযৌবনের আনন্দে যোগ না দিয়া বিচ্ছিন্ন বিমুখভাবে অন্ধকারে আত্মযাপন করে!

প্রকৃতির সহিত নারীহৃদয়ের এই যোগসূত্রে শরৎকাল এমন উৎসবময়। এবং ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে গুর্জ্জর-রমণীগণ বিচিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া গ্রাম্যগাথায় যখন এই উৎসবের আবাহন করেন তখন এই গরবা-উৎসব সহজেই রমণীয়-তর হইয়া উঠে। এই গরবার গীতিধ্বনিতে যেন সমস্ত ভারত-বর্ষের কুলস্ত্রীগণের কণ্ঠধ্বনি কলিত হইয়া উঠে এবং নির্ম্মল শার-দীয় শুক্লপক্ষ সমধিক শোভাসম্পন্ন হয়। এবং এই নির্ম্মল নিশীথ-আকাশতলে এই ঘূর্ণ্যমান উত্তেজনা উন্মাদনা, ছায়া আলোক, হৃদ্‌স্পন্দন, কলগীতি, রূপ যৌবন দেহতরঙ্গ সমস্ত মিলিয়া একটি মহীয়সী মায়ার মত প্রতিভাত হইতে থাকে।

মেয়েলি ব্রত।

২

দশপুত্তল ব্রত।

দশটী দেবদেবীর পূজা করিয়া তাঁহাদের নিকট বর প্রার্থনা করার নাম "দশপুত্তল ব্রত।" কেবল সাত আট বৎসরের অবি-বাহিতা বালিকাগণ এই ব্রতের অধিকারিণী। বালিকাগণ নিজে-রাই সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই ব্রতের আচার্য্য পুরোহিত এবং ব্রতকথার বক্তা শ্রোতা সমস্তই

সরলহৃদয়া ক্ষুদ্র বালিকা। অপেক্ষাকৃত কোন বয়োজ্যেষ্ঠা বালিকার প্রতি ইহার পৌরোহিত্যভার অর্পিত হয়। কিন্তু পুরুত-ঠাক্রুণের প্রাপ্য যৎসামান্য; যেহেতু ফুল চন্দন দুর্ব্বা, এবং যৎকিঞ্চিৎ রম্ভামিশ্রিত তণ্ডুলমুষ্টি ছাড়া বিশেষ কোন উপাদেয় পদার্থের সহিত এই ব্রতের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং বালিকা পুরুত ঠাকৃরুণ যে নিঃস্বার্থ ভাবে যজমানের যাজনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমাদের এই দুঃখদারিদ্র্যপীড়িত বঙ্গসমাজের "পুরোহিত" মহাশয়েরা যদি স্বীয় নামের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমাদের এই বালিকা পুরুত ঠাকরুণের নিঃস্বার্থ আচরণের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে অনেক গরিব গৃহস্থ তাঁহাদের উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যাহা হউক, আমরা অতঃপর এই ব্রতের অনুষ্ঠান পদ্ধতির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

চৈত্রমাসের মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে বালিকারা স্নান করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে একত্র হয়। তৎপরে তুলসী মঞ্চের নিম্নস্থ মৃত্তিকার উপর একটী কাঠির দ্বারা আঁচড় কাটিয়া শিব দুর্গা কার্ত্তিক গণেশ প্রভৃতি দশটি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া থাকে। এই চিত্রগুলি দেখিলে, কয়েকটী সরল ও বক্ররেখার সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু বালিকাদের নির্ম্মল ও সরল হৃদয়ে এই রেখা গুলিই জীবন্ত ও জাগ্রৎ-দেবতা! বালিকাগণ তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা প্রীতিভক্তি এই রেখারূপী দেবদেবীর চরণে উপহার প্রদান করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া থাকে। নানা প্রকার পুষ্প, চন্দন ও দুর্ব্বা এই পূজার প্রধান উপকরণ, এবং নিম্নলিখিত "ছড়াটী" পূজার মন্ত্র। এই মন্ত্র ব্যতীত স্বতন্ত্র ব্রত কথা নাই। পূজা শেষ হইলে,

পূজাকারিণী বালিকা অর্থাৎ পুরুৎঠাকরুণ ভক্তিগদ্গদ স্বরে এই মন্ত্র বা ছড়া উচ্চারণ করে, আর সকলে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়া থাকে। মহাবিষুবসংক্রান্তির দিন এইরূপে ব্রত আরব্ধ হয়। তৎ-পরে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে প্রতিদিন পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সেই তুলসীতলায় দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কন, পূজা ও ছড়া আবৃত্তি করিয়া সংক্রান্তির দিন ব্রত উদ্যাপন করিতে হয়।

ব্রতকথা বা ছড়াগুলি লিখিত হইতেছে। ছড়ার প্রথমেই ফলশ্রুতি। যথা—

"দশ পুত্তল পূজে যে।
দশফল পায় সে॥"

কিন্তু বালিকারা কেবল দশটী মাত্র বর লইয়া সন্তুষ্ট হয় না, তাহারা একে একে অনেকগুলি বর প্রার্থনা করিয়া থাকে। বিধাতার নির্ব্বন্ধে ইহজন্মে যা ঘটে ঘটুক—কিন্তু পরজন্মে যেন সুখসৌভাগ্য লাভ হয়, এইজন্য বালিকারা প্রথমেই বলে—

"মরিয়ে মনুষ্য হব।
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লব॥"

ইহার পর বালিকারা এই সকল বর কামনা করে।

"সীতার মত সতী হব,
রামের মত পতি পাব,
লক্ষ্মণের মত দেবর পাব,
কৌশল্যা শাশুড়ী পাব,
দশরথের মত শ্বশুর পাব,
দুর্গার মত মা পাব,
শিবের মত বাপ পাব,

লক্ষ্মী সরস্বতী বোন পাব,
কার্ত্তিক গণেশ ভাই পাব,
লবকুশ ছেলে পাব,
কুন্তীর মত ধীরা হব,
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব,
কলাবৌয়ের মত লজ্জাশীলা হব,
বিউলীর ডাল বর্ণ হব।
দুর্ব্বার মত লতিয়ে যাব।”

হিন্দু মহিলার গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত আদর্শ এই ছড়াগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩

হরি'চরণ ব্রত।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন, গোলোকপতি শ্রীহরির শ্রীচরণ প্রাপ্তিই “হরিচরণ ব্রত”টীর উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রতকথা পাঠ করিলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, “রাজরাজেশ্বর স্বামী,” “অমরবরপুত্র,” “সভাউজ্জ্বল জামাই,” “গুণবতীঝি” ও “রূপবতী বৌ” প্রভৃতি সংসারের তাবৎ সুখসম্পত্তি লাভ করাই ইহার লক্ষ্য। তবে হরিচরণাশ্রয় না করিলে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না, এই জন্য ‘হরিচরণ’ পূজার বিধি। কেবল কুমারী বালিকাগণ এই ব্রত অবলম্বন করিতে পারে, অধিকবয়স্কা রমণীগণের ইহাতে অধিকার নাই। ব্রতের বিধি এইরূপ;—

বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে স্নান করিয়া একখানি রেকাবে শ্বেতচন্দনের লেপন করিতে হয়। পরে এই চন্দনলিপ্ত রেকাবের

উপরে অঙ্গুলি দ্বারা দুইখানি 'চরণ' অঙ্কিত করিতে হয়। ইহাই শ্রীহরির পাদপদ্ম। বালিকা নিজে যদি হরিচরণ আঁকিতে না পারে, অন্য কোন রমণী তাহা আঁকিয়া দেন। ধান দূর্ব্বা ও পুষ্পদ্বারা এই পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়া ব্রতকথা শুনিবার নিয়ম। ব্রতকথার ছড়াগুলিই পূজার মন্ত্র, অন্য কোন মন্ত্র নাই। এই ব্রত বালিকারা আপনার আপনার গৃহে সম্পন্ন করিতে পারে, সকলে একত্র হইবার প্রয়োজন হয় না। যে সকল বালিকা ছড়া জানে না, বাটীর কোন স্ত্রীলোক তাহাদিগকে ছড়া বলিয়া পূজা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

এই ব্রত এক বৎসরে শেষ হয় না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরের বৈশাখ মাসে যথা নিয়মে রেকাবে হরিচরণ অঙ্কন, ও পূজা করিয়া ব্রতকথা শুনিতে হয়। চতুর্থ বৎসরের ব্রতপ্রতিষ্ঠার সময়, গুরু অথবা পুরোহিতকে (বালিকাগণের পিতা মাতার গুরু পুরোহিত বুঝিতে হইবে) তিনখানি সুবর্ণ নির্ম্মিত "চরণ," (অভাবপক্ষে দুই খানি রূপার ও একখানি সোণার) ও তিনখানি নূতনবস্ত্র দান করিয়া এবং সাধ্যমত ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। এই ব্রতটীকে নিতান্ত বাল্যক্রীড়া বলা যায় না, যেহেতু ইহাতে গুরু পুরোহিত স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র প্রভৃতি অতি গুরুতর বিষয়ের সমাবেশ আছে। কোমলহৃদয়া সরলা বালিকারাও গুরুপুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, ইহা তাঁহাদের অসাধারণ কার্য্যকুশলতার পরিচয় সন্দেহ নাই! ব্রতকথার ছড়া এইরূপ ;—

"হরি বোল্‌চেন—'ও গো মা!
আজ কেন আমার শীতল পা?'

মা বো'লচেন ———
'কোন সতী ভাগ্যবতী
সেই পূজেচেন তোমার পা।'
'সে কি বর চায়?'
'আপনাকে সুন্দর চায়,
রাজরাজেশ্বর স্বামী চায়,
গুণবতী ঝি চায়,
সভা-উজ্জ্বল জামাই চায়,
অমর বর পুত্র চায়,
গিরিরাজ বাপ চায়,
মেনকার মত মা চায়,
দুর্গার মত আদর চায়।
রামের মত পতি,
সীতার মত সতী,
আল্‌নাভরা কাপড়,
মরাই ভরা ধান,
গোয়ালভরা গোরু,
পালভরা মষ,
পায়ে আল্‌তা মুখে পান,
পাট বস্ত্র পরিধান,
সূক্ষ্ম মল্লিকার ফুলে,
পূজব হরি গঙ্গাজলে,
থাকব হরির চরণ তলে।'
উযোতে পারি ত ইন্দ্রের শচী
না পারিত শ্রীকৃষ্ণের দাসী।

একগলা গঙ্গাজলে,
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে,
মরণ হয় অন্তে গঙ্গাজলে।”

প্রথম মল্লিকা পুষ্পদ্বারা হরিপাদপদ্ম পূজা করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়ে বাস করিবার প্রার্থনা করিয়া বালিকা আবার বলিতেছে—

“উযোতে পারি ত ইন্দ্রের শচী।
না পারি ত শ্রীকৃষ্ণের দাসী॥”

শ্রীকৃষ্ণের দাসীত্ব অপেক্ষা ইন্দ্রের শচীত্ব যেন বালিকার নিকট অধিকতর গৌরবজনক। তবে নিতান্তপক্ষে যদি সুররাজ ইন্দ্রেশ্বরী হইয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেও ব্রতচারিণী বালিকার আপত্তি নাই। শেষের এই দুই চরণ ব্রতের ফলশ্রুতি বলিয়া বোধ হয়,—

“স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মরণ হয় অন্তে গঙ্গাজলে॥”

ঠাকুর্দ্দা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড় সহজ ছিলনা। এখন যেমন রাজা রায়বাহাদুর খেতাব অর্জ্জন করিতে অনেককে খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম সুপারিসের শ্রাদ্ধ করিতে হয়

তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষটাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে একবার কোন উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্য্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাঁচ্চা রূপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না, বহু-বর্ত্তিকা-বিশিষ্ট প্রদীপের মত নিজের তৈল নিজে অল্পকালের ধূমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়নজোড়ের একটি নির্ব্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল;—ইহাঁর পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয় আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল—যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্ব্ব পুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেই জন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস বাবু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন—পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায়

ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনো হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়াক্রান্তির হিসাবে রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সে জন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখা পড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি—শূন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি সেই কারণেই, কৈলাসবাবু তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরবের ফেল্‌-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক্‌ চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাবু বুঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে? যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া সমস্ত অনুকূল অবসরগুলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড্‌ একাকী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়!

তখন বয়স অল্প ছিল সেই জন্য এইরূপ তর্ক করিতাম রাগ করিতাম—এখন বয়স বেশী হইয়াছে এখন মনে করি, ক্ষতি কি! আমার ত বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব? যাহার কিছু নাই,

সে যদি অহঙ্কার করিয়া সুখী হয় তাহাতে আমার ত শিকি পয়-সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাস বাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ, এত বড় নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্ম্মে সুখেদুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিমুখে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন—যেখানে যাহার যে কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এই জন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তরমালার সৃষ্টি হইত; ভালত? শশি ভাল আছে? আমাদের বড় বাবু ভাল আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম সে এখন ভাল আছেত? হরিচরণ বাবুকে অনেককাল দেখিনি তাঁর অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি? তোমাদের রাখালের খবর কি? বাড়ির এঁয়ারা সকলে ভাল আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড় চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতি-বার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্চ সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া দড়িতে খাটাইয়া ভাঁজ করিয়া আলনায় তুলিয়া পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখন তাঁহাকে দেখা যাইত তখনি মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্য আস্‌বাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতিশয় পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর

ও জামার আস্তিন বহুযত্নে ও পরিশ্রমে "গিলে" করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড় বড় জমিদারী ও বহুমূল্যের বিষয়সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবী, একটি রূপার আলবোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকেলে জামাযোড়া ও পাগড়ী দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে বহুচেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন একটা উপলক্ষ্য উপস্থিত হইলে এই গুলি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এদিকে কৈলাস বাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহঙ্কার করিতেন সেটা যেন পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত। পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্ব্বদা বিস্তর লোক সমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গুরুতর হইয়া উঠে এই জন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, ভাল গয়ার তামাক পাওয়া গেছে। ঠাকুর্দ্দামশায় দুই এক টান টানিয়া বলিতেন, বেশ ভাই, বেশ তামাক। অমনি সেই উপলক্ষ্যে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন সে তামাক কাহারও আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না? সকলেই জানিত যে যদি কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চয় চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কি রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এই জন্য

সকলেই একবাক্যে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভাল। শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলদেখি ভাই? অমনি সকলে বলিত, সে একটা দিন ঠিক করে দেখা যাবে। ঠাকুর্দ্দা মহাশয় বলিতেন, সেই ভাল, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক্, নইলে এ গরমে গুরু ভোজনটা কিছু নয়। যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুর্দ্দাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না – বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, এই বৃষ্টি বাদ্‌লাটা না ছাড়লে সুবিধে হচ্চে না। ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখা ইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলে তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন সে বিষয়েও কাহারু সন্দেহ ছিল না—এমন কি আজ ছয় সাত বৎসর সন্ধান করিয় ভাড়া লইবার মত একটা বড় বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইত না—অবশেষে ঠাকুর্দ্দা মশাই বলিতেন, "তা হোক্ ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ, নয়নজোড়ে বড় বাড়ি ত পড়েই আছে কিন্তু সেখানে কি মন টেঁকে?" আমার বিশ্বাস ঠাকুর্দ্দাও জানিতেন যে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে, এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব্ব নয়নজোড়কে বর্ত্তমান বলিয়া ভান করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন তিনি মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্র সৌহার্দ্দ্যবশতঃ।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্প বয়সে পর

নিরীহ গর্ব্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপ-রাধের তুলনায় নির্ব্বুদ্ধিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাস বাবু ঠিক নির্ব্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্ম্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গৌরব প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু মাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না! সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোন অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীতমাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করি-তেন না যে, অন্য কেহ এ সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ এই যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চির-স্থায়ী, এই দুর্গটি দুই তোপে সর্ব্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখীকে সুবিধামত ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারীর ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে—যে জিনিষটা প্রতি মুহূর্ত্তে পড়ি পড়ি করিতেছে অথচ কোন একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা সাধন এবং দর্শকের মনের তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাস বাবুর মিথ্যাগুলি এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্ব্বল, তাহা ঠিক সত্য বন্দুকের লক্ষ্যের সামনে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত

যে, তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত—কেবল নিতান্ত আলস্যবশতঃ এবং সর্ব্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে মনে হয়, কৈলাস বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক বিদ্বেষের আর একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড় মানুষের ছেলে হইয়াও যথা-কালে এম্, এ, পাস্ করিয়াছি, যৌবন সত্বেও কোন প্রকার কুসংসর্গ কুৎসিৎ আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্ত্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোন প্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজ মুখে সুশ্রী বলিলে অহঙ্কার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাঙ্গলা দেশে ঘট্কালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশি তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পূরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম রূপবতী একমাত্র বিদুষী কন্যা আমার কল্পনায় আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যাযোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে,—

কি জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল,
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হোক্ বা না হোক্ এই পূজা আমার মন্দ লাগিত না—ভাল ছেলে বলিয়া, কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিতপ্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায়, দেবতা বর দিন্ আর না দিন, যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমারও মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুর্দ্দা মশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু কখনো রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাস বাবু, লোকমারফৎ অথবা স্বয়ং, পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ, আমি ভাল ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। শুনিতে পাইলাম, আমার কোন বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাবুরা কখনও কোন বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল—কেবল ভাল ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়াছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না—কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্ল্যান্ মাথায় উদয় হইল, যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার স্বজন করিত। পাড়ার একজন পেন্সনভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায় বলিতেন, ঠাকুর্দ্দা, ছোটলাটের সঙ্গে যথনি দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না—সাহেব বলেন, বাঙ্গলাদেশে, বর্দ্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাবু, এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদী বংশ আছে। ঠাকুর্দ্দা ভারি খুসি হইতেন—এবং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশল সংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—ছোটলাট সাহেব ভাল আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভাল আছেন? তাঁর পুত্র কন্যারা সকলেই ভাল আছেন? সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি নিশ্চয় জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌঘুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোট লাট এবং বড় লাট বদল হইয়া যাইবে!

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাস বাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলাম—ঠাকুর্দ্দা, কাল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বল্লুম নয়নজোড়ের কৈলাস বাবু কলকাতাতেই আছেন—শুনে ছোটলাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে

ভারি দুঃখিত হলেন—বলে দিলেন আজই দুপুর বেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আস্‌বেন।

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে হইলে কৈলাস বাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন—কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না। শুনিয়া যেমন খুসি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন - কি উপায়ে নয়নজোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া, তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কি করিয়া সেও এক সমস্যা। আমি বলিলাম সে জন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে একজন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটলাট সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ যেন উপস্থিত না থাকে।

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন তখন কৈলাস বাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। তক্‌মা-পরা চাপ্‌রাসি তাঁহাকে খবর দিল ছোটলাট সাহেব আয়া! ঠাকুর্দ্দা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাযোড়া এবং পাগ্‌ড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটলাটের আগমনসংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন - এবং সন্নতদেহে বারম্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয়বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারই উপর

কৃত্রিম ছোটলাটকে বসাইয়া উর্দ্দু ভাষায় এক অতি বিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণ রেকাবীতে তাঁহাদের বহুকষ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আস্‌রফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল। কৈলাশ বাবু বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হজুর বাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী—এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি। আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট্ সমেত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরাজ কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা কিন্তু আমার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই। কৈলাসবাবু এবং তাঁহার গর্ব্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর সকলেই মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাঙ্গালীর এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত। যাহা হউক্ দশমিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্ব্বশিক্ষামত চাপ্‌রাসিগণ সোনার রেকাবী সুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল—কৈলাস বাবু বুঝিলেন ইহাই ছোটলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যাবেগে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎ-দূরবর্ত্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা

তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জ্জন আনিয়া আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল—"আমার দাদামশায় তোমাদের কি করেছেন - কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেচ—কেন এসেচ তোমরা"—অবশেষে আর কোন কথা জুটিল না—বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই—হঠাৎ দেখিলাম অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার কৃতকার্য্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল—লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুক্কুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কি দোষ করিয়াছিল? তাহার নিরীহ অহঙ্কার ত কখন কোন প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহঙ্কার কেন এমন হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ করিল?

তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমমণিকে, কোন অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্ন দৃষ্টি-পাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মত দেখিতাম—ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম এই গৃহকোণে, ঐ বালিকা মূর্ত্তির অন্তরালে একটি মানব হৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ একদিকে অজ্ঞেয় অতীত আর একদিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ নামক দুই অনন্ত রহস্য-

রাজ্যের দিকে পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য ?

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যুষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপি চুপি ঠাকুর্দ্দার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হাতে সমস্ত দিয়া আসিব। চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় অদূরবর্ত্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, দাদা মশায়, কাল লাট সাহেব তোমাকে কি বল্লেন ? ঠাকুর্দ্দা অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে লাট সাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নজোড় বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম—অবশেষে ঠাকুর্দ্দা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে সমস্ত রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

বর্ত্তমান কালের প্রথানুসারে অন্যদিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোন প্রকার অভিবাদন করিতাম না—আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোটলাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে

লাগিলেন—আমিও কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জ মুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্য্যাদার তুলনাই হইতে পারে না তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন - আমি গরীব—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না ভাই—আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে!- বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি গরীব, স্বীকার করিলেন যে, আমাকে লাভ করিয়া নয়নযোড় বংশের গৌরব হানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

উপায়।

গত চৈত্র মাসের সাধনায়, আমাদের কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা কালে, একস্থানে লিখিত হইয়াছে—

এখন সাধারণ কথার অপেক্ষা বিশেষ কথার প্রয়োজন বেশী। এখন কোন লোককে জাগিতে বলিলে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠে, আরে বাপু, আমি অনেকক্ষণ জাগিয়া আছি এখন কি করিতে হইবে বল দেখি?

আজ কাল এরূপ একটা ভাব দেখা দিয়াছে সন্দেহ নাই; যখন আমাদের মাতৃভূমির হীনতা ও অবনতি, চতুর্দ্দিক হইতে নানা বিভিন্ন প্রকারে মর্ম্মে আঘাত দিতে থাকে, তখন প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ মনে হয়।

কিন্তু কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য, বলিয়া এত ধুমধাম কেন? আমাদের দেশের অবস্থা এমনি কি অপূর্ব্ব রকমের হইয়াছে যে সকলে এরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে? যে সকল অজ্ঞান, কুসংস্কার, কদাচার প্রভৃতি আমাদের কষ্টের কারণ, তাহা দূর করিবার অনেক সদুপায় আছে এবং সাধারণেরও তাহা অবিদিত নাই— ছেলেবেলা হইতে সে সম্বন্ধে নীতি পুস্তকে বিবিধ উপদেশ সকলেরই পাঠ করিতে হয়। তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান উপদেশটি এই যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভাল। সুতরাং যাঁহারা এ বিষয়ে সংস্কার করিতে চাহেন তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য ত স্পষ্টই পড়িয়া রহিয়াছে।

তবে কি এত আড়ম্বর কেবলমাত্র মৌখিক উদ্যম এবং প্রকৃত কষ্ট-কাতরতার —এক কথায়, কপটতার পরিচায়ক? কোন কোন স্থলে ইহাই ভিতরকার কথা হইতে পারে, কিন্তু ইহা ছাড়া উহার মূলে অন্য কারণও আছে বলিয়া বোধ হয়।

দেশহিতৈষী পাঠক, দেশের সমস্যা সকল সম্বন্ধে যাঁহার সর্ব্বদাই চিন্তা করা অভ্যাস আছে, তিনি যদি ভাবিয়া দেখেন, তাহাহইলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, আমাদের দেশের অবনতির মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। তাহারই ফলে কোন কাজ করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না এবং সকল চেষ্টায় নিরুৎসাহ, এমন কি, সকল সিদ্ধিতেও নৈরাশ্য থাকিয়া যায়। আমাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিনি যত জ্ঞানী ও গুণী তাঁহার মধ্যে এই ঔদাস্য ততই দৃঢ়ভাবে বসতি করিয়াছে।

এই বিশেষ দুঃখের কারণ ভাবিতে বসিলে, প্রথমেই আমাদে অধীনতার কথা মনে আসে। কিন্তু অধীনতার উপর দোষ দিয়া বসিয়া থাকিলে কথাটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয় না। অধীনতার অনেক রকম কুফল আছে সন্দেহ নাই -কিন্তু আমরা যে রাজ্যতন্ত্রের অধীন তাহার দ্বারা অনেক সুফলও পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে তাহা অস্বীকার করিলে বিবেচনাশক্তির অভাব প্রকাশ পায়। তাহা ছাড়া বহুকাল আমরা এরূপ সুশাসন প্রাপ্ত হই নাই এ কথাও সত্য, এমন কি অনেক স্বাধীন জাতিও, এ বিষয়ে, আমাদের অপেক্ষা খারাপ অবস্থায় আছে।

অধীনতাজনিত ভাল মন্দ সকল ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের বোধ হয় যে আমাদের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের অভাব ও তাহার আনুষঙ্গিক নীচ মনোবৃত্তি সকলের উদ্ভব এবং সেই জন্য পদে পদে অপমান সহ্য করিতে হওয়াই এ নিরুৎসাহ ও ঔদাস্যের কারণ। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা কিছু সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু, আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোক নিত্য কত প্রকার অপমান অপ্রতিকারে সহ্য করিয়া নিজ হীনতা প্রকাশ করিতেছে, তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও মান্য লোক তাঁহারা ইহারই পীড়নে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছেন।

কেরাণী গিরিতেই হৌক্ ডেপুটি গিরিতেই হৌক্, সাহেব প্রভুর সম্পর্কে আসিলেই আমাদের সহস্র প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম অপমান বহন করিতে হয় সে কথা বিস্তারিত বলা বাহুল্য। প্রভুভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে একটি স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে সেটুকু সকলেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য, কিন্তু ইংরাজ বাঙ্গালী বলিয়া সেই উচ্চনীচতার পরিমাণ অনেকখানি বাড়িয়া যায়—তাহাতেই

আমাদের চিরস্থায়ী অপমান। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় বিষয় এই যে, অভ্যাসবশতঃ এই অপমান অনুভব না করাতে বা সহ্য করিয়া যাওয়াতে কতখানি হীনতা প্রকাশ হইতেছে তাহা সহজে কাহারও মনেই আসে না।

আবার এক ধাপ উপরে উঠিলে যেখানে প্রভুভৃত্যের বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ নাই সেখানে বড় বড় জমিদার ও রাজা মহারাজাদের করযোড় নতমস্তকে খোষামোদ ও তৎপরিবর্ত্তে অবজ্ঞা লাভ শতগুণ অপমানসূচক ও শোচনীয়। শেষ সীমায় উঠিলেও রক্ষা নাই— যাঁহারা বিলাতে গিয়া, সাহেবের সমান পদ পাইয়া, সাহেবী কাপড় এবং চালচলন, উহাদের ফেশন এবং এক্সেণ্টের হুবহু নকল করিয়া, সাহেবদিগকে খানা ও স্যাম্পেন খাওয়াইয়া ফতুর হইতেছেন তাঁহারা অন্তত এই অপমানের হাত হইতে এড়াইতে পারিবেন এরূপ আশা করা যাইত। কিন্তু কৈ ? বোধ করি ধুতি-পরিহিত স্বদেশীয় উপর তাঁহাদের এত রাগ খরচ হইয়া যায় যে সাহেবদের জন্য আর বড় বাকি থাকে না, অন্ততঃ যখন নিজ টেবিলে বসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ইংরাজের নিকট 'ড্যাম্ভ্ নেটিভ্' সম্বন্ধে মধুর প্রসঙ্গ শুনেন বিশেষতঃ যখন (হয়ত ভদ্রতার খাতিরে) তাহাতে যোগ দেন, তখন ত সেরূপ বোধ হয় না। এখনও দেখা যায় যে আমাদের বঙ্গসাহেব অপমানের ভয়ে নিজ নেটিভত্ব ঘুচাইয়া এ সকল গালমন্দ গায়ে পাতিয়া না লইলেও সব সময়ে তাহার নিস্তার থাকে না। কোন দিন মেমসাহেব হয়ত নাসিকা উত্তোলন করিয়া বলিয়া বসিলেন যে 'ডার্টি নিগারের' পাশে তিনি বসিতে পারিবেন না। নেটিভত্ব ঘুচান যাইতে পারে, নিদ্রেন পক্ষে চাপা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হায়! বর্ণের কালিমা যে ঘুচে না! কলঙ্কের কালিমা কালো কোর্ত্তায় কি সত্যই চাপা পড়ে ?

এত অধিক নম্রতা ও ভদ্রতা চর্চ্চার ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, মাঠে, ঘাটে, রাস্তায়, রেলগাড়িতে, খবরের কাগজে চতুর্দ্দিক হইতে অপমান বর্ষিত হইতেছে। ফাষ্টক্লাশের দাম দিয়া বাবু, যে, সব সময়ে ফাষ্টক্লাশের সুবিধা পান তাহা নহে। ওয়েটিং রুমে বসিতে গেলে হয়ত শুনিবেন যে তথায় কালা আদমীর প্রবেশ নিষেধ। গাড়িতে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পাইবেন মনে করিলে হয়ত দেখিবেন সাহেবের জন্য জায়গা ছাড়িতে হইতেছে। রাস্তায় ত সাহেবের চাবুক অদৃষ্টে থাকিতেই পারে,তাহা লইয়া অধিক বাদ-প্রতিবাদ করিলে পুলিসের গুঁতাটাও উপরি-লাভ হয়। ইহা ছাড়া ভল্লুক ভ্রমে নেটিভ শিকার, বা সাহেবী বুটে পিলে ফাটার কাহিনী কিছু পুরাতন হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু অপমানের তালিকা অনর্থক বাড়াইয়া ফল কি? পাঠক বোধ করি আমাদের বিলাপের কারণ বুঝিয়া লইয়াছেন। অন্যান্য দুঃখ কষ্ট পাপ তাপের উপর এই অপমান ও হীনতার বোঝা থাকাতে আমাদের অসন্তোষ এত প্রবল, ভাষা এত তীব্র, এবং ঔদাস্য এত সহজ হইয়া আসে। কি করিতে হইবে, বলিয়া প্রাণ যে মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠে সে ইহারই জন্য।

স্থির করা দায় যে দোষ কাহার? এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? আমাদের কথার ভাবে হয়ত কাহারো মনে হইয়া থাকিবে যে আমরা আমাদের শাসনকর্ত্তাদের দোষ দিবার উদ্যোগ করিতেছি। কিন্তু আমাদের সে অভিপ্রায় মোটেই নাই। আজকাল আমাদের সকল ত্রুটি ইংরাজ রাজ্যের উপর চাপাইবার দিকে একটা ঝোঁক হইয়াছে। সত্য বটে যে, অপমানটা উঁহাদেরই নিকট হইতে আসিতেছে, এবং উঁহারা যদি দেবতুল্য অথবা জড়বৎ হইত তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে উঁহারা মানুষ

মাত্র এবং কোন লোক যদি সর্ব্বদা দন্তপাটি বিকসিত করিয়া গলবস্ত্র হইয়া জুতা চাটিতে থাকে তাহা হইলে কোন্ রক্তমাংস-বিশিষ্ট মানুষের তাহাকে মাঝে মাঝে দুটা লাথি কসাইয়া দিতে না ইচ্ছা করে ?

আমাদের নিকট ত ইহা নিতান্তই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় যে, যে অপমানিত হয় দোষ তাহারই। যে সম্পূর্ণ অক্ষম অথবা যে শেষ পর্য্যন্ত লড়ে তাহার পরাভব হইতে পারে কিন্তু অপমান হয় না। যে বিন্দুমাত্র শক্তি থাকিতে সহ্য করে তাহাকেই শত-বার ধিক! আমাদের কর্ত্তৃজাতীয়দের আর যে দোষ থাক না কেন, তাহারা অপমান সহ্য করিবার পূর্ব্বে অকাতরে প্রাণ বিস-র্জ্জন করে। আর কিছুর জন্য না হইলেও এই জন্য উহারা আমা-দের অপেক্ষা শত গুণে মহৎ! আমরা কোন্ মুখে উহাদের দোষ দিব ?

কিন্তু অপমানিত ব্যক্তিরও বলিবার কথা আছে। কেরাণী যখন নতমস্তকে, আরক্ত কর্ণ লইয়া, বড় সাহেবের গালি বা জুতা খাইয়া আসিয়াছে তখন তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে সহ্য করিলে কেন ? সে খুব সম্ভব উত্তর দিবে, না সহ্য করিয়া উপায় কি ? কিছু বলিতে গেলে ছাড়াইয়া দিবে—স্ত্রীপুত্র খাইবে কি ? অথবা ভদ্রলোক রাস্তা হইতে চাবুক খাইয়া আসিলে হয়ত কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিবে যে সাহেবকে কিছু বলিতে গেলে পুলিসে ধরিবে, আদালতে গেলে জেলে দেবার বেলা আমাকেই দিবে—আমার ও আমার পরিবারবর্গের সর্ব্বনাশ করার চেয়ে সহ্য করা ভাল।

এরূপ যুক্তি শুনিলে বড় সমস্যাতে পড়িতে হয়। অপমান সহ্য করাটা যে উচিত ইহা কোন মানী লোক প্রাণ থাকিতে স্বীকার

করিতে পারে না। অথচ মানের জন্য কতদূর পর্য্যন্ত ক্ষতি সহ্য করা উচিত সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে নানা রূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে মীমাংসা করিবার উপায় কি?

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কোন বিষয়ে অল্প দূরমাত্র প্রবেশ করিলে জটিল বলিয়া বোধ হয় কিন্তু সে সম্বন্ধে আরও ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে তাহা পুনরায় সহজ হইয়া আসে। উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রত্যেক স্থলে স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করিতে গেলে যতটা ধাঁধাঁ লাগে একটু বিস্তৃত ভাবে দেখিলে আর ততটা লাগে না।

মিথ্যা কথা বলাটা সকল দেশের সকল শাস্ত্রে সর্ব্বাধিক পাপের মধ্যে গণ্য হইয়াছে তাহার কারণ কি? প্রত্যেকবার ফলাফল খতাইয়া দেখিতে গেলে ত এরূপ বোধ হয় না। অনেক সময়ে মনে হয় অমুক মিথ্যাকথাটা বলিলে কাহারো কোন ক্ষতি হইবে না, তবে উহাতে দোষ কি? কখনো এমনও মনে হয় যে অমুক মিথ্যাকথাটা বলিলে অনেকের উপকার হইতে পারে অতএব উহা বলাই উচিত। কিন্তু মিথ্যা কথার ফলাফল বিস্তৃত ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে, যে সমাজে মিথ্যা কথার প্রতি একান্ত ঘৃণা না থাকে, সেখানে ন্যায়বিচার হইতে সামান্য বাণিজ্য ব্যবসা পর্য্যন্ত মানুষে মানুষে কোন কারবারই ভাল করিয়া চলিতে পারে না, অতএব সে সমাজের শীঘ্রই অধঃপাতে যাইবার কথা। এই ভাবে বিচার করিয়াই শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন যে, কোন সময়ে কোন এক ব্যক্তির বা কোন এক দল লোকের সর্ব্বনাশ হয় সেও ভাল তথাপি মিথ্যা কথা বলাতে মনুষ্যের কল্যাণ নাই।

অপ্রতিকারে অপমান সহ্য করিবার হীনতা সম্বন্ধেও এ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। ইহার দ্বারা কি পরিমাণে ক্ষতি হইতেছে

তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে হইবে। ইহার নিমিত্ত পাঠককে যে নীরস নির্জ্জীব যুক্তির দ্বারা সাহায্য করিতে পারিব এমন আশা নাই। যিনি বুঝিবার তিনি, অপমানের পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করিবামাত্রই বুঝিয়াছেন। যাঁহার মনে, তাহা সত্ত্বেও, ইহার দূরীকরণের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, তাঁহার জন্য প্রবন্ধ লেখা বৃথা।

এ বিষয়ে, যে, সন্দেহের কোন পথ আছে তাহা ত আমরা দেখিতে পাই না। ইহার দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠ মানীলোক সকল নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ হইয়া পড়াতে ইহা সকল ভাল কার্য্যের ও সকল দোষ সংস্করণের প্রধান বাধা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অজ্ঞানের দূরীকরণ নিমিত্ত আমাদের দেশে শত শত ইস্কুল কালেজ ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম সমাজ রাজনীতি প্রভৃতির সংস্করণের নিমিত্ত, ব্যক্তিগত চেষ্টা ছাড়া, নেশনাল কঙ্গ্রেস, সোশাল কঙ্গ্রেস প্রভৃতি অসংখ্য সভাসমিতি রহিয়াছে। (কিন্তু যত দিন না সকল সৎকার্য্যের মূল, মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ যে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান (যে বৃত্তির জন্য আমাদের বড় একটা সুখ্যাতি নাই) এবং তাহার আনুষঙ্গিক উদার ও উচ্চ ভাব সকল না জন্মাইতেছে ততদিন এই বৃহৎ আয়োজন সকল ব্যর্থ হইতেছে। যত দিন না কায়মনোবাক্যে মানকে প্রাণের আগে স্থাপন করিবার শিক্ষা হইতেছে ততদিন ধর্ম্ম কপটাচরণে, শিক্ষা বাক্যাড়ম্বরে রাজনীতি দরখাস্ত এবং কাঁদুনীতে, এবং সমাজের উন্নতি পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য ও নিকৃষ্ট অংশের নকলে পরিণত হইবে)

এক্ষণে কথা এই যে, লোকের মনে কিরূপে আত্মমর্য্যাদার ভাব জাগান যাইতে পারে। আমাদের দেশে বক্তৃতা দিয়া এবং প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার চেষ্টা হইয়া থাকে। বক্তৃতা প্রবন্ধাদির স্ব স্ব

ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য আছে। মতামত গড়িবার পক্ষে, ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়, কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে ফাঁকা কথায় কিছু হয় না—তাহার ভিত্তিস্বরূপ কার্য্য চাই।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় শিক্ষা করা যাইতে পারে। এই ধর্ম্মের মূলে অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা আছে যাহা চিন্তাশীল লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা এক প্রকার অসম্ভব; উহার মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যাহা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ; এমন কি পরমেশ্বরের মহিমাও উহাতে সকল সময়ে খুব উচ্চ ভাবে কীর্ত্তন করা হয় নাই এবং উহার কতক উপদেশ নীতি-শাস্ত্রের সহিত খাপ খায় না। তথাপি সভ্যতম জাতি সকলের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে উহা আজ পর্য্যন্ত এরূপ প্রবল ও সতেজরূপে অবস্থিতি করিতেছে কিসের জোরে? উহার মধ্যে এমন কি শক্তি নিহিত আছে যাহার বলে এই ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত শত সহস্র মহৎ, উদার, সুশিক্ষিত লোক দেশদেশান্তরে গিয়া আফ্রিকার উত্তাপ ও গ্রীনলাণ্ডের শীত সহ্য করিয়া নিজ জীবন অকাতরে দান করিতেছেন?

এ রহস্য ভেদ করা কঠিন নহে যদি মনে রাখা যায় যে, যিশু খ্রীষ্টও উৎকট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া নিজ প্রাণ দান করিয়াছিলেন। মানব-হিতের নিমিত্ত তাঁহার যে রক্ত তিনি অকাতরে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহারই পবিত্র ধারায় ধৌত হইয়া এই হিব্রুধর্ম্মের সকল দোষ, সকল অসঙ্গতি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে এবং সেই রক্তের প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হইয়া এই ধর্ম্ম এতকাল, এত অত্যাচার ও তাড়না, এত তর্ক বিতর্ক, বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া আজ পর্য্যন্ত সতেজে চলিতেছে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে, বৃহৎ ও স্থায়ী ফল লাভ করিতে হইলে মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ধন প্রাণকে দান করিতে হয়। খ্রীষ্ট আসিয়ার এক প্রান্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, পৃথিবীময় তাহার ফল ফলিল, অনেক কঠোর হৃদয়ে মায়ামমতার বীজ রোপিত হইল, অনেক তাপিত হৃদয় শান্তি লাভ করিল, অনেক বর্ব্বর জাতি রূঢ়তা হইতে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। পৃথিবীর কোথাও যদি কোন উচ্চ ভাবের বীজ রোপণ করিতে হয় তবে প্রাণ সেচন করিয়া তাহার ভূমি প্রস্তুত করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয়, স্থায়ী ফললাভের এই একমাত্র উপায়টি কাহারও যে যথার্থ অগোচর ছিল তাহা নহে। উপায় কিছু কষ্টসাধ্য হইলে লোকে তাহাকে নিজের কাছ হইতেও লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। উপায় যতক্ষণ নাই ততক্ষণ দায়িত্বও নাই। উপায় খুঁজিয়া পাইবার মুস্কিল এই যে তাহার পর কার্য্য ছাড়া আর কিছু থাকে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যদি কোন নিরপরাধী দুর্ব্বল স্বদেশীর উপর কেহ অত্যাচার করে তাহা হইলে স্বদেশীকে রক্ষা করিতে অথবা অত্যাচারীকে শাসন করিতে গিয়া জেলে যাওয়াই মাতৃভূমিভক্তের একমাত্র কর্ত্তব্য। ভারতসন্তান যখন অনুভব করিবে যে আমার জন্যও মরিবার লোক আছে তখন তাহার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বিকসিত হইয়া উঠিবে। গোরা যখন দেখিবে যে নিগার মারিলে বিপদ আছে তখন সে অন্য শিকার লইয়া রক্তপিপাসা মিটাইবে।

ভারতসন্তান ইহা করিতে প্রস্তুত থাকুন আর নাই থাকুন কর্ত্তব্য ইহাই। পাছে আমাদের ত্রুটি ধরা পড়ে বলিয়া আদর্শ খাট করিয়া রাখিলে নিজেদের বড় বলিয়া জাঁক করিবার সুবিধা

কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য্য সমস্ত ভাঙ্গিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘুসুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁশিসহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঝঙ্কার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্‌ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎরাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল। প্রথমে নিয়ম ছিল, দুই প্রতিপক্ষদল পূর্ব্ব হইতে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিয়া আনিতেন—অবশেষে তাহাতেও তৃপ্তি হইল না—আসরে বসিয়া মুখে মুখেই বাকযুদ্ধ চলিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় যে কেবল প্রতিপক্ষকে আহত করা হয়, তাহা নহে—ভাষা ভাব ছন্দ সমস্তই ছারখার হইতে থাকে। শ্রোতারাও বেশিকিছু প্রত্যাশা করেনা—কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিতমত জবাবেই সভা জমিয়া উঠে এবং বাহবা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে—তাহার উপরে আবার চারজোড়া ঢোল, চারখানা কাঁশি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চীৎকার—বিজনবিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিকক্ষণ টিঁকিতে পারেন না।

সৌন্দর্য্যের সরলতায় যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ভাবের গভীরতায় যাহাদের নিমগ্ন হইবার অবসর নাই, ঘনঘন অনুপ্রাসে অতি শীঘ্রই তাহাদের মনকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। সঙ্গীত যখন বর্ব্বর অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে রাগরাগিণীর যতই অভাব থাক্, তালপ্রয়োগের খচমচ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা

সেই ঘনঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে। একশ্রেণীর কবিতায় অনুপ্রাস সেইরূপ ক্ষণিক ত্বরিত সহজ উত্তেজনার উদ্রেক করে। সাধারণ লোকের কর্ণ অতি শীঘ্র আকর্ষণ করিবার এমন সুলভ উপায় অল্পই আছে। অনুপ্রাস যখন ভাব ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয় তখন তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু সে সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন মূঢ়লোকের বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয় তখন তদ্দ্বারা সমস্ত কবিতা ইতরতা প্রাপ্ত হয়।

কবিদলের গানে অনেক স্থলে অনুপ্রাস, ভাব ভাষা এমন কি ব্যাকরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রোতাদের নিকট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। অথচ, তাহার যথার্থ কোন নৈপুণ্য নাই, কারণ, তাহাকে ছন্দোবন্ধ অথবা কোন নিয়ম রক্ষা করিয়াই চলিতে হয় না; কিন্তু যে শ্রোতা কেবল ক্ষণিক আমোদে মাতিয়া উঠিতে চাহে, সে এত বিচার করে না, এবং যাহাতে বিচার আবশ্যক এমন জিনিষও চাহে না।

"গেল গেল কুল কুল, যাক্ কুল
তাহে নই আকুল;
লয়েছি যাহার কূল, সে আমারে প্রতিকূল;
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন্ আমায়,
অকূলের তরী কূল পাব পুনরায়।
এখন ব্যাকুল হয়ে কি দুকুল হারাবো সই,
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়।"

পাঠকেরা দেখিতেছেন, উপরি-উদ্ধৃত গীতাংশে এক কুল-শব্দের কূল পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে কিন্তু ইহাতে কোন গুণপণা নাই। কারণ, উহার অধিকাংশই একই শব্দের পুনরাবৃত্তি মাত্র—

হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অবনতিরই পথ পরিষ্কার করিয়া রাখা হয়। কর্ত্তব্য যে এই ইহা স্বীকার করাতেও ফল আছে।

বর্ত্তমানে ক্লেশ এবং প্রাণের ভয় আমাদের কিছু অধিক মাত্রায় থাকাতে সহসা এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট চেষ্টা ও প্রত্যক্ষ ফললাভ সম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু অন্ততঃ পুত্রপৌত্রাদির চরিত্রে যাহাতে আলোচিত নীচ মনোভাব ও প্রবৃত্তিসকল স্থান না পায় সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান থাকিলে কার্য্যউদ্ধারের কতকটা সুবিধা হয়। অধিক আবশ্যক নাই, যদি কালে তিন চারি জনও এরূপে প্রাণ সমর্পণ এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে তাহা হইলে শত সহস্র বক্তৃতা ও প্রবন্ধ অপেক্ষা অধিক কাজ হয়।

ভারতবর্ষে বাঙ্গালীদের কতক বিষয়ে সুনাম আছে। বিদ্যা শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্করণ, রাজনীতিক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরা বাঙ্গালীদের অধিক অগ্রসর বলিয়া মনে করে। সে শুভদিন কি আসিবে যখন বঙ্গ সন্তান এই বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিবেন যে আমারই পূর্ব্বপুরুষের ভারতমাতাকে কলঙ্ক ও হীনতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে!

ছবি।

প্রভাত

মন্দ বহিল শীতল পবন,
গগনে উদিল রক্ত-থাল;
কুসুম ফুটিল লক্ষ লক্ষ,
সুনীল শুভ্র হলুদ্ লাল।

মধু-কলরবে পক্ষীসমাজ
গাহিয়া উঠিল জাগি ;
চেতনা আসিল,—লজ্জা মলিন—
স্বপ্ন চলিল ভাগি।

মধ্যাহ্ন

মাথার উপর জ্বলিছে প্রখর
গলিত-লৌহ-রবি ;
শুকায়ে পড়িল পল্লব লতা
কুসুম ছবি।
পাখিরা আপন কুলায়ে বসিয়া
ছাড়িছে কাতর-তান ;—
বাহিরায় বুঝি মুদিত-চক্ষু-
শাবক প্রাণ।

সন্ধ্যা

ঐ দেখ দূরে আসিছে ছুটিয়া
আঁধার-বন্যা।
আকাশে হাসিছে আপনার মনে
আকাশ-কন্যা।
বালক-বালিকা ঘুমায়ে পড়িল
মায়ের কোলে ;
উঠানের পাশে মল্লিকাগুলি
নয়ন খোলে।

নিশীথ

শান্ত আকাশে চাঁদ ভেসে যায়
পাগল পারা ;
তারা-বুক হতে ঝরিছে ধরায়
কোমল অমৃত-ধারা।
কান্তা-কান্ত আঙনে দাঁড়ায়ে
নেহারে শোভা ;
মধুর মিশেছে চন্দ্রিকা আর
দোঁহার বয়ন-প্রভা।

গুপ্ত রত্নোদ্ধার।

বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। এক এক দিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলী আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না এখনও তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

---

* গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি সঙ্গীত সংগ্রহ। শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১।৶০।

গীতিকবিতা বাঙ্গলা দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং গীতিকবিতাই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য্য। রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য্য। আমাদের বর্ত্তমান সমালোচ্য এই কবির গানগুলিও গান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।

না থাকিবার কিছু কারণও আছে। পূর্ব্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ছিল। সেই জন্য রচনার কোন অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ রাগিণী, সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন, কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতাগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল—তখন গুণীসভায় গুণাকর কবির গুণপনা প্রকাশ সার্থক হইত।

কিন্তু ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন, কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্ব্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্ম্মশ্রান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং

কিন্তু শ্রোতৃগণের কোন বিচার আচার নাই, তাঁহারা অত্যন্ত সুলভ চাতুরীতে মুগ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন। এমন কি, যদি অনুপ্রাস-ছটার খাতিরে কবি, ব্যাকরণ এবং শব্দ শাস্ত্র সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেন, তাহাতেও কাহারও আপত্তি নাই। দৃষ্টান্ত—

"একে নবীন বয়স, তাতে সুসভ্য,
কাব্যরসে রসিকে,
মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য, তাতে "দাম্ভীর্য্য" নাই,
আব আর বৌ যেমন ধারা ব্যাপিকে।
অধৈর্য্য হেরে তোরে স্বজনী, ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।
যদি সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য করব সাহায্য,
বলি, তাই বলে যা আমায়।"

একে বাঙ্গলা শব্দের কোন ভার নাই, ইংরাজি প্রথামত তাহাতে অ্যাক্‌সেণ্ট্ নাই, সংস্কৃত প্রথামত তাহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ রক্ষা হয় না, তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এই সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘন ঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেয়ালের উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেইরূপ ঘন ঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া ;—অনেক নির্জ্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুত-বেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে। বাঙ্গলা পাঁচালিতেও এই কারণেই এত অনুপ্রাসের ঘটা।

উপস্থিতমত সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবি-দলের গান, ছন্দোবন্ধ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুঁটা অলঙ্কার লইয়া কাজ সারিয়া

দিয়াছে ;—ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী শাক্ত এবং বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল এবং ফিকা করিয়া কবিগণ সহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে যোগাইয়াছেন। তাঁহাদের যাহা সংযত ছিল এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ। তাঁহাদের কুঞ্জবনে যাহা পুষ্প আকারে প্রফুল্ল এখানে তাহা বাসি ব্যঞ্জন আকারে সম্মিশ্রিত।

অনেক জিনিষ আছে যাহাকে স্বস্থান হইতে বিচ্যুত করিলে তাহা বিকৃত এবং দূষণীয় হইয়া উঠে। "কবি"র গানেও সেইরূপ অনেক ভাব তাহার যথাস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, যে, বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে যাহা নির্ম্মল নহে, কিন্তু সমগ্রের মধ্যে তাহা এক প্রকার শোভা পাইয়া গিয়াছে। কবিওয়ালা সেইটিকে তাহার সজীব আশ্রয় হইতে তাহার সৌন্দর্য্যপরিবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইতর ভাষা এবং শিথিল ছন্দসহযোগে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিলে তাহা গলিত পদার্থের ন্যায় কদর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে।

বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব আছে কি না জানি না কিন্তু সাহিত্যহিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণরাধার প্রেমকাব্যের সৌন্দর্য্যও খণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রীও অবমানিত হইয়াছে।

খণ্ডিতা নায়িকা, যে, কাব্যের বিষয় নহে এ কথা আমরা বলি না ; কাব্যে যথোচিত স্থানে ও যথোচিত ভাবে তাহারও অধিকার আছে। প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে যেমন কেবল মাত্র জ্যোৎস্না এবং

মলয় সমীরণের সুখাভিনয় হয় না, মাঝে মাঝে বজ্র বিদ্যুৎ ঝড়ের সমাগম আছে তেমনি প্রেমকাব্যের মধ্যে কেবল মিলনের স্মিত-হাস্য এবং বিরহের মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস নহে, ছলনা, বঞ্চনা, রোষ এবং বিচ্ছেদের ঝড়ও বহিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে যথার্থ ঝড়ের রৌদ্রভাব থাকা চাই। তাহা নিতান্ত খেলা নহে, তাহার মধ্যে একটা মর্ম্মভেদী কঠোরতা আছে। যেখানে উচ্চতম আদ-র্শের সহিত নিম্নতম ভ্রষ্টতার বিরোধ ঘটে সেখানে সেই সংঘর্ষে যদি একটা প্রলয় না জাগিয়া উঠে তবে সেই আদর্শকে ফাঁকি বলিয়া মনে হয়। রাধিকাকে শ্যাম যেখানে বঞ্চনা করিয়াছেন সেখানে খেলার অধিক কিছু ঘটে নাই—সেখানে রাধিকা দুর্জ্জয় অভিমান করিয়াছেন এবং শ্যাম বিস্তর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া-ছেন বটে কিন্তু তাহার মধ্যে ক্ষুব্ধ আদর্শের একটা রৌদ্রমূর্ত্তি নাই। যে খানিকটা মান-অভিমান এবং সাধ্য সাধনা আছে তাহাতে পরবর্ত্তী মিলনকে অধিকতর উপভোগ্য করিয়া তুলে মাত্র।

কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে এ সকল বিকৃতি আমরা চোখ মেলিয়া দেখি না—যেগুলি বড় ভাল সেইগুলিই মনকে অধিকার করিয়া লয়। মোটের উপর আমরা এমন একটি সৌন্দর্য্যরাজ্য আমাদের সম্মুখে প্রসারিত দেখি যে, তাহার অংশ-বিশেষের দোষ ধরিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং তাহার অংশবিশেষ দূষিত হইলেও সমগ্রের সৌন্দর্য্য প্রভাবে তাহার দূষণীয়তা অনেকটা দূর হইয়া যায়। ব্যবহারিক অর্থে ধরিতে গেলে বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের আদর্শ অনেক স্থলে স্খলিত হইয়াছে তথাপি সমগ্র পাঠের পর যাহার মনে একটা সুন্দর এবং উন্নতভাবের সৃষ্টি না হয় সে, হয়, সমস্তটা ভাল করিয়া পড়ে নাই, নয়, সে যথার্থ কাব্যরসের রসিক নহে।

কিন্তু আমাদের কবিওয়ালারা বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য্য এবং গভীরতা নিজেদের এবং শ্রোতাদের আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানতঃ যে অংশ নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছেন তাহা অতি অযোগ্য। কলঙ্ক এবং ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়। বারম্বার রাধিকা এবং রাধিকার সখীগণ কুব্জাকে অথবা অপরাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র সরস পরিহাসে শ্যামকে গঞ্জনা করিতেছেন। তাঁহাদের আরও একটি রচনার বিষয় আছে, স্ত্রীপক্ষ এবং পুরুষপক্ষ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পূর্ব্বক দোষারোপ করা ;—সেই সখের কলহ শুনিতে শুনিতেও ধিক্কার জন্মে।

বাঙ্গলা প্রেমকাব্যে এবং বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে মান অভিমান নামক একটা বিশেষ অঙ্গ আছে, যাহা পশ্চিমখণ্ডে অথবা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে স্বল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী স্বভাবতই অভিমানী। যাহাদের প্রকৃত আত্মসম্মানজ্ঞান দৃঢ় তাহারা সর্ব্বদা অভিমান প্রকাশ করিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহাদের মানে আঘাত লাগিলে, হয়, তাহারা স্পষ্টরূপে তাহার প্রতিকার করে, নয়, তাহা নিঃশব্দে উপেক্ষা করিয়া যায়। প্রিয়জনের নিকট হইতে প্রেমে আঘাত লাগিলে, হয়, তাহা গোপনে বহন করে, নয়, সাক্ষাৎভাবে সম্পূর্ণরূপে তাহার মীমাংসা করিয়া লয়। আমাদের দেশে ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, পরাধীনতা যাহার অবলম্বন সেই অভিমানী, যে একদিকে ভিক্ষুক তাহার অপরদিকে অভিমানের অন্ত নাই, যে সর্ব্ববিষয়ে অক্ষম সে কথায় কথায় অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অভিমান জিনিষটি বাঙ্গালী প্রকৃতির মজ্জাগত নির্লজ্জ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

দুর্ব্বলতা স্থলবিশেষে এবং পরিমাণবিশেষে সুন্দর লাগে। স্বল্প উপলক্ষ্যে অভিমান কখন কখন স্ত্রীলোকদিগকে শোভা পায়।

যতক্ষণ নায়কের প্রেমের প্রতি নায়িকার যথার্থ দাবী থাকে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে ক্রীড়াচ্ছলে অথবা স্বল্প অপরাধের দণ্ডচ্ছলে পুরুষের প্রেমাবেগকে কিয়ৎকালের জন্য প্রতিহত করিলে সে অভিমানের একটা মাধুর্য্য দেখা যায়। কিন্তু গুরুতর অপরাধ অথবা বিশ্বাসঘাতের দ্বারা নায়ক যখন সেই প্রেমের মূলেই কুঠারাঘাত করে, তখন যথারীতি অভিমান প্রকাশ করিতে বসিলে নিজের প্রতি একান্ত অবমাননা প্রকাশ করা হয় মাত্র, এই জন্য তাহাতে কোন সৌন্দর্য্য নাই এবং তাহা কাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে স্বামীকৃত সকল প্রকার অসম্মাননা এবং অন্যায় স্ত্রীকে অগত্যা সহ্য এবং মার্জ্জনা করিতেই হয়—কিঞ্চিৎ অশ্রুজলসিক্ত বক্রবাক্যবাণ অথবা কিয়ৎকাল অবগুণ্ঠনাবৃত বিমুখ মৌনাবস্থা ছাড়া আর কোন অস্ত্র নাই—অতএব আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা অভিমান জিনিষটা সত্য সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র সুন্দর নহে ইহাও নিশ্চয়—কারণ, যাহাতে কাহারও অবিমিশ্র স্থায়ী হীনতা প্রকাশ করে তাহা কখনই সুন্দর হইতে পারে না।

কবিদলের গানে রাধিকার যে অভিমান প্রকাশ হইয়াছে তাহা প্রায়শই এইরূপ অযোগ্য অভিমান।

সাধ করে করেছিলেম দুর্জ্জয় মান,
  শ্যামের তায় হল অপমান।
শ্যামকে সাধ্‌লেম না, ফিরে চাইলেম না,
  কথা কইলেম না রেখে মান।
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো,
  পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নবরাগে।

ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্বরাগ, আবার একি অপূর্ব্ব রাগ,
পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়।
যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে,
তবে কি করবে এ মানে।
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি যার মানে।
যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখ্‌তে হয় সম্মান।
রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান অপমান।

এই কয়েক ছত্রের মধ্যে প্রেমের যেটুকু ইতিহাস যে ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কৃষ্ণের উপরেও শ্রদ্ধা হয় না, রাধিকার উপরেও শ্রদ্ধা হয় না, এবং চন্দ্রাবলীর উপরেও অবজ্ঞার উদয় হয়।

কেবল নায়ক নায়িকার অভিমান নহে, পিতামাতার প্রতি কন্যার অভিমানও কবিদলের গানে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিরাজমহিষীর প্রতি উমার যে অভিমানকলহ তাহাতে পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে না—তাহা সর্ব্বত্রই সুমিষ্ট বোধ হয়। তাহার কারণ, মাতৃস্নেহ উমার যথার্থ সন্দেহ নাই; কন্যা ও মাতার মধ্যে এই যে আঘাত ও প্রতিঘাত, তাহাতে স্নেহসমুদ্র কেবল সুন্দর ভাবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে।

মাতা কন্যা এবং নায়ক নায়িকার মান অভিমান, যে, কবিদলের গানের প্রধান বিষয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার একটা কারণ, বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে অভিমানটা কিছু বেশি; অর্থাৎ অন্যের প্রেমের প্রতি স্বভাবতই তাহার দাবী অত্যন্ত অধিক; এমন কি,

সে প্রেম অপ্রমাণ হইয়া গেলেও ইনিয়া বিনিয়া কাঁদিয়া রাগিয়া আপনার দাবী সে কিছুতেই ছাড়ে না; আর একটা কারণ, এই মান অভিমানে উত্তর প্রত্যুত্তরের তীব্রতা এবং জয় পরাজয়ের উত্তেজনা রক্ষিত হয়। কবিওয়ালাদের গানে, সাহিত্যরসের সৃষ্টি অপেক্ষা ক্ষণিক উত্তেজনা উদ্রেকই প্রধান লক্ষ্য।

ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসর রঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্ত্তমান বাঙ্গলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এখনো সাহিত্যের উপর সেই সাধারণেরই আধিপত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এবং সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য গভীরতা লাভ করিয়াছে। তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়, অতএব, এক্ষণে তাহার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সাধারণের যতই রুচির উৎকর্ষ ও শিক্ষার বিস্তার হোক্ না কেন, তাহাদের আনন্দবিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য, এবং আবশ্যকসাধন ও অবসররঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। এখনকার দিনে খবরের কাগজ এবং নাট্যশালাগুলি শেষোক্ত প্রয়োজন সাধন করিতেছে। কবিদলের গানে যে প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা গিয়াছে, আধুনিক সংবাদপত্রে এবং অভিনয়ার্থে রচিত নাটকগুলিতেও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে তাহাই দেখা যায়। এই সকল ক্ষণকালজাত ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্যনীতির ব্যভিচার, এবং সর্ব্ব বিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। অচিরকালেই সাধারণের এমন উন্নতি হইবে, যে, তাহার অবসর বিনো-

দনের মধ্যেও ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা সাধারণ এবং সমগ্রভাবে কবিরদলের গানের সমালোচনা করিয়াছি। স্থানে স্থানে সে সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং ভাবের উচ্চতাও আছে—কিন্তু মোটের উপর এই গানগুলির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, রসের জলীয়তা, এবং কাব্যকলার প্রতি অবহেলাই লক্ষিত হয়—এবং সেরূপ হইবার প্রধান কারণ এই গানগুলি ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য উপস্থিতমত রচিত।

তথাপি এই নষ্টপরমায়ু কবিরদলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ,—এবং ইংরাজরাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক। অতএব, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গুপ্তরত্নোদ্ধার নাম দিয়া এই যে কবিদলের গান একত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন সে জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যহিতৈষীমাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

জ্যোৎস্নারাত্রে।

বহুদিন পরে আজি দক্ষিণ বাতাস
প্রথম বহিছে; মুগ্ধ হৃদয় দুরাশ
তোমার চরণ প্রান্তে রাখি তপ্তশির
নিঃশব্দে ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীর
হে মৌন রজনী! পাণ্ডুর অম্বর হতে
ধীরে ধীরে এস নামি' লঘু জ্যোৎস্নাস্রোতে,

মৃদু হাস্যে নতনেত্রে দাঁড়াও আসিয়া
নির্জ্জন শিয়রতলে। বেড়াক্ ভাসিয়া
রজনীগন্ধার গন্ধ মদির-লহরী
সমীর-হিল্লোলে; স্বপ্নে বাজুক্ বাঁশরী
চন্দ্রলোক প্রান্ত হতে; তোমার অঞ্চল
বায়ুভরে উড়ে এসে পুলকচঞ্চল
করুক্ আমার তনু; অধীর মর্ম্মরে
শিহরি উঠুক্ বন; মাথার উপরে
চকোর ডাকিয়া যাক্ দূরশ্রুত তান;
সম্মুখে পড়িয়া থাক তটান্ত-শয়ান
—সুপ্ত নটিনীর মত—নিস্তব্ধ তটিনী
স্বপ্নালসা!

হের আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি মাঝে! অসীম সুন্দর
ত্রিলোকনন্দনমূর্ত্তি! আমি যে কাতর
অনন্তভৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর-মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি,—বাসনার তীরে
একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙ্গে, নাহি তার সীমা!
আজি মোরে কর দয়া, এস তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব হে রহস্যময়ী,

খুলে ফেল,—আজি ছিন্ন করে ফেল ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর!
মহামৌন অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হতে উঠে এস ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মত হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে! সমস্ত প্রহরগুলি
ছিন্ন পুষ্পদল সম পড়ে যাক্ খুলি
তব চারিদিকে,—বিদীর্ণ নিশীথখানি
খসে যাক্ নীচে! বক্ষ হতে লহ টানি'
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি'
শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহ অপসরি'
উন্মুক্ত অলক! কোন মর্ত্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মূরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে!
উৎসুক উন্মুখ চিত্ত চরণের তলে
চকিতে পরশ কর;—একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও—একান্ত নির্জ্জন
সন্ধ্যার তারার মত; আলিঙ্গন-স্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি
বাজায়ে শিরার তন্ত্রে! ফাটুক্ হৃদয়
ভূমানন্দে—ব্যাপ্ত হয়ে যাক্ শূন্যময়
গানের তানের মত! একরাত্রি তরে
হে অমরী, অমর করিয়া দাও মোরে!

তোমাদের বাসর কুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি,—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর,—
কার কেশপাশ হতে খসি' পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনা প্রবাহ! কোথায় গাহিছ গান!
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণ কনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত,—
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণ-বিকশিত
পারিজাত;—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে,—উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব্ব বিরহে! খোল দ্বার, খোল দ্বার!
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্য্য সভায়! নন্দনবনের মাঝে
নির্জ্জন মন্দিরখানি,—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্ন দীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ম্ময়ী বালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা!

৬ মাঘ,
১৩০০।

বসন্ত-রোগ।

আমরা উপহাসচ্ছলে বলিয়া থাকি, "চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে।" কিন্তু চোর পালাইবার পরেও যদি একটু বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহাতেও উপকার আছে। সব সময়ে, তাহাও ঘটে না। সম্প্রতি বসন্তরোগ তস্করের ন্যায় কলিকাতা নগরে প্রবেশ করিয়া কত জীবন ধন হরণ করিয়া লইয়া গেল; ইহাতে যদি আমাদের কিছুমাত্র চেতনা হইয়া থাকে, তবে ভবিষ্যতের জন্য আমাদিগের বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া উচিত। কলিকাতার পৌরসভায় প্রশ্নোত্তর ও বাদানুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া যাহাতে এই ভীষণ মারাত্মক রোগ নিবারণ ও প্রশমনের জন্য স্থায়ী উপায় সকল অবলম্বিত হয়, এখন হইতেই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গো-বসন্তের টীকা লইলে, ইচ্ছা-বসন্ত সহসা আক্রমণ করিতে পারে না—যদি বা আক্রমণ করে, উহা মারাত্মক হয় না, ইহাই এখনকার প্রচলিত মত। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য, এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। আবার, কেহ কেহ মনে করেন, টীকা লইলে অন্য শরীরের রোগ-বীজ নিজ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা টীকা লইতে বিরত হয়েন।

বহুপুরাকাল হইতে প্রাচ্য-খণ্ডের লোকেরা জানিত যে, বসন্ত রোগ একবার হইয়া গেলে চিরজীবনের মত ঐ রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। একথাও তাহারা জানিত যে টীকার দ্বারা ইচ্ছা-বসন্ত অন্যের শরীরে সংক্রামিত করা যায় এবং এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামিত হইলে, উহার তেজ ও তীব্রতার অনেকটা হ্রাস হইয়া থাকে। বহু পুরাকালে, আফ্রিকা, পারস্য ও চীনদেশে,

টীকা দিবার রীতি প্রচলিত ছিল। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ইস্তাম্বুল নগরে ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এবং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে লেডি মেরি ওয়ার্টলি মনটেগ ইংলণ্ডে ইহা প্রবর্ত্তিত করেন। টীকা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে বসন্তরোগজনিত মৃত্যুর হার যে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, তাহার রাশি রাশি প্রমাণ পাওয়া যায়। তথ্য-তালিকার লতা বিস্তার করিলে সাধারণ পাঠকের বিরক্তিকর হইতে পারে, সেই জন্য তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুই চারিটী প্রমাণের উল্লেখ মাত্র করা যাইতেছে।

ডাক্তার গয় বলেন, গতশতাব্দিতে ইংলণ্ডে, প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন করিয়া বসন্ত-রোগে মরিত। তাহার পর, ইচ্ছা-বসন্ত-বীজ-টীকা ইনকুলেসন প্রবর্ত্তিত হইলে পর, প্রতি পঞ্চাশের মধ্যে একজন—পরে আরও ভাল বন্দোবস্ত হইলে—পাঁচশত লোকের মধ্যে একজন করিয়া মরিত। যদিও এইরূপ ইচ্ছা-বসন্ত-টীকার দ্বারা মৃত্যুর সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইহার দ্বারা বসন্ত-রোগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। তাহার পর গো-বসন্ত টীকা পদ্ধতি আবিষ্কার হইল।

জেনর সাহেব গোজাতির মধ্যে বসন্তের ন্যায় এক প্রকার রোগ দেখিতে পাইয়া তাহার নাম গো-বসন্ত রাখিলেন।

মানব-দেহ হইতে গরুর শরীরে সংক্রামিত হইয়া, ইচ্ছাবসন্তই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ইহার যদিও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তথাপি একটা আশ্চর্য্য এই দেখা যায়, যে অবধি ইচ্ছাবসন্ত মানুষের মধ্যে কমিয়া গেল সেই অবধি গো-বসন্তেরও হ্রাস হইল। আর একটী কথা, গো-বসন্ত গাভীদিগের বাঁটের উপরেই বাহির হইয়া থাকে, তাহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন দোহন করিবার সময় মানব-দেহ হইতে বসন্ত-

রোগ উহাদের দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। মানুষের বসন্ত-রোগ গরুতেই সংক্রামিত হউক, কিম্বা গোজাতির স্বতন্ত্র কোনও রোগই হউক, ইহা নিশ্চয় যে, ইচ্ছা-বসন্তের সহিত উহার কতকটা সাদৃশ্য আছে; অথচ ইচ্ছা-বসন্তের যে সংক্রমনীশক্তি আছে, তাহা উহাতে নাই। এই গো-বসন্তকে যদি ক্ষীণবীর্য্য ইচ্ছা-বসন্ত বলা যায় তাহা হইলে, আজকাল যে একটী মত উঠিয়াছে যে, কোন রোগের ক্ষীণবীর্য্য বীজ শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে, আসল রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, গো-বসন্ত টীকাপদ্ধতির দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হয়। অথবা, ইহাকে যদি ইচ্ছাবসন্তের সদৃশ কোন রোগ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও, সদৃশ-চিকিৎসার "বিষে বিষক্ষয়" এই মূলতত্ত্বটী অনুসারে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মূল-সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, কার্য্যতঃ গোবসন্তটীকার অনেক পরীক্ষা হইয়া উহার রক্ষণী-শক্তি যে অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বসন্ত রোগের কোন উল্লেখ আছে কি না সন্দেহ। বোধ হয়, সে সময়ে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। সেই জন্য বসন্ত-রোগের কোন বিশেষ পারিভাষিক নাম পাওয়া যায় না। বসন্তকালে এই রোগ দেখা দেয় বলিয়া, সাধারণ লোকে ইহাকে বসন্ত রোগ বলিয়া থাকে। মারাঠীদিগের মধ্যেও ইহার কোন বিশেষ নাম নাই—ইচ্ছা-বসন্তকে উহারা "দেবী" বলিয়া থাকে। আমরাও বসন্তের অধিষ্ঠাত্রীকে "শীতলা দেবী" বলিয়া থাকি। এবং দেবীর ইচ্ছানুসারে দেহ-বিশেষে তাঁহার আবির্ভাব হয় বলিয়া, বোধ হয়, ইহার নাম ইচ্ছা-বসন্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রিগেড্ সারজন প্রিংগেল সাহেব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ব্যাপক রোগানুসন্ধায়িনী সভার সমক্ষে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহার এক-

স্থলে, কোন পুরাতন হিন্দু গ্রন্থ হইতে এই অংশটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গরুর বাঁট হইতে যে ইচ্ছাবসন্ত উৎপন্ন হয়, উহা মূল রোগের প্রকৃতিরই অনুরূপ মৃদু ধরণের··· ··· ··· ··· দুই তিন দিন সামান্য জ্বর হয় মাত্র—যাহার এই বসন্ত একবার হয়, জীবনে আর কখন তাহার ইচ্ছা-বসন্ত হইবার ভয় থাকে না।

এই অংশটী কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না। বৈদ্য-শাস্ত্রজ্ঞ কোন পাঠক, এই বিষয়ে আমাদিগকে জ্ঞান দান করিলে পরম বাধিত হইব।

ষ্ট্যান্‌লি সাহেবের উদ্ধার সাধনার্থ যে এক দল লোক আফ্রিকায় যাত্রা করে,তাহার মধ্যে ডাক্তার পার্ক ছিলেন। তিনি রয়্যাল-কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময় এইরূপ বলেন যে, ব্যাপক বসন্ত রোগের সময় যে ২৫০ ব্যক্তি রোগাধিকৃত স্থলে উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই পূর্ব্বে টীকা হইয়াছিল, কাহারও কাহারও আসল বসন্ত হইয়া গিয়াছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে, এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেবল মাত্র চারিজনের মৃদু-ধরণের বসন্ত রোগ হয়। তিন জন আরোগ্যলাভ করে ও চতুর্থ ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে, টিপু টিব যে ৩০০ বাহক পাঠাইয়া দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহই পূর্ব্বে টীকা লয় নাই; তাহারা সকলেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের মৃতদেহে সমস্ত গ্রাম পূর্ণ হইয়া যায়। মারীভয়ের প্রশমন হইলে, ডাক্তার সাহেব যে সকল ব্যক্তির টীকা দিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, তিনি যে ঔষধ দিয়াছিলেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট। ব্রিগেড সার্জন প্রিঙ্গল্ যিনি ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষে সঞ্চয় করিয়াছিলেন,

তিনি বলেন, দেশীয় রাজাদের সংস্থানের মধ্যে, তাঁহার তত্ত্বাবধানে যখন টীকাদিবার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সেখানকার লোকেরা পুং-শিশু অপেক্ষা স্ত্রী-শিশুর টীকা অধিক দিতে আরম্ভ করে কিন্তু যখন পরীক্ষায় দেখিল, টীকা দেওয়া স্ত্রী-শিশু অপেক্ষা টীকা-না-দেওয়া পুং-শিশুদের বসন্তে অধিক মৃত্যু হইতেছে তখন তাহারা বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করিল-- স্ত্রী শিশু অপেক্ষা, পুং-শিশুদিগের অধিক টীকা দিতে লাগিল।

একবার ইচ্ছা-বসন্ত হইয়া গেলে, কিম্বা ইচ্ছা-বসন্তের টীকা লইলে যেরূপ স্থায়ী ফল হয়, অর্থাৎ জীবনে আর কখন ইচ্ছাবসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না, গো-বসন্ত টীকার দ্বারা সেরূপ স্থায়ী ফল লাভ হয় না। মধ্যে মধ্যে আবার টীকা লওয়া আবশ্যক হয়। এই জন্য, পূর্ব্বে যখন গো-বসন্ত টীকা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তখন প্রায় অধিকাংশ শিশুরই কোন-না-কোন সময়ে ইচ্ছা-বসন্ত হইত এবং অনেক শিশু মারা পড়িত। তাহাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া যাইত, তাহারা চিরজীবনের মত বসন্ত রোগ হইতে অব্যাহতি পাইত। কিন্তু, গোবসন্ত-টীকা প্রচলিত হইবার পর হইতে, শিশুদিগের মৃত্যুর হার কমিয়া বয়স্কদিগের মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত বাড়িয়াছে। তাহার কারণ, গো-বসন্ত টীকা একবার লইলেই যথেষ্ট হয় না, যত সময় যায়, ততই উহার ফলদায়িতা কমিয়া আসে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, জর্ম্মণদেশের গো-বসন্ত-টীকার রাজ-নিয়োজিত অনুসন্ধায়ক-মণ্ডলী জর্ম্মণ-রাজসরকারের নিকট যে বিবরণী প্রেরণ করেন, তাহাতে তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(১) ইচ্ছা-বসন্ত একবার হইয়া গেলে, জীবনে আর কখন হয় না।

(২) গো বসন্ত টীকা লইলেও এই একই ফল হয়, তবে ততটা স্থায়ী হয় না—গড়ে দশ বৎসর অন্তর পুনর্ব্বার লইতে হয়। টীকা-স্থলে অন্ততঃ দুইটী পূর্ণাবয়ব ফুশকুড়ি বাহির হওয়া আবশ্যক, প্রথম টীকার দশ বৎসর পরে পুনর্ব্বার আর একবার টীকা লওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

(৩) আশ পাশের লোকদিগের মধ্যে যে পরিমাণে টীকার ব্যবহার অধিক হয়, সেই পরিমাণে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে টীকার রক্ষণী-শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(৪) গো-বসন্ত টীকা হইতে যে পরিমাণে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ইষ্ট হইয়া থাকে। টীকার দ্বারা কখন কখন উপদংশ যে সংক্রামিত হইতে পারে না এরূপ নহে—কিন্তু তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। অন্য কারণে খোঁচা-খুঁচি লাগিয়া যেরূপ দুষ্ট ক্ষত হইতে পারে, টীকা লইবার সময়েও কখন কখন তাহা হইতে পারে। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে, তাহার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

(৫) গো-বসন্ত টীকার দ্বারা কোন বিশেষ রোগের যে বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না। তথাপি, অনুসন্ধায়ক মণ্ডলী এইরূপ অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নরদেহ হইতে টীকার বীজ রস গ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গোবৎস দেহ হইতেই গ্রহণ করা ভাল।

তাঁহাদিগের বিবরণীতে আর একটী গুরুতর তথ্য প্রকাশ হইয়াছে—তাহা এই; আইনের সাহায্যে বলপূর্ব্বক পুনঃ-টীকা লোকের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করায়, বর্লিন্ প্রভৃতি নগরে, বসন্ত-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে তথ্য-তালিকা দিয়াছেন তাহার প্রমাণ অকাট্য। অতএব, দেখা যাইতেছে, গো-বসন্ত টীকা একবার লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না—মধ্যে মধ্যে তাহার পুনঃপ্রয়োগ করিতে হয়। হাইগেটের ইচ্ছা-বসন্ত হাঁসপাতালে, প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, যে সকল পরিচারক ও পরিচারিকা বসন্ত-রোগীর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়, হাঁসপাতালে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই

তাহাদিগের পুনর্ব্বার টীকা দেওয়া হইয়া থাকে। এই জন্য এই হাঁসপাতালের কোন পরিচারকদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কখন বসন্ত হয় নাই।

কাহারও কাহারও এরূপ বিশ্বাস আছে, কোন বিশেষ বয়স পার হইলে, বসন্ত হইবার আর বড় সম্ভাবনা থাকে না, কিম্বা কোন বিশেষ দৈহিক প্রকৃতি বসন্ত-রোগের প্রভাব-বহির্ভূত। কিন্তু এ সকল বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের দেশে অনেক সময়ে আনাড়ি ব্যক্তি টীকা দেয় বলিয়া টীকার সুফল হয় না—বরং কখন কখন অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। পশু-দেহ-গৃহীত বীজরসের দ্বারা টীকা দিলে এবং সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা টীকা দিবার কাজ সম্পাদিত হইলে, অনিষ্টের খুব কমই সম্ভাবনা থাকে।

বসন্ত-রোগ যাহাতে ব্যাপক হইয়া না উঠে, তজ্জন্য বিলাত-অঞ্চলে তিনটি উপায় অবলম্বিত হয়। (১) বিজ্ঞাপন। (২) পৃথক্-করণ। (৩) বায়ুশোধন ও রোগবীজনাশন। (১) কোন গৃহস্থের গৃহে বসন্ত-রোগ উপস্থিত হইলেই, গৃহস্বামী (কিম্বা কোন কোন স্থানে গৃহস্বামী এবং রোগীর চিকিৎসক) উভয়েরই ঘটনার কথা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে জানাইতে হয়। আইন অনুসারে তাঁহারা জানাইতে বাধ্য। (২) পৃথক্করণ। অর্থাৎ লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত, বসন্তরোগীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কোন হাঁস-পাতালে রোগীদিগকে স্থাপন করা। সেখানে লইয়া যাইবার জন্য, বাহক ও বাহনের বিশেষ আয়োজন রাখা হয়। কোন কোন সংক্রামক রোগে সাধারণ হাঁসপাতালের মধ্যেই বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু বসন্ত-রোগের সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না। বসন্ত-রোগের সংক্রমণ-শক্তি,

অধিককালস্থায়ী ও সুদূরব্যাপী। রোগীদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সুবন্দোবস্ত থাকিলে, রোগীদিগের বিশেষ কোন কষ্ট হইবার কথা নহে। সহরের অনতিদূরে নদীসঙ্গম কোন নিরালয় স্থানে, হাঁসপাতাল স্থাপন করিলে, নৌকাযোগে লইয়া যাইবার বেশ সুবিধা হইতে পারে। রোগীরও কোন কষ্ট হয় না। (৩) সংক্রমণ-নিবারক উপচারের দ্বারা বায়ু শোধন করা জলাদির দ্বারা স্থান পরিষ্কার করা, বস্ত্রাদির অগ্নি-সংস্কার করা ইত্যাদি উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয়। বায়ু শোধনের পক্ষে ক্লোরিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বায়ু-শোধনের সময় একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে রোগ-বীজ ধ্বংস হয় এইরূপ পদার্থ ব্যবহার করা উচিত—কেবল দুর্গন্ধ নাশ হইলেই যথেষ্ট হয় না। যে ঘরে গন্ধকাদির ধূম-প্রয়োগ করা হয় সে ঘরটী অষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধ করা আবশ্যক, কোন রন্ধ্রের দ্বারা ধূম বহির্গত হইয়া না যায়। ধোঁয়া দিয়া অন্ততঃ একঘণ্টা কাল এইরূপ বন্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। এই সমস্ত কার্য্য, স্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীদিগের তত্বাবধানে, নির্ব্বাহ হইলেই ভাল হয়।

আলোচনা।

চাবুক-পরিপাক।

ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া কিরূপে নষ্ট করিতেছেন, কোন দেশীয় পত্রে তাহারই উদাহরণ-স্বরূপে নিম্ন-লিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

ল্যুকস্ সাহেব সিন্ধুদেশের একটি সব্‌ডিবিশনের হর্ত্তা কর্ত্তা।

তাঁহার ভৃত্য সেই অভিমানে রেলোয়ে পুলীসের নিষেধ অমান্য করিয়া রেলোয়ের বেড়া লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। পুলীস্ ইন্‌স্‌পেক্টর তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সাহেবের সেবককে জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ পরিত্যাগ করে। সাহেব সেই সংবাদ পাইয়া ইন্‌স্পেক্টরকে চাবুক মারে, ঘোড়ার পশ্চাতে দৌড় করায়, রাত্রি পর্য্যন্ত নিজের বাড়িতে ধরিয়া রাখে।—আমাদের দেশীয় পত্রিকা এই উপলক্ষ্যে ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছেন—বলিতেছেন, তোমাদের চাকরদের তোমরা খারাপ করিয়া দিতেছ—তাহারা আমাদিগকে বড় মারে, আমাদের বড় লাগে!

এরূপ সংবাদ এবং তৎসম্বন্ধে এরূপ ভাষ্য পাঠ করিলে আমাদের স্বজাতির প্রতি নিরতিশয় ধিক্কার উপস্থিত হয়। এবং নতশির লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে, সেই কাপুরুষ যে চাবুক খাইবার যোগ্য এ কথা আমাদের কোন সম্পাদক কেন আমাদের দেশের লোককে জানিতে দেন না—কেন হঠাৎ পিসিমা সাজিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আহা উহু করিতে থাকেন? যাহার সম্মান-বোধ নাই তাহার অপমানের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ ব্যক্তিকে বলবানের অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করা কি কোন মর্ত্ত্য গবর্মেণ্টের সাধ্যায়ত্ত? গবর্মেণ্ট কি কখনও প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন?

মনে করা যাক্, পারেন; মনে করা যাক্ গবর্মেণ্ট এমন এক আশ্চর্য্য আইন করিলেন, যদ্দ্বারা হেয় ব্যক্তিও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহাতে আমাদের উপকারটা কি হইল? চাবুক হজম করিবার জন্য যে এক অসাধারণ পরিপাক শক্তি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি সেটার কি কিছু লাঘব হইল?

গবর্মেণ্টের সতর্কতা যখনি শিথিল হইবে তখনি ত উন্নত প্রভু-লোক হইতে আমাদের নত-পৃষ্ঠে আবার চাবুক-বৃষ্টি হইতে থাকিবে। অপমান চাবুক-পাতে নহে, চাবুক খাইবার যোগ্যতায়; চাবুকধারী অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে চাবুক মারিতে নিরস্ত থাকিয়া সে অপমান দূর করিতে পারে না—সে অপমান দূর করা একমাত্র আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আদুরে ছেলের মত আমরা নিজেদের কেবল আদর দিতেই জানি এবং পরের নিকট কেবল আবদার কাড়িতেই শিখিয়াছি!

আমাদের দেশীয় পত্রিকা নাকী সুরে নালিশ করিতেছেন, যে, ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদর দিয়া তাহাদিগকে চাবুক মারিতে শিখাইতেছেন—সম্পাদক মহাশয় এ কথা কেন ভুলিয়া যান যে, গবর্মেণ্টের প্রতি অভিমান করিয়া এবং দেশের লোককে আদর দিয়া তিনি দেশের লোককে চাবুক খাইতে শিখাইতেছেন? যখন ঘরের ছেলে পরের পদাঘাত অনায়াসে শিরোধার্য্য করিয়া আদর পাইবার জন্য বাড়িতে কাঁদিতে আসে তখন অতিবৃদ্ধা পিতামহীর ন্যায় সেই পরকে গৃহ-কোণ হইতে বাপান্ত করিতে বসার চেয়ে ছেলেটাকে বেত্রাঘাত করিয়া বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত।

চাবুক খাইবার জন্য আমাদিগকে সহস্রবার ধিক্—এবং চাবুক খাইয়া সাশ্রু নেত্রে ও সজল নাসিকায় গবর্মেণ্টের প্রতি রাগ করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোধিক ধিক্!

জাতীয় আদর্শ।

আমরা স্বজাতির নিকট হইতে যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আশা না করি তবে তদপেক্ষা আত্মাবমাননা আর কিছুই হইতে পারে

না। আমরা সকরুণ সস্নেহ স্বরে বলিতে থাকি, আহা, আমরা বড় দুর্ব্বল—আমাদিগকে যদি কেহ আঘাত করে আমরা তাহার প্রতিঘাত করিতে পারিব না—আমাদিগকে যদি কেহ অপমান করে তবে আমরা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম—অতএব যাহারা আমাদিগকে আঘাত ও অপমান করে তাহারা অতি পাষণ্ড;—শুনিয়া আমরা এত সান্ত্বনা লাভ করি, নিজেদের প্রতি এত অধিক স্নেহরসার্দ্র হইয়া উঠি যে, আপন অক্ষমতায় লজ্জা অনুভব করিবার অবসর পাওয়া যায় না। আমরা স্বজাতির নিকট হইতে তিলমাত্র সামর্থ্য প্রত্যাশা করি না বলিয়া আমাদের সামর্থ্য প্রকাশের চেষ্টামাত্র চলিয়া যায়, আমাদের জাতীয় সম্মানবোধের অঙ্কুরমাত্র উঠিতে পারে না। আমাদের জাতীয় আদর্শ সর্ব্বদা উচ্চ রাখিতে হইবে—সেই আদর্শ হইতে লেশমাত্র স্খলন হইলে সুতীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা আত্মগ্লানি উৎপাদন করিয়া দিতে হইবে, যে ব্যক্তি কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া স্বজাতির লাঞ্ছনার কারণ হইবে তাহার প্রতি অজস্র স্নেহ বর্ষণ না করিয়া তাহাকে আমাদের সমবেদনা লাভের অযোগ্য বলিয়া একবাক্যে তিরস্কৃত করিতে হইবে—তবেই আমাদের এই অগাধ অধঃপাত হইতে মাথা তুলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। হইতে পারে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ বেল্ কেশবলাল মিত্রকে মারিয়া ভাল কাজ করেন নাই, কিন্তু যে কেশবলাল মার খাইয়া ভূমে লুটাইয়াছিল তাহার মত অবজ্ঞার পাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। রাডীচি কোন জমিদার বিশেষকে অবমানিত করিয়া হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে জমিদার উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার প্রতিকারের চেষ্টামাত্র না করিয়া সমস্ত উপদ্রব নতশিরে বহন করিয়াছিল সে যৎপরোনাস্তি হেয়। এই সকল কাপুরুষেরা অপমান সহ্য করিয়া

স্বজাতিকে হীন আদর্শ দেখায় এবং পরজাতিকে স্পর্দ্ধিত করিয়া তুলে।

অপূর্ব্ব দেশহিতৈষিতা।

অথচ আশ্চর্য্য এই, যে, আমাদের সম্পাদক মহাশয়গণ জাতীয় আদর্শকে উচ্চে তুলিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া পরজাতিকে সর্ব্বদা মহত্ত্বের পথে অটল রাখিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সতর্কতার বিশ্রাম নাই। ইংরাজেরা রক্তমাংসের মানুষ নহেন, তাঁহারা দেবতা—সেই দেবত্ব হইতে তাঁহাদের তিলমাত্র স্খলন না হয় এজন্য আমাদের সম্পাদক-সম্প্রদায় দিবারাত্রি সজাগ হইয়া আছেন। তাঁহাদের মতে আমরাও দেবতা, কিন্তু আমরা ভূতপূর্ব্ব দেবতা—আমাদের পিতামহগণ দেবতা ছিলেন, অতএব এক্ষণে আমরা বিশ্রাম করিতে পারি—আমাদের নিকট কাহারো কিছু প্রত্যাশা করিবার আবশ্যক নাই। গর্ব্ব করিবার বেলায় অতীত কালকে লইয়া গর্ব্ব করিব, এবং লাঞ্ছনা করিবার বেলায় পরকে লাঞ্ছনা করিব, এবং নিজেদের জড়ত্ব ও অক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে সর্ব্বসমক্ষে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহাকে স্নেহাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া দিব—অহঙ্কার করিব অথচ আত্মোন্নতির চেষ্টা করিব না, অভিমান করিতে থাকিব অথচ অপমানের প্রতিকার করিব না, এইরূপ অদ্ভুত আচরণকে আমরা দেশ-হিতৈষিতা নাম দিয়াছি।

কুকুরের প্রতি মুগুর।

পাশবতা সকল দেশেই আছে—কেবল তাহা নানাপ্রকার শাসনে সংযত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়ের সহিত ব্যবহারে অনেক ইংরাজের পশুত্ব যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় তাহার প্রধান কারণ, ভারত-বর্ষের দিক হইতে তাহাদের পক্ষে কোন প্রকার শাসন নাই। সেই-

জন্য তাহাদের আদিম প্রবৃত্তি, তাহাদের স্বাভাবিক রূঢ়তা নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করে। য়ুরোপের বাহিরে আফ্রিকা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ অথবা উপনিবেশ স্থাপনকালে য়ুরোপীয়েরা আপন অনিয়ন্ত্রিত বর্ব্বরতার সহস্র পরিচয় দিয়া থাকে। নাইট্ নামক এক ইংরাজ ভ্রমণকারী অল্পদিন হইল কাশ্মীর ও তাহার উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিল—সেই ব্যক্তি "Where three empires meet." নামক এক ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছে, তাহাতে স্বজাতি সম্বন্ধে ইংরাজের অপরিমেয় অন্ধ অহঙ্কার, এবং দেশীয়দের প্রতি তাহার অত্যুগ্র অশিষ্ট ঔদ্ধত্য পদে পদে প্রকাশ পাইেছে। ইংরাজ ভ্রমণকারীদের অনেক গ্রন্থেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ইংরাজকে উচ্চতর মনুষ্যত্বের পথে রক্ষা করিতে হয়, যদি তাহার অন্তর্নিহিত পাশবতাকে প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা আবশ্যক বোধ কর—তবে কাঁদিয়া, অভিমান করিয়া, গবর্ণমেণ্টের দোহাই পাড়িয়া তাহা কদাচ হইবে না। বল ব্যতীত পশুত্বের প্রতিষেধক আর কিছুই নাই। আমরা যখন অপমান কিছুতেই সহ্য করিব না, অন্যায় প্রতিকারের জন্য যখন প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইব না তখন ইংরাজ আপন পাশবতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে এবং আমাদিগকে সম্মান করিতে শিখিবে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

নির্ঝরিণী। শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

মহিলা-প্রণীত গ্রন্থ সর্ব্বোতোভাবে নিরপেক্ষচিত্তে সমালোচনা করা কঠিন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সমালোচ্য গ্রন্থের লেখিকা নিতান্ত

অল্পবয়স্কা এবং নববৈধব্যবেদনায় ব্যথিতা। গ্রন্থকর্ত্রীও ভূমিকায় পাঠকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থে "কতখানি কবিত্ব আছে, কতখানি উচ্চতা আছে, কতখানি মাধুরী ও সৌন্দর্য্য আছে তাহার বিচার না করিয়া, বালিকার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পুস্তক প্রকাশিত করা সার্থক হইবে।"

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, নবীনা লেখিকা তাঁহার কবিতাগুলিকে কেবল কবিত্বের হিসাবে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন না, তাঁহার তরুণ হৃদয়ের সুখ দুঃখ শোকের জন্য সমবেদনা প্রত্যাশা করিতেছেন। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর অল্পবয়স এবং সংসারতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা সূচিত হইতেছে। ব্যক্তিগত দুঃখ সুখের প্রকাশ যতক্ষণ না সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীন সৌন্দর্য্য লাভ করে ততক্ষণ সাহিত্যে তাহা কাহারও নিকট সমবেদনা প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সাহিত্যে প্রধানতঃ আত্মহৃদয়ের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। টেনিসনের ইন্ মেমোরিয়ম্ নামক কাব্য কেন সর্ব্বসাধারণের নিকট এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? তাহা টেনিসনের বন্ধুবিয়োগ শোকের প্রকাশ বলিয়া নহে, তাহাতে মানবজাতির বিচ্ছেদশোকমাত্রই বিচিত্র রাগিণীতে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশযোগ্য হইয়াছে—নচেৎ ব্যক্তিগত শোকের প্রকাশ্য বিলাপ টেনিসনের পক্ষে লজ্জার কারণ হইত।

অতএব, এই গ্রন্থের যে যে অংশে মুখ্যরূপে বালিকার আত্মশোকের কথা আছে তাহা আমরা সসঙ্কোচে পরিহার করিতে ইচ্ছা করি। যথার্থ পতিশোকের উচ্ছ্বাসে যখন বালিকা বিধবা বিলাপ করিতে থাকে—তখন সেই বিলাপকে সমালোচনার যন্ত্রাদির দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে বসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেবল

সাধারণ ভাবে এই কথা বলিতে পারি, যে, প্রথম জোয়ারের জলের ন্যায় প্রথম শোকের উচ্ছ্বাসে কাব্যকলার পরমাবশ্যক সংযম অনেকটা ভাসিয়া যায়, সর্ব্বত্রই যেন বাহুল্য দৃষ্ট হইতে থাকে। শোক যখন জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া একটি উদার গম্ভীর বৈরাগ্যের আকার ধারণ করে তথনি তাহা কাব্যে সুন্দর-ভাবে প্রতিফলিত হইবার অবসর লাভ করে।

এই গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকর্ত্রী যেখানেই ব্যক্তিগত শোকের অন্ধ-কারাগার হইতে বাহিরের সৌন্দর্য্য-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায়। "অনন্ত কালের পরিচয়" এবং "বিশ্বপ্রেম" নামক কবিতায় ভাষা ও ভাবের যে নৈপুণ্য ও গভীরতা এবং অকৃত্রিম সত্যতা, দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোন বালিকার রচনায় কদাচ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; এবং তাহা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়।

সাধনা।

বৈরাগ্য।

'দারাসুত পরিবার, কেবা কার কে তোমার,' কেহ সঙ্গে আসে নাই, কেহ সঙ্গে যাবেও না; কেবল চক্রান্ত করিয়া তোমাকে সংসারকারাগারে মোহের শিকলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; যদি বুদ্ধি থাকে ও আপন কল্যাণ চাও, শীঘ্র শীঘ্র শিকল কাটিয়া আপনার পথ দেখ।

চিরদুঃখী মানবজাতির হিতৈষী বন্ধুগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া আত্মীয়স্বজনকে উন্মার্গগমনে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে, এবং এই উপদেশের ফলে অন্ততঃ ভারতবর্ষের চতুঃসীমা মধ্যে এক সুবৃহৎ মানবসম্প্রদায় আপন দারাসুত পরিবারকে ভগবানের করুণায় সমর্পণ করিয়া নিজ ইষ্টলাভ ও শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় বহুদিন হইতে নিযুক্ত রহিয়াছে।

আর সমাজস্থ অবশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে যাহারা বুদ্ধির অভাব বা শক্তির অভাববশে সেই মায়াবন্ধন কাটিতে অসমর্থ হইয়াও উক্ত উপদেশের ভাবগ্রহণে অধিকার ও তাৎপর্য্যগ্রহণে শক্তি রাখে, তাহারা ঐ স্বাধীন মুক্ত পুরুষদের অবস্থার সহিত আপনার যাতনাসঙ্কুল পাশবদ্ধ দশার তুলনা করিয়া জীবনটা মিছা গেল বলিয়া হা হুতাশ ও আক্ষেপ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়।

শাস্ত্রবিশেষে উপদেশ আছে অস্তকার তারিখে মনের আনন্দে

চরিয়া খাও, কল্য তারিখের রুটীর ব্যবস্থা বিধাতা করিয়া দিবেন। নহিলে বোধ করি বিধাতার অসীম কৃপাবত্তায় সন্দেহ প্রকাশ হয়।

দারাসুত পরিবারকে দারত্ব সুতত্ব ও পরিবারত্বে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় বিধাতার অভিপ্রায় অনুসরণের ও অনুমতি গ্রহণের সম্যক্ চেষ্টা পাওয়ার প্রথা আছে কি না জানি না; কিন্তু সংসারের সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দুই একটা গুলির ঘা বা সঙ্গীনের খোঁচা পাইবামাত্র নিরীহ দারাসুতকে শত্রুপক্ষের করুণায় ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিলে বিধাতার দয়াময়ত্বে সম্পূর্ণ নির্ভর প্রদর্শন ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই, ও তৎসঙ্গে সুবুদ্ধি ও দূরদর্শিতারও সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ধর্ম্মের প্রদীপ ভারতবর্ষেও ত্রিশকোটি মানবের মধ্যে অধিকাংশই অদ্যাপি এমন সোজা কথাটা বুঝিল না; অধিকাশই এখনও পুত্রকলত্রের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সংসারের কণ্টকাকীর্ণ গহনপথে চলিতেছে, এবং লবণের ট্যাক্‌স্ ও কাপড়ের মাশুল এড়াইবার উপায়স্বরূপ এমন সনাতন ও সহজবোধ্য গুরূপদেশ বর্ত্তমান থাকিতেও না হক চীৎকার করিয়া প্রকৃতির শান্তিভঙ্গ করিতেছে। এরূপ গর্দ্ধভের উপর কম্পেনসেশন এলাউআন্সের বোঝা চাপাইতে ইংরাজরাজ কেন যে ইতস্ততঃ করিবেন তাহা বুঝি না।

সমুদয় রসায়ন শাস্ত্র মধ্যে লোষ্ট্র ও কাঞ্চনের মধ্যে প্রথমকে ছাড়িয়া দ্বিতীয়ের প্রতি পক্ষপাতের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না; আট প্রহরের সঙ্গী বায়ুর মধ্যেও যখন আর্গন এতকাল ধরিয়া সহস্র রাসায়নিক পণ্ডিতের চক্ষে ধূলা দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিল, তখন আর দশ বৎসরের ভিতরে চাল ডাল বা মৎস্য মাংসও যে বায়ুর মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইবে না, কোন বৈজ্ঞানিক ইহা সাহসের সহিত বলিতে পারেন না; এবং সমগ্র এনাটমি শাস্ত্রের কুত্রাপি

কার্পাসবস্ত্র শরীরের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এইরূপে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে সোণার নিদারুণ মূল্য বৃদ্ধিতে হাহাকার করিবার কারণ থাকে না, ফ্যামিন ফণ্ডের অপব্যয়েও অস্বাভাবিক অশ্রু আকর্ষণের দরকার হয় না, এবং গবর্ণমেণ্ট ম্যাঞ্চেষ্টারের খাতিরে আমাদের সর্ব্বনাশ করিলেন, এই গীত গাহিয়া ভারতবাসীর পৈতৃক রাজভক্তিকেও বিসর্জ্জন দিতে হয় না। লোষ্ট্র কাঞ্চনে অপক্ষপাত, বায়ুভক্ষণ ও দিগ্বসনত্ব শাস্ত্র ও বিজ্ঞান উভয়েরই অনুমত; আমরা শাস্ত্রের অনুশাসনও মানিব না এবং ইংরাজের বিজ্ঞানটুকু পায়ে ঠেলিয়া রাজনৈতিক কোলাহল বিদ্যাটাই আগে শিখিব। অহো বিড়ম্বনা!

যাহাই হউক ইহা অস্বীকার করা যায় না যে কোটিমানে গণিত ভারতবাসীর মধ্যে অন্ততঃ লক্ষমানে গণনীয় ব্যক্তি সংসারের মায়াপাশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বন করিয়াছে; এবং যদি কেহ এই লক্ষমিত ব্যক্তির বিষয়ভোগে অনাসক্তির অকৃত্রিমতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁহাকেও নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে, যে, সংসারত্যাগী বৈরাগীদের অনেকেই কাঞ্চনের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতবর্জ্জিত না হইলেও ললাটের স্বেদপাতনাদি কাঞ্চনলাভের লৌকিক উপায়ে একেবারে আস্থাশূন্য; এবং দারগ্রহণাদি ব্যাপারেও কৃত্রিম সামাজিক প্রথায় বিরক্ত ও বিশুদ্ধ স্বভাবেরই অনুবর্ত্তী।

সম্প্রতি বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের নবাভ্যুদয়ের সময়ে বাঙ্গালীর প্রাচীন পরিচিত দিগম্বর বৈরাগ্যধর্ম্মকে বিদেশের আমদানি শস্তা অথচ শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে পুনরায় উপস্থিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল বৈরাগ্য ধর্ম্মের আচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্যের অনুগামী হইয়া

সংসারতাপক্লিষ্ট মনুষ্যকে বিষয়ান্বেষণ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনের আলেখ্য বাঙ্গালীর শিক্ষার্থ সম্মুখে ধরিবার যত্ন দেখা যাইতেছে। জীবন্ত পাশ্চাত্য জাতির সহিত অর্দ্ধমৃত প্রাচ্য জাতি জীবনদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ায় সংসারের দুর্গম পথ যখন আর একটু দুর্গম হইয়া উঠিতেছিল, জীবনের গতি আর একটু খরতর হইতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ে এই ক্লেশকর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের অপর উপায় বর্ত্তমান আছে, এই পুরাতন গুরূপদেশ পুনরায় গুরুগম্ভীর শব্দে ধ্বনিত হইতে শুনা যাইতেছে। এই সময়ে বৈরাগ্যধর্ম্মের নবগৃহীত আবরণ কথঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া তাহার স্বাভাবিক নগ্নদেহে দৃষ্টিপাত শিষ্টাচার বলিয়া আদৃত না হইলেও স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে। বৈরাগীকে গালি দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বৈরাগ্য ধর্ম্মের আচার্য্যগণের মাহাত্ম্যে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া পাপভাক্ হইতে অভিলাষ করি না। গৃহাশ্রমত্যাগী কৃত্রিমতাশূন্য সাধারণ বৈরাগীও সর্ব্বতোভাবে মহাশয় ব্যক্তি। তাঁহার নিরীহতা ও নির্দ্দোষ স্বভাব সর্ব্বথা অনুকরণীয়। মুশা প্রণীত বা বুদ্ধপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবৃত্তিনিরোধক যতগুলি অনুশাসন আছে, তিনি তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেন; সাধারণ সংসারীর পক্ষে তাহা সম্ভব কি না জানি না। মনুষ্যচরিত্রের উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে সম্মুখসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত, সংযত, প্রতিহত রাখিবার যে প্রকাণ্ড বাহাদুরী, তাহা সংসারমধ্যে কেবল তাঁহারই। এ পক্ষে তাঁহার প্রশংসার সীমা নাই।

বস্তুতই মনুষ্যজীবনে প্রবৃত্তিনিরোধ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মনুষ্য, জীব ও সামাজিক জীব। জীবত্ব ও সামাজিকত্ব এই উভয় ধর্ম্ম লইয়া ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হইয়া মনুষ্য দুই চাপে পিষ্ট ও

দুই টানে ছিন্ন হইতেছে। এই বিষয়ে মনুষ্যের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব আর নাই। তাহার উচ্চ পদবীই তার দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ। মুকুটধারী মস্তকের যেমন শোয়াস্তি নাই, জীবপর্য্যায়ে শীর্ষ-স্থানীয় মানবেরও যাতনার তেমনই অবধি নাই। জীবসাধারণ প্রবৃত্তিগুলি তাহার পুরুষপরম্পরা হইতে আগত হইয়া তাহার অস্থিমজ্জায় প্রলিপ্ত ও শোণিতে প্রবাহিত থাকিয়া তাহাকে সামাজিক শিকল হইতে প্রতিক্ষণে ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে; অপর দিকে প্রবল সমাজশক্তি তাহার উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতাকে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে এক কেন্দ্রে আকৃষ্ট রাখিয়া একই মুখে ঘুরাইবার প্রয়াস পাইতেছে। পুরুষপরম্পরাগত জৈব বল তাহাকে প্রবৃত্তির পথে লইয়া যায়, সামাজিক শক্তি তাহাকে নিবৃত্তি উপদেশ দেয়। মানুষের জীবন একটা ঘোর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

মনুষ্য জাতির ইতিহাসে অবশ্য এমন দিন এককালে ছিল যখন তাহার জীবত্ব বা পশুত্বটুকু তাহার সামাজিকত্বকে অভিভূত রাখিয়াছিল, অর্থাৎ এখন আমরা মনুষ্য সমাজ বলিতে যাহা বুঝি তাহা রীতিমত গঠিত হয় নাই। সে সময়ে মনুষ্য একরূপ স্বচ্ছন্দবিহারী স্বতন্ত্র জীবরূপে আহার বিহার ও বিচরণ করিত। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য প্রভৃতি সূক্ষ্মতত্ত্বের তখন উদ্ভাবন হয় নাই। যেন তেন আত্মরক্ষা ও শরীরপোষণ ব্যাপারটা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাহার জীবনের কার্য্য একরূপ নিষ্পন্ন হইয়া যাইত; এবং প্রাকৃত নিয়মে আপনার বংশরক্ষার উপায় বিধান করিলেই সে স্বজাতির নিকট কর্ত্তব্যদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইত। সমাজ নামক বিরাট পদার্থটা নির্ম্মিত হওয়ার পর প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মার প্রতি ও ---তির প্রতি সেই দুইটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অব্যা-

হতি পাওয়া বড়ই দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুইটার উপর আরও পঞ্চাশটা কর্ত্তব্য কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া মানুষের হাত পা বাঁধিয়া দিয়াছে, ও তাহার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নিয়মিত করিয়া দিয়াছে। এখন আর কেবল প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া প্রাকৃত নিয়মগুলি পালন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে গেলে চলে না ; সমগ্র সমাজ সমবেত হইয়া জোর করিয়া লাঠি তুলিয়া তাহাকে কতকগুলি কৃত্রিম বন্ধনের ভিতর আবদ্ধ রাখিতে চায়। তাহার এমন শক্তি বা সাহস নাই, যে,সেই সমবেত বলের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। যদি কেহ এইরূপ দুঃসাহস অবলম্বন করিতে যায়, তাহার উপর এমন ঘোর নির্য্যাতন উপস্থিত হয় যে, তাহার জীবনরক্ষা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য সুবুদ্ধির মত সমাজের মন যোগাইয়া আপনার স্বভাবলব্ধ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে পারিলে ভাল ছেলে বলিয়া নাম পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের মজ্জাগত চিরন্তন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি তাহার স্নায়ুতন্ত্র এরূপে উত্তেজিত ও তাহার মাংসপেশীগুলিকে এরূপে পরিচালিত করে, যে সমাজমধ্যে ভাল ছেলে বলিয়া পুরস্কার লাভ করা নিদারুণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

কত সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সমাজশক্তি কত রকম উপায়ে, কখন রাজতন্ত্র, কখন লোকতন্ত্র, কখন ধর্ম্মতন্ত্র আখ্যা ধারণ করিয়া, ভ্রূকুটী দেখাইয়া ও দণ্ড উদ্যত করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হায় কয়টা মনুষ্য এই শাসনের সম্পূর্ণ অধীন হইতে পারে ! কয়টা মনুষ্য প্রকৃতই ভাল ছেলে হইয়া আজীবন সমাজজননীর অঙ্ক সুশীতল রাখে !

দুর্ভাগ্য মনুষ্যের যখন এইরূপ সাধারণ অবস্থা, তখন যে ব্যক্তি বস্তুতই তাহার প্রাকৃত প্রকৃতিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিয়া

সম্পূর্ণ নিরীহভাবে সমগ্র জীবনটা কাটাইয়া দেয়, তাহার ক্ষমতার বাস্তবিকই পরিসীমা নাই। মনুষ্যসমাজ যে দিশাহারা হইয়া তাহার ভালছেলেত্ব দুন্দুভিদ্বারা ঘোষিত করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাস্তবিকই কাঞ্চনের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করায় একটা প্রকাণ্ড বাহাদুরী আছে, এবং স্নায়ুযন্ত্রের ও পেশীযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে একটা অমানুষিক শক্তির প্রয়োজন। বৈরাগী এজন্য প্রশংসার্হ।

বৈরাগীর পক্ষে ওকালতি গ্রহণ করিলে যুক্তিতর্কের অভাব হইবে বলিয়া বড় আশঙ্কা থাকে না। উকীল মহাশয়কে নিরুত্তর করা বড় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বৈরাগ্য অর্থে সংসারে আসক্তির ও অনুরাগের অভাব। বস্তুতঃ তোমার সংসারে এমন কি আছে যে সেই সংসারে অনুরক্ত হইয়া আমাকে থাকিতে হইবে? সংসারে প্রলোভনের সামগ্রী এমন কি আছে যে আমি লুব্ধ পতঙ্গের মত সেই মধু আহরণের জন্য ঘুরিয়া মরিব? হৃদয়ে হাত দিয়া একবার বল দেখি যাহাকে মধু বলিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়া আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা প্রকৃত পক্ষে আপাতমধুর হলাহলমাত্র নহে? যাহাকে সুস্নিগ্ধ বারিপূর্ণ সরোবর দেখাইতেছ তাহা প্রকৃত পক্ষে মরীচিকামাত্র নহে? যাহার বর্ণের উজ্জ্বলতায় রূপমুগ্ধ নির্ব্বোধ পতঙ্গকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা মাত্র নহে? এই ত তোমার সংসারের অবস্থা। উহা বালকের জন্য বা নির্ব্বোধের জন্য, উহা মৃগ ধরিবার ফাঁদ, উহা ব্যাধনির্ম্মিত বাগুড়া, আমি বুদ্ধিবলেই হউক বা অভিজ্ঞতাবলেই হউক যখন উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছি, তখন আর আমাকে প্রলোভনের চেষ্টা বৃথা, ইচ্ছাপূর্ব্বক জালবদ্ধ হইতে কে চায়?

আর সরলভাবে সত্য করিয়া বল দেখি সংসারে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় বলিয়া একটা বাক্য তোমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা কি একটা প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনা নহে? এ কথা কি প্রকৃত নহে যে, যে পাষণ্ড নির্ম্মমভাবে আপনার প্রতিবেশীর অস্থিপঞ্জর পদতলে দলিত করিয়া দ্বিধাহীন ও দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া চলিয়া যায়, অনেক সময়ে তোমরা তাহারই জয়ডঙ্কা বাজাও? আর যে ব্যক্তি আপনার শান্ত নিরীহ দুর্ব্বল আত্মাটুকু সাথী করিয়া ভয়ে ভয়ে সংসারভূমিতে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়, কোথায় কে ব্যথিত হইবে কোথায় কে চোখ রাঙাইবে, এই আশঙ্কায় যাহার জীবনের বলটুকু প্রতি মুহূর্ত্তে শুষ্ক হইয়া যায়, তোমরা তাহার দুর্ব্বলতাকে মার্জ্জনা কর না, তাহার জীবনকে যাতনাসংকুল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রটীগুলি তোমাদের হস্তনির্ম্মিত কঠিন পরকলা দিয়া সংসারের চোখে বিকৃত ও প্রসারিত করিয়া দেখাও, এবং সংসারের বিচ্ছিন্ন পথে চলিতে চলিতে যদি তাহার কুত্রাপি পদস্খলনের সম্ভাবনা হয়, তখন তোমরা বন্ধুর মত কাছে ঘেঁসিয়া পশ্চাৎ হইতে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়া তাহাকে একবারে ভূপাতিত করিয়া করতালি দিয়া থাক। তোমাদের উপকারের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন অদৃষ্টবশে আমি তোমাদেরই অনুগ্রহের ভিখারী হইব, তখন তোমরা আমাকে চিনিতে পারিবে? প্রত্যুত আমাকে ধাক্কা দিয়া তোমাদের গৃহদ্বার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিবে না? সম্পদের বন্ধু বিপদে শক্রতাচরণে ক্রটী করে কি? তোমাদের আচরণ দেখিয়া টাইমনের মত মানবদ্রোহী হইতে ইচ্ছা করে না কি? আমি মানবদ্রোহী বা স্বজাতিদ্রোহ হইতে চাহি না, গরীবের ন্যায় সমাজের এক প্রান্তে পড়িয়া থাকি, যেমন দান করিতে পারি না, তেমনি প্রতিদানও চাহি না; আমার উপর তোমাদের রাগ কেন?

বস্তুতই টাইমনের জীবনী কবির কল্পনা মাত্র নহে। সরল পরার্থময় জীবন সাধুব্যক্তির জীবনের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নহে, যখন সে ব্যক্তি মর্ম্মান্তিক যাতনাভরে গৃহবদ্ধ কুপিত মার্জ্জারের ন্যায় মনুষ্যসমাজরূপ আততায়ীকে নখরপ্রহারে ও দন্তাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিতে উদ্যত হয়।

বস্তুতই আমি দেখিতে পাইতেছি ও শিখিয়াছি, তোমার সংসার নাট্যশালার যে কয়খানি সুখের মোহন দৃশ্যপট ধরিয়া রাখিয়াছ উহার সৌন্দর্য্য মোহরূপ ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বর্দ্ধিত ও বিবৃত করা হইয়াছে; কিন্তু ক্ষণকাল পরে প্রদীপটি ও পরকলাখানি সরিয়া গেলেই সমুদয় নাট্যশালা দুঃখের ঘনঘোর তমোজালে আচ্ছন্ন হইবে। আমি ইহা বুঝিয়াছি; সুতরাং ঐ নাট্যশালায় মনুষ্যকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য যে প্রতারণার অবতারণা হইতেছে, তাহাতে আমি আকৃষ্ট হইতে চাহি না। ইহাতে আমার দোষ কি? ইহা হইতে দূরে থাকাই আমার কর্ত্তব্য এবং ইচ্ছা করিয়া প্রতারিত হইতে না পারি, ইহাতে যদি আমাকে দোষ দাও তাহা হইলে নাচার।

সংসারে সুখ কোথায়? যদি বা কোথাও কিয়ৎ পরিমাণে থাকে তাহার স্থায়িত্ব কোথায়? জনকজননী স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন দিনকতক স্নেহ বাসনা ভক্তিশ্রদ্ধা প্রণয়ের কুহকে আবদ্ধ করিয়া কিছুদিনের জন্য সর্ব্বাঙ্গ ভুবারণীদল অমৃতধারায় ডুবাইয়া রাখে সত্য কিন্তু যাহাদের মায়াবন্ধনে জড়িত হইয়া আমি সংসারকে নন্দনকানন ভাবিয়া দুইদিন উল্লাসে স্ফীত হই, দুই দিন পরে সেই স্নেহের পুতলীগুলি একে একে ফাঁকি দিয়া অন্তর্হিত হয়, আমার ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহার জন্য চিন্তামাত্র করে না, তখন আমার উল্লাস আমার অহঙ্কার কোথায় থাকে? তাহাদের অন্তর্দ্ধান ও বিরহ-

জনিত শোকে যখন আমার আত্মা অভিভূত ও ম্রিয়মাণ হইয়া যায়, তখন সমগ্র জগৎ ক্ষণমধ্যে নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইতে দেখিবার জন্য বাঞ্ছা হয়, তখন তুমি কোথায় থাক? তখন তুমি নিষ্ঠুর হৃদয়-হীন বিবেকের বাণী লইয়া গম্ভীরভাবে মনুষ্যসাধারণ দুরদৃষ্ট ও দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আমাকে সুস্থ করিতে আইস; কিন্তু তখন কি সে উপদেশ আমার কানে যায়? তখন কি জগৎসংসার-টাকে একটা মাংসশোণিতহীন, নির্ম্মম নিষ্ঠুর, কঙ্কালময় পিশাচ বা রাক্ষসের প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হয় না? মনুষ্যমাত্রেরই অভিজ্ঞতার যখন এই শেষ ফল, তখন কেন আমি সাধ করিয়া আপন পায়ে শিকল পরিতে যাইব? আমি যে পরিণামের অন্তর্দাহ-কর দুঃখজ্বালা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি, সুতরাং আমি তোমার সংসারের সুখের ভাগী হইতেও চাহি না। এইরূপ সংসারে বাস করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগের কিঞ্চিৎ অভাব প্রদর্শন যদি মার্জ্জ-নীয় না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের মত হৃদয়হীন পদার্থ আর জগতে মিলিবে না।

সংসারী বৈরাগীকে সম্বোধন করিয়া একটা কথা বলিতে পারে। সমাজের নানাবিধ অত্যাচার আছে সত্য; কিন্তু মোটের উপর সমাজ মনুষ্যের কল্যাণের জন্যই স্থাপিত। সামাজিক মনুষ্য দুর্ভাগ্য জীব হইতে পারে, কিন্তু সমাজহীন মনুষ্যের দুর্ভাগ্যের তুলনা নাই। সমাজমধ্যে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও সমাজের অনুগ্রহেই লালিত পালিত হইয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছ; সুতরাং সমাজ যদি কিছু অত্যাচার করে, তাহা তুমি সহ্য করিতে ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। পুত্র যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও জন্মদাতা ও বাল্যে পালনকর্ত্তা পিতার অত্যাচার সহিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য তুমিও সেইরূপ তোমার নিরাশ্রয় অবস্থার আশ্রয়, তোমার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাতা

সমাজের নিকট সর্ব্বদা অবনতমস্তকে থাকিতে বাধ্য। সমাজের হস্তে যে ভীতিজনক দণ্ড উচ্ছৃত দেখিয়া ভয় পাইতেছ, তাহা স্নেহময় পিতা অথবা হিতাকাংক্ষী শিক্ষকের করধৃত শাসনদণ্ডের তুল্য। হইতে পারে তাহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সুবুদ্ধি দ্বারা চালিত ও প্রযুক্ত হয় না, অথবা মানবীয় অপূর্ণতা যেমন সর্ব্বত্র, তেমনি এস্থলেও বিদ্যমান। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই শাসনদণ্ডের অবাধ্য হইবার অথবা তাহা হইতে দূরে থাকিবার তোমার কোন কারণ নাই। জননী প্রকৃতির যেমন এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে অভয় সমাজেরও সেইরূপ ভীমকান্ত উভয় মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে; তোমার চক্ষু অন্ধ বা বিকৃত, তাই তুমি একমূর্ত্তি দেখিতেছ, অন্য মূর্ত্তি দেখিতেছ না। তুমি সমাজের নূন খাইয়াছ, এখন নিমক-হারামি করিও না।

বৈরাগী এইরূপে ইহার উত্তর দিতে পারেন। হইতে পারে আমি যখন আমার জীবনের অথবা আমার কার্য্যের প্রভু ছিলাম না, এরূপ অবস্থায় মনুষ্যসমাজ আমাকে কোলে লইয়া রক্ষা করিয়াছে ও আমাকে লালন পালন করিয়া মনুষ্য পদবীতে স্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে আমি কখনও সমাজের নিকট এরূপ অযাচিত অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে যাই নাই। আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করিয়া সমাজ আমার যে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য সমাজের চরণে কোটি নমস্কার করিতেছি! এবং সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি ভবিষ্যতে আর যেন আমাকে এরূপ অযাচিত অনুগ্রহ-ঋণে আবদ্ধ না করেন। আমি যে কারণেই হউক জীবত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু জীবনে আমি সুখদুঃখের প্রয়াসী নহি, কেবলমাত্র শান্তির প্রয়াসী। সমাজ আমার শান্তিটুকু অপ-

হরণ করিয়া আমার দুর্ব্বল স্কন্ধের উপর যেন আর অনুগ্রহের বোঝা আরোপণ না করেন। জননী প্রকৃতির অনুগ্রহে যখন আমার নাবালকত্ব সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, এবং নিজকৃত কার্য্যের শুভাশুভ ফলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইয়াছি, তখন আমাকে এই স্বতন্ত্রতাটুকু প্রদান না করিলে বড়ই আবদার করা হয়। স্বতন্ত্রতাই বা কতটুক্! আমি তোমার কৃপার বোঝাটুকু ঘাড়ে লইতে অসম্মত, এই পর্য্যন্ত; তোমাদের মধ্যে সকলকেই সুখের জন্য লালায়িত দেখিতেছি, ও নিজ নিজ সুখের জন্য তোমরা কাটাকাটি করিয়া মরিতেছ। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে তোমরা সমাজভুক্ত মনুষ্য সকলেই স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত। আমিও তোমাদের মত জীবধর্ম্মী, সুতরাং সুখাভিলাষী, তবে তোমাদের মত কাটাকাটিতে যোগ দিতে চাহি না। আমার সুখের অর্থ কেবল শান্তি। আমার ক্ষুদ্রত্ব লইয়া আমি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিব কি না সন্দেহস্থল, কিন্তু তেমনি তোমাদের নিকটও আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই। পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ও সম্পূর্ণ মূল্যহীন বায়ু নামক পদার্থই আমার খাদ্যপক্ষে যথেষ্ট, এবং লোকালয়ের বহির্ভাগে দূর অরণ্যমধ্যে প্রশস্ত তৃণভূমি, কোন ব্যক্তি যাহাতে উৎপন্ন ঘাসের জন্য খাজানা দিতে প্রস্তুত নহে, তাহাই আমার শয্যা ও নিবাসস্থল। আমার অস্তিত্ব তোমাদের কাহারও জীবনপথ কণ্টকিত করিবে না, বা আমার জীবনরক্ষার জন্য তোমাদের গবর্ণমেণ্টকে দুর্ভিক্ষ তহবিল হইতে এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতে হইবে না। ইহাতেও যদি আমি তোমাদের নেত্রশূলতা উৎপাদন করি, তোমরা স্বচ্ছন্দে আমাকে ইহজগৎ হইতে অন্য জগতে নির্ব্বাসিত করিতে পার, তাহাতেও আমি আপত্তিমাত্র করিব না। ইহাতেও যদি আমার নিন্দা কর, উপায় নাই।

আমি যশের প্রার্থী নহি, নিন্দাতেও আমার কেশাগ্র বিচলিত হইবে না।

এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। এরূপ নিরীহ শান্তিপ্রিয় জীবের নিন্দাবাদ বাস্তবিকই কঠোরতা হইয়া দাঁড়ায়। এবং বোধ করি এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মানবজাতি কতকটা করুণা-পরবশ হইয়া বৈরাগ্যকে নিন্দা করিতে চাহে না। শত্রুও যখন আপন দুর্ব্বলতা স্বীকার করে বা রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, তখন তাহার প্রতি আক্রমণ কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। যে ব্যক্তি সংসারের সমরক্ষেত্রে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রণে ভঙ্গ দেয়, এবং আপনার শোকতাপক্লিষ্ট জর্জ্জরিত আত্মা লইয়া দূরে লুক্কায়িত রহে, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ অমানুষিক কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। আমরাও এরূপ জীবের নিন্দাবাদে উৎসাহশীল নহি।

তবে কি জীবনসংগ্রামে পলায়ন পাপ বলিয়া গণ্য হইবে না? যে ব্যক্তি সম্মুখ সমর পরিত্যাগ করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষার্থ লুক্কায়িত হইয়াছে আমরা তাহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইব? কিছু দিন হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ লোকের এইরূপ স্তুতিবাদ প্রচলিত ও ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চিরকাল ত এমন ছিল না। বৈরাগ্যধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষেও বৈরাগ্যধর্ম্ম চির-দিন প্রশংসা লাভ করিয়া আসে নাই।

দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম স্বার্থমূলক। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে নহে; মনুষ্যসমাজের স্বার্থে ইহার প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্ম অর্থে আমরা ইংরাজি রিলিজন বুঝি না, ধর্ম্ম অর্থে যাহা সমাজকে ধরিয়া রাখে, যাহার উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা ও যাহার বলে সমাজের স্থিতি ও গতি। এক কথায় সামাজিক মনুষ্যের কর্ত্তব্যসমষ্টিকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাহা সমাজের

স্বার্থের বিরোধী ও প্রতিকূল, যাহাতে সমাজের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তাহাই মোটের উপর অধর্ম্ম। সুতরাং এই অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বার্থমূলক।

বৈরাগী নিরীহ ও নির্দ্দোষ ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহা হইতে সমাজের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। চেতনা-হীন লোষ্ট্রখণ্ডের মত নির্দ্দোষ পদার্থ কিছুই নাই, এবং লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় নিষ্পাপ পদার্থের অস্তিত্বও বিরল। সংসারত্যাগী বৈরাগী কতকটা সেইরূপ। বরং লোষ্ট্রখণ্ড হইতে মনুষ্য কিছু না কিছু উপকারের প্রত্যাশা রাখে, কিন্তু কর্ম্মবর্জ্জিত বৈরাগ্যাবলম্বী হইতে কখন কোন লোকহিতের প্রত্যাশা আছে বোধ হয় না। সমাজের স্বার্থ তাঁহার কর্তৃক এক পাদপ্রমাণ অগ্রসর হয় না, সুতরাং তাঁহাকে ধার্ম্মিক আখ্যা দিলে ধর্ম্মের সংজ্ঞা উলটাইয়া দিতে হয়।

সমাজের ভিতর বাস করিয়া তাহার নিগ্রহ ও অত্যাচার সহ্য করিতে তোমার প্রবৃত্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু সমাজ সে কৈফিয়তে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য নহে। তুমি শান্তিলাভের আশায় স্বার্থের জন্য যেমন সমাজ হইতে দূরে পলাইতেছ, সমাজও সেইরূপ আপন স্বার্থ সাধনের জন্য তোমাকে আপনার নিকট টানিতেছে। যদি তুমি ধরা না দাও, তাহাতে তাহার স্বার্থের ব্যাঘাত, সুতরাং তোমাকে প্রশংসা না করিবার যথেষ্ট কারণ তাহার বর্ত্তমান আছে।

জননী প্রকৃতির কোটি সন্তানের মধ্যে দুই একটী বিগড়াইয়া গেলে বা বিদ্রোহাচরণ করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই আপাততঃ মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্য তেমন নহে। সূর্য্যের মত প্রকাণ্ড বস্তুটার কাছে সাগরবেলায় স্তূপীকৃত কোটি কোটি

বালুকণার অন্তর্গত একটি কণা নগণ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নগণ্য নহে; উভয়ের মধ্যে একটির গণনায় ভুল হইলে বিশ্বরাজ্যের হিসাবনিকাশের সময় সমান গোল বাধিয়া যায়। উভয়ের মধ্যে যে কোনটির অভাব হইলে বিশ্বযন্ত্র সমানভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্যশরীরের মধ্যে অস্থি ও শোণিত, স্নায়ু ও ধমনী উভয়েরই যেমন সমান দরকার, একটার অভাব হইলে সমগ্র যন্ত্র বিকল হয়, সেইরূপ প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল হইতে নগণ্য বালুকাকণা উভয়েরই জগৎ যন্ত্রের স্থিতি ও গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য সমানভাবে দরকার। আমাদের সহিত প্রকৃতির এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভেদ বর্ত্তমান, প্রকৃতির নিকট কোটি টাকারও যে মূল্য কড়াক্রান্তিরও ঠিক সেই মূল্য। হিসাবে একটা কপর্দ্দকের তফাত হইবার যো নাই।

সুতরাং আমার অপর কোটিসংখ্যক ভ্রাতা বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমি স্বচ্ছন্দে স্বাধীন হইয়া বিচরণের দাবী করিতে পারি না। আমার কর্ত্তব্যপালনের জবাবদিহী আমার, অপরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

তুমি সামাজিক নিগ্রহের ভয় করিতেছ, ও তুমি মানবজাতি হইতে দূরে রহিতে চাহিতেছ, কিন্তু মানবজাতি তোমাকে চাহে। তুমি আর পাঁচজনকে অঙ্গুলিসঙ্কেত দেখাইয়া দিয়া নিজে এড়াইতে চাহিলে চলিবে না। তুমি ছাড়িতে চাহ, কিন্তু মানবজাতি তোমাকে ছাড়িবে না। যে মুহূর্ত্তে তুমি মানবত্ব লইয়া ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছ, সেই মুহূর্ত্ত হইতে মানবজাতি তোমার উপর একটা প্রকাণ্ড স্বত্বাধিকার লাভ করিয়াছে। হইতে পারে সেটা তাহার গায়ের জোর মাত্র; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভূমণ্ডলে সমুদয় স্বত্ব ও সমুদয় অধিকার গায়ের জোর হইতেই সমুৎপন্ন।

ভূপৃষ্ঠে ফল জল সোণারূপা যেখানে যাহা পাওয়া যায় এবং যাহা তোমার দরকারে লাগে তাহা তুমি আত্মসাৎ করিবে, সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মনুষ্যের শ্রবণবিবরে এই মধুর বাণী কহিয়া দিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদন্তী জনসমাজে প্রচলিত থাকিলেও তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে কোনরূপ সূক্ষ্ম প্রমাণ নাই। মানুষ নিজের গরজে এইরূপ কথার সৃষ্টি করিয়াছে এবং পার্থিব যাবতীয় পদার্থে আপনার চিরন্তন স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে। ঠিক সেইরূপ বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যজাতি তাহার অন্তর্ভুক্ত তোমার উপরেও তাহার অধিকার স্থাপিত করিতে চায়। তুমি তাহা এড়াইতে চেষ্টা করিতে পার—তোমার শান্তির, তোমার স্বার্থের জন্য। মনুষ্যজাতি সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়; তাহার নিজের স্বার্থের জন্য। তুমি যদি মনুষ্য জাতিকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হও, সেও তোমাকে নিগ্রহ করিতে ও জ্বালাতন করিতে ছাড়িবে না। তোমাকে ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান্ অভিধানে আহ্বান করিবে না। নিউটনের প্রতিভা ও নিউটনের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সেই প্রতিভার ও সেই ক্ষমতার অপব্যয় ও অপচয় করিলে, অথবা তাহাকে মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত না করিলে উৎকট পাপাচরণ হয়, এবিষয়ে কেহ সন্দেহ করিবে না। তবে সকলে কিছু নিউটনের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তথাপি তোমার যে একটু ক্ষমতা আছে, সেইটুকু তোমাকে মনুষ্যজাতির কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। এক হিসাবে জগতের শ্রেষ্ঠতম সূর্য্যমণ্ডলের এবং সামান্য বালুকাকণার মধ্যে ব্যবধান বর্ত্তমান থাকিতেও আর এক হিসাবে উভয়েই তুল্যমূল্য। সেইরূপ তুমি নিউটনের প্রতিভার কণিকামাত্র না পাইলেও মনুষ্যজাতির নিকট তোমার নিউটনের সহিত সমান দর। 'জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ

ক্ষুদ্রজন্তবঃ' বাক্যটা এক অর্থে ঠিক্ বটে, কিন্তু মদ্বিধ ক্ষুদ্র জন্তুরও জীবনের মূল্যের পরিমাণ অন্য এক অর্থে নিউটনের প্রকাণ্ড জীবনের সমতুল। দুইয়ে কিছুই তফাত নাই।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার আমার ক্ষুদ্র শক্তির অসাধ্য সন্দেহ নাই, এবং আমার জীবনকাহিনী ভবিষ্যতের ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। তথাপি আমার একটা সঙ্কীর্ণ পরিধিবিশিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে আমাকে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহা মনুষ্যমাত্রের সাধারণ দায়িত্ব। আপনাকে কেন্দ্রবর্ত্তী করিয়া ক্ষুদ্রবাহুদ্বয় চতুর্দ্দিকে প্রসারণ করিয়া সেই পরিধিরেখা আমাকে নিজচেষ্টায় টানিয়া লইতে হইবে। এই দায় হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা পাইও না।

পল্লীবাসী কৃষক খায়, খেলায়, আপনার ক্ষেতটুকু চাষ করিয়া ফসল তোলে ও কিছুদিন আপন পুত্রকলত্রের ভার বহিয়া মরিয়া যায়। তাহার জীবনের ইতিবৃত্ত কেবল খানিকটা খাওয়া দাওয়া খানিকটা হাসিকান্না ও খানিকটা বিবাদ বিসম্বাদ মাত্রেই পর্য্যবসিত। তাহার মৃত্যুর দুই চারিদিন পরে তাহার নাম কাহারও স্মরণে থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জীবনকে নিষ্ফল বলা চলিবে না। প্রকৃতি কর্ত্তৃক যে কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, সে যথাশক্তি তাহার সাধনাতে নিয়ত আছে। জড়রাজ্যে যেমন প্রত্যেক পরমাণুর স্থান আছে, এবং কোনটিই অযথাস্থানে সন্নিবেশিত নাই, তেমনি ধর্ম্মরাজ্যে তাহারও আসন নিরূপিত রহিয়াছে, সেই আসন হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার কাহারও অধিকার নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবন মনুষ্যের জাতীয় জীবনের উপাদান; সেই ক্ষুদ্র জীবনটুকু গণনায় না ধরিলে জাতীয় জীবনের ঠিকে ভুল হয়।

সত্য বটে সংসারে থাকিলে অপরের সহিত বিবাদ করিতে হয়,

চিরকাল প্রহার সহ্য চলে না, দুই একটা প্রহার দিতেও হয়। এবং প্রহার দেওয়া স্থূলতঃ নিন্দনীয় কাজ। স্থূলতঃ নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র নিন্দনীয় কে বলিল? এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে, এই উক্তি শুনিতে বড়ই মধুর; কিন্তু সর্ব্বত্র এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে মনুষ্যসমাজের হিতের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা সন্নীতি-সম্মত বা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

বর্ত্তমান কালে জীবনের নাম দ্বন্দ্ব,এবং সেই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ায় অধর্ম্ম নাই। ঘা দিতে হইবে বলিয়া ঘা সহিতে কাতর হইও না; পদস্খলন হইবে বলিয়া পা ফেলিতে ইতস্তত করিও না। নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে জীবনদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হও। ইহাই মনুষ্যের প্রতি প্রকৃতির আদেশবাণী।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন স্বজনপরিচালিত কৌরব অক্ষৌহিণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার শরীরে বেপথু ও রোমহর্ষ উৎপন্ন হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে, আমি বিজয়াভিলাষ করি না, রাজ্যভোগ ও সুখভোগ আমার বাঞ্ছনীয় নহে। এরূপ মহতী বাণী মনুষ্যবদন হইতে সচরাচর বহির্গত হয় না। তথাপি অর্জ্জুনের এই আকস্মিক বৈরাগ্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া অনুমোদিত হয় নাই।

"দ্যাবা পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন,জননীসমা নদী ও নির্ঝরবান্ পর্ব্বত আমাদিগকে রক্ষা করুন; সূর্য্য ও উষাদেবী আমাদের অপরাধ লইবেন না।" আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জীবনে আসক্ত হইয়া এইরূপে প্রকৃতির নিকট প্রার্থনা করিতেন। "যাহাতে ভূতগণের পীড়া না হয়, একান্তপক্ষে অল্পমাত্র পীড়া জন্মে, এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবে। অগর্হিত কর্ম্মের

দ্বারা, শরীরকে ক্লেশ না দিয়া, ধনসঞ্চয় করিবে।" "যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব জন্তু বাস করে, সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া সমুদয় আশ্রম বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ, অতিথিগণ, সকলেই গৃহস্থের প্রত্যাশী; গৃহাশ্রমের পর আশ্রম নাই।" এইরূপ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান। "কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, ফলকামনায় তোমার রতি না থাকে; ফলকামনা তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয়; কর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার আসক্তি না জন্মে।" এইরূপ আমাদের পুরাকালীন ভগবদুক্তি।

জীবন যাতনাসঙ্কুল সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কর্ম্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই। আসক্তি ত্যাগ কর; অর্থাৎ কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মাচরণ কর; ফলকামনা করিও না; কর্ম্মত্যাগে কিন্তু তোমার *অধিকার নাই। ইহাই ছিল সে কালের অনাসক্তি; সে কালের* বৈরাগ্য; সে কালের সন্ন্যাস। সে কালের, যে কালে মনুষ্যজীবনের মূল্য ছিল; মনুষ্যাত্মা নির্ভীক চিত্তে বিশ্বজগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিত; মনুষ্যাত্মা আপনাকে বিশ্বজগতের ঈশ্বর বলিয়া জানিত। শুদ্ধ জ্ঞান এই বৈরাগ্যের প্রসূতি; ভক্তি ও তৃপ্তি ও মুক্তি এই বৈরাগ্যের ফল।

এই মহিমান্বিত বৈরাগ্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আমরা এক্ষণে কি পাইয়াছি? জনৈক বৈষ্ণব আচার্য্যের মুখে শুনিতে পাই;—

পাপ পুণ্যময় দেহী, সকলি অনিত্য এহি,
ধনজন সব মিছা ধন্ধ।
মরিলে যাইবে কোথা ইহাতে না পাও ব্যথা
তভু কর নিতি কার্য্য মন্দ॥

পুনশ্চ—

বিষয় গরলময়, তাতে মান সুখচয়,
সে না সুখ দুঃখ করি মান।

আবার—

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিঞা কেনে খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

মানবাত্মার এই ঘোর অবমাননা, তাহার মহিমার প্রতি এই অবজ্ঞাসূচক বিদ্রূপবাণী, মনুষ্য কিরূপে নির্ব্বিকারে সহ্য করে বলিতে পারি না। কি নিদারুণ পরিণাম! কি ভয়াবহ অধঃপতন!

সুতরাং সংসার ত্যাগ করিয়া তুমি শান্তি লাভ করিতে পার, তোমার স্বার্থসাধন ঘটিতে পারে; কিন্তু মানবজাতি তোমাকে ক্ষমা করিবে না। তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিহার করিয়া তুমি আপনাকে নির্জীবত্বে অথবা লোষ্ট্রত্বে পরিণত করিতে পার; কিন্তু ধার্ম্মিকের উচ্চ পদবীতে তোমাকে বসাইতে পারিব না।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। দুঃখবিমুক্তিই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ; এবং সহস্র যুক্তি সত্ত্বেও মনুষ্য সেই দুঃখবিমুক্তির আশায় লালায়িত থাকিবে। সংসার যদি সকল দুঃখের নিদান হয়, তবে মনুষ্য কিসের আশায় সেই মোহপাশে আবদ্ধ থাকিবে?

মুক্তিকামনা আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু মুক্তির পথ তত সহজ নহে। মনুষ্যাত্মার মর্য্যাদা অবমানিত করিয়া, মনুষ্যকে জীবনহীন ধূলিমুষ্টিতে পরিণত করিয়া, দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ না করিতে পারে এমন নহে; কিন্তু তাহা জড়ের বাঞ্ছনীয়, আত্মার

বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। সংসারের শোণিতকর্দ্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া, আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকাতেই মনুষ্যের গৌরব; এবং এই জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষা লাভ হয় তাহারই চরম ফল মুক্তি। এই শিক্ষার ফলে মনুষ্যের এমন অবস্থা এক সময়ে উপস্থিত হইবে যখন সে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ত্তব্যসাধনই তাহার জীবনের সংজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞান করিবে, তোমরা যাহাকে যন্ত্রণা বল, সেই যন্ত্রণার অনুভূতিই আত্মার বিকাশের ও অভিব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিবে; দুঃখভোগশক্তিই মনুষ্যাত্মার মহামহিমাময় গৌরবের প্রকৃত নিদান বলিয়া মানিয়া লইবে; এবং আপনার প্রতি, পুত্রকলত্রের প্রতি, স্বজন বান্ধবের প্রতি, স্বজাতির প্রতি, বিশ্বের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই এমন এক পরমা প্রীতি, এমন এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, এমন এক অকৃত্রিম আনন্দ, অনুভব করিবে, তোমার নির্জ্জীব, জড়োচিত শান্তি তাহার নিকট দেব সবিতার বরেণ্য ধীপ্রণোদক জ্যোতির নিকট অমানিশার ম্লান অন্ধকার স্বরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।

ইহাই প্রকৃত মোক্ষ, ইহাই প্রকৃত পরম পুরুষার্থ, ইহারই পন্থা প্রকৃত বৈরাগ্য। আমাদের জাতীয় জীবনের একতর মহোপাখ্যানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বৈরাগ্যধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন; আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতর মহাগীতিকাব্যে কবিকুলগুরু বৈরাগ্য ধর্ম্মের মহামহিমান্বিত আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ দেখাইয়াছেন। সে পথ অনুসরণ না করি, সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

ভাষা-তত্ত্ব।

(মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালা)

বিগত বৈশাখ মাসের "সাধনা"য় "মারাঠী ও বাঙ্গালা" ইতি শীর্ষকে এক উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় ভাষার গঠন, ভাব ও মারাঠী সাহিত্য সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাথী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ভাব ও গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং উল্লিখিত "মারাঠী ও বাঙ্গালা" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যসেবিগণ উপকার লাভ করিতে পারিবেন, আশা করা যায়। আমরাও সেই উদ্দেশ্যে উক্ত প্রবন্ধের পূরণিকা-স্বরূপ কয়েকটি কথা বলিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

কিরূপে এক প্রাচীন প্রাকৃত-আর্য্য ভাষা হইতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উপভাষা সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা পোষ মাসের সাধনায় "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। সেই প্রসঙ্গে যে সকল মারাঠী ও বাঙ্গালা শব্দের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহাদের কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছি। মনোযোগের সহিত ভারতীয় ভাষাসমূহ আলোচনা করিলে, বাঙ্গালা ও মারাঠী ভাষার সহিত অপরাপর ভাষার নানা বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা প্রথমতঃ শব্দগত সাদৃশ্যের উল্লেখ না করিয়া কতিপয় বিভক্তি ও প্রত্যয়গত সাদৃশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

১। বাঙ্গালা ভাষায় কেবলার্থে ও নিশ্চয়ার্থে শব্দের উত্তর

"ই" যোগ হয়। যথা, - তিনিই। হিন্দী ভাষাতে এই অর্থে "ঈ" প্রত্যয় হয়। যথা, "উস্‌নে" ও "উসীনে"। তামিলী ভাষায় এরূপ স্থলে "এ" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় "এব" একটি নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। আমাদের বোধ হয়, এই "এব" হইতেই তামিলী ভাষায় বকার লুপ্ত হইয়া নিশ্চয়ার্থে "এ" কার হইয়াছে। শব্দবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে "ই"কার স্থানে একার বা একার স্থানে "ই" বা ঈকার হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নহে।

গুজরাথী ও মারওয়াড়ী ভাষায় নিশ্চয়ার্থে "ঝ" অব্যয় ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এরূপ স্থলে "চ"-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। "চ" ও "ঝ" এক বর্গীয় বর্ণ—এখানে এইটুকু সাদৃশ্য। হিন্দী ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাতে দুইটি মাত্র লিঙ্গ আছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাথী ভাষায় তিন লিঙ্গ।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় "সকল" শব্দ বহুত্ব-বোধক। তামিল ও মারাঠী ভাষায় "সকল" এর স্থলে যথা-ক্রমে "সগল" ও "সগলঁ" পদ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় "সকলই" স্থলে "সগরি" পদের ব্যবহার ছিল। তামিল ভাষায় বহু বচনে "গল", কর্ণাটকীয় ভাষায় "গলু" ও তেলিঙ্গানায় "লু" বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় "দিগ" ও "দিগর" বহু বচনের বিভক্তি। ইহা কি সংস্কৃত "আদি" শব্দের অপভ্রংশ? বাঙ্গালায় "প্রভৃতি" বুঝাইতে "দিগর" এর ব্যবহার দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সেই অর্থে "আদীক" শব্দ ব্যবহৃত হয়। "আদীক" হইতে "আদিগ", ও তাহা হইতে "দিগ" পদের উৎপত্তি অসম্ভব নহে।

পাঞ্জাবী ও তেলেগু ভাষায় "নু" ও কর্ণাটকী ভাষায় "ন্নু" কর্ম্মকারকের বিভক্তি। মহারাষ্ট্রী পাঞ্জাবী ও হিন্দী ভাষায় "নে" করণ কারকের বিভক্তি। গুজরাথী ভাষায় করণের বিভক্তি

"এ"। সম্প্রদান কারকে তামিল ও উড়িয়া ভাষায় "কু", হিন্দীতে "কো", বাঙ্গালায় "কে", কর্ণাটকী ভাষায় "গে" ও "কে" এবং তেলেগুতে "কি", "কু", "কো", বিভক্তি যুক্ত হয়। হিমালয় প্রদেশে "বোদো" নামক এক জাতি বাস করে। তাহাদিগের ভাষায় সম্প্রদানের বিভক্তি "খো"। বিভক্তির কত দূর সাদৃশ্য তাহাও চিন্তনীয়। মহারাষ্ট্রী, তিব্বতীয়, পষ্টু ও সাইরো আরবীয় ভাষায় সম্প্রদানের বিভক্তি "লা"। বাঙ্গালা পদ্যে সম্প্রদানে "রে" বিভক্তির যোগ হয়। "রলয়োরভেদঃ"।

সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চমী স্থানে "তস্" হয়। পাঞ্জাবী ভাষায় "তে", বাঙ্গালায় "হইতে", হিন্দি ভাষায় "সে" ও গুজরাথী ভাষায় "থী" অপাদানের বিভক্তি। মারাঠী ভাষায় "উন্'' যোগ হয়। প্রাকৃত ভাষায় "উ" যোগ হইত। গুজরাথী ভাষায় সম্বন্ধ পদের বিভক্তি "নু", কর্ণাটকী ভাষায় "ন", তামিলী ভাষায় "ইন" এবং প্রাচীন মারাঠী ভাষায় "চেনি"। তেলেগু ভাষায় সম্বন্ধে "য়োক্‌ক" বিভক্তি যোগ হয়। হিন্দীতে তাহার স্থানে "কা", মারাঠীতে "চা", সিন্ধুপ্রদেশীয় ভাষায় "জা", ও সিংহলে "গে'' ব্যবহৃত হয়। *

বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় আখ্যাত প্রত্যয়গুলির মধ্যে কতক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এবিষয়ে বাঙ্গালা অপেক্ষা মহারাষ্ট্রীয় ভাষা সংস্কৃতের অধিকতর অনুগামী। সংস্কৃত বর্ত্তমান কালে প্রথম পুরুষের একবচনে "তি" ও "তে" বিভক্তি যোগ হয়। প্রাচীন প্রাকৃত ও আধুনিক মারাঠী ভাষায় পদ্যে "তি" ও "তে"র পরিবর্ত্তে "ই" ও "এ" ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালাতেও "এ" বিভক্তি অনুরূপ স্থলে ব্যবহৃত হয়। যেমন "সে করে"। মারাঠীপদ্যে বর্ত্তমান কালে

* Journal of the R. A. S. (Bom) 1859.

মধ্যম পুরুষের এক বচনে "সি" ও গদ্যে "ওস্" বিভক্তি হয়। বাঙ্গালাতে এরূপ স্থলে "ও" ব্যবহৃত হয়। উত্তম পুরুষের এক-বচনের বিভক্তি সংস্কৃতে "এ" ও "মি," মারাঠীতে "এঁ" ও "ই" এবং বাঙ্গালায় "ই"। প্রথম পুরুষের বহুবচনে সংস্কৃতে "অন্তি" ও মারাঠীতে "তি" হয়। এই সকল বিভক্তি পদ্যে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা পদ্যে যেরূপ অতীত কালের প্রথম পুরুষে বর্ত্তমান কালের বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে, মহারাষ্ট্রীয় কবিতাতেও ঠিক সেই-রূপই হয়।

অতীতকালে বাঙ্গালার ন্যায় মারাঠীতেও মধ্যম পুরুষের এক-বচনে "লে" বিভক্তি হয়। যথা,—তুমি করিলে। "ত্বাঁ কেলেঁ"। মারাঠী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই পুরানিত্যবৃত্ত বা রীতি ভূত-কালে "ইত" বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা,—তাহারা করিত। "তে করীত"। কতকগুলি বাঙ্গালা অতীত কালের ক্রিয়ার রূপের সহিত মারাঠী ক্রিয়াপদের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যথা,—(প্রথমে বাঙ্গালা ও পরে মারাঠী)—কৈল—কেলঁ (ক্লী); পড়িল—পড়লঁ; দেখিলা (পদ্যে)—দেখিলা (ম) গদ্যে। এইরূপ অবলোকিলা, গেলা, জায় (বাঙ্গালা "যায়") বৈসে, বরিলা, প্রবেশলা (বাং প্রবেশিল) বন্দিলা, খেলে নমিলা, কব, বৈস প্রভৃতি মারাঠীয় প্রয়োগ বাঙ্গালার অনুরূপ। বাঙ্গালায় বিধিবোধক ও আজ্ঞার্থক ধাতুর মধ্যম পুরুষের বিভক্তি "ও"; মারাঠীতে উহা প্রথম পুরুষের বিভক্তি।

মারাঠী প্রচলিত গদ্য ভাষায় ক্রিয়ার রূপগুলি সংস্কৃত বর্ত্তমান ও অতীতকালে বাচক "ক্ত" প্রত্যয়ান্তধাতুসাধিত বিশেষণ অর্থাৎ কৃদন্ত হইতে গৃহীত। একটা উদাহরণ দিতেছি। বাঙ্গালায় 'যা' ধাতুর উত্তর মধ্যম পুরুষের বিভক্তিতে "ও" যোগ করিয়া 'যাও' পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু মারাঠীতে 'জা' ধাতুর উত্তর মধ্যম পুরুষের

বিভক্তি "ওস" যোগ করিতে হইলে প্রথমতঃ ঐ ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানে ক্ত প্রত্যয় করিয়া "জাত" পদ সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, পরে উহাতে "ওস" যোগ করিয়া "জাতোস" পদ সিদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপ "পূজ" ধাতুর উত্তর "ওস" প্রত্যয় করিলে "পূজিতোস" পদ নিষ্পন্ন হয়। (১)।

মারাঠী ক্রিয়ার রূপগুলি এইরূপ ক্ত প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত হইতে গৃহীত বলিয়া, লিঙ্গ ও বচন অনুসারে ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে রূপান্তর উপস্থিত হয়। মারাঠী ভাষায় বর্ত্তমান ও অতীত কালের বিভক্তি অভিন্ন। অতীতকালে কেবল "ক্ত" প্রত্যয়ের "ত" স্থানে "ল" হয়। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় "ল" স্থানে "দ" বা "ড়" হইত। আধুনিক মারাঠীতে "ড়" স্থানে "ল" হইয়াছে। বাঙ্গালাতেও অতীতকালে "ল" হয়। যথা-ক্রমে উদাহরণ,—পড়তঁ (বর্ত্তমান); পড়লঁ (ভূত); পড়িল (বাঙ্গালার অতীত)।

২। সংযুক্ত বর্ণাত্মক সংস্কৃত শব্দগুলি দেশী ভাষায় প্রবেশকালে তাহাদিগের যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে একটি এই যে, হয়, সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে একটি স্বরের আগম হইয়া উহাকে সরলীকৃত করে, না হয়, সেই সংযুক্ত বর্ণের অন্তর্গত একটি বর্ণ বিলুপ্ত হয় ও সেই অভাব পূরণ জন্য বর্ণ দীর্ঘ হয়। ভারতের

---

(১) স্ত্রীলিঙ্গে "ওস" স্থানে "এস" হয়। ইহা হইতে বাঙ্গালা "পূজিতেছে" ক্রিয়ার "এ ছ" প্রত্যয়ের মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ হয়, বাঙ্গালা ক্রিয়া পদেরও সাধন ক্রম অনেকটা মারাঠীর অনুযায়ী। মারাঠীর ন্যায় বাঙ্গালাতেও অধিকাংশ ক্রিয়াপদের রূপও প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত হইতে গৃহীত। তার পর, মারাঠীতে যেরূপ "সি" বিভক্তির ইকার পরিত্যক্ত হইয়া, বিভক্তির সকারের পূর্ব্বে লিঙ্গ ও বচনভেদে "এ" "ও" প্রভৃতি স্বরের আগম হইয়াছে, বাঙ্গালাতেও অনেকটা সেইরূপ প্রক্রিয়া হয়; এবং সকার হকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপে আমরা পূজিত এহ "পূজিতেহ" প্রাপ্ত হই। বাঙ্গালার বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ বিভক্তির ক্রিয়াপদগুলির সাধন-ক্রম বোধ হয়, এইরূপ।

কোনও প্রাদেশিক ভাষায় প্রায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ইহার উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দ এখানে উদ্ধৃত হইল। ধর্ম্ম—ধরম। মর্ম্ম—মরম। চর্ম্ম—চাম; কর্ম্ম—কাম (হিন্দী ও মারাঠী)। অষ্ট—আট; জম্বু—জাম; মল্ল—মাল (হি), বজ্র—বাজ, তক্র—তাক (মা); শম্বুক—শামুক; হস্ত—হাত; কর্ণ—কান; পত্র—পাত; চন্দ্র—চাঁদ। ইত্যাদি।

অপভ্রংশ কালে "দ" স্থানে "হ" হয়। যথা, এতদ্=ইহা, হয় (হিন্দী); হেঁ (মা)। তদ্=তাহা; বহ (হিন্দী)। মুদ্রা=মোহর। মারাঠী ভাষায় "মোহর" ও "মোহরা" এই দ্বিবিধ রূপই প্রচলিত আছে। "ধ" স্থানেও "হ" হয়। যথা,—গোধূম=গহুঁ (হি ও মা)। বধির=বহির (কালা—হিন্দী ও মা)। রুধির=লহু (হিন্দী)। "দ" স্থানে কখনও কখনও "জ" হয়। যথা, বাদন=বাজন; নিদ্রা=নীজ (মা)। অদ্য=আজ; এখানে য কারের বিলোপে পূর্ব্ববর্ণ অকারের দীর্ঘ হইয়া আকার হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে ও বেহার অঞ্চলে অশিক্ষিতেরা বিক্রমাদিত্যকে 'বিক্রমজিৎ' বলে। বাঙ্গালা দিদী=মারাঠী জীজী।

৩। প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতায় ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ মারাঠী কবিতাতেও দৃষ্ট হয়। যথা,—(প্রথমে বাঙ্গালা পরে মারাঠী) নেহারিল—নেহালিলেঁ; উত্তরিল=উতরলেঁ। হট বা হঠ (জেদ)—হট্ট। হেচ্‌কি (হিক্কা)=উচ্‌কি। উথার—উথড়। ভণে—ম্ভণে। যৈছন—জৈসেঁ। পুছে—পুসে। দেউঠী—দিউটী। "হাব্যাস" শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় কি অর্থে ব্যবহৃত হইত জানি না। কিন্তু মারাঠী ভাষায় "হাব্যাস" অর্থে—প্রেমপিপাসা। আর একটি শব্দ আছে—নিবড়িল। ইহার অর্থ মারাঠী ভাষায় "নির্ব্বাচন করিল"। বাঙ্গালা কি অর্থে ব্যবহার হয়, অবগত নহি।

কতকগুলি দেশী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা,—সাঙ্গা—প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহার অর্থ "সঙ্গ"। সাঁওতাল পরগণায় ইহা "কড়িকাঠ" (Beam) অর্থে ব্যবহৃত। মারাঠীতে "সাঙ্গা" অর্থে "কথা বলা"। "দাদ" শব্দের অর্থ বাঙ্গালায় চর্ম্মরোগ বিশেষ; মারাঠীতে "নালিশ করা"। এরূপ অর্থভেদের কারণ কি? "ডাঙ্গ্" শব্দ সাঁওতাল পরগণায় "দণ্ড" অর্থে ব্যবহৃত। এই প্রদেশে "ডাঙ্গর" অর্থে "গরু"। ময়মনসিং অঞ্চলে ইহার অর্থ "বড়"। ডাঙ্গর শব্দের অপর রূপ "ডাগর"। মারাঠী ভাষায় "ডাঙ্গর"—খাদ্য বিশেষ; এবং "ডোঙ্গর"—পাহাড়। বাঙ্গালার কোনও কোনও প্রদেশে ডেঙ্গুর অর্থে "উকুণ"। "রড়" অর্থে বাঙ্গলায় "দৌড়দেওয়া"; মারাঠীতে "ক্রন্দন করা"। মারাঠী "রড়" শব্দ বোধ হয় রুদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কিন্তু বাঙ্গালা "রড়" শব্দের মূল কি?

মারাঠী ভাষায় "মোচা" অর্থে "জুতা"; এবং যে জুতা গড়ে তাহাকে "মোচী" (বাঙ্গালা "মুচি") বলে। ময়মনসিং অঞ্চলে মুচিকে "মোচার" বলে। এইরূপ অর্থে "আর্" প্রত্যয়ের উদাহরণ, কুমার (কুম্ভার—মারাঠী), কামার, চামার, maker, প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।

৪। ইংরাজী ভাব ভাষায় প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বাঙ্গালা ও মারাঠী ভাষায় যে সকল নূতন শব্দের প্রবর্ত্তন হইতেছে, তাহাদের তুলনা দ্বারা ভাষা সৃষ্টির বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। "মারাঠী ও বাঙ্গালা" প্রবন্ধের লেখক এইরূপ কতকগুলি নূতন শব্দের উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত তালিকায় যে সকল শব্দ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার কতকগুলি আমরা এস্থলে সংকলন করিয়া দিলাম।

সর্ব্বসংগ্রহ (Encyclopedia) মণ্ডলী (Company) একাবয়বী শব্দ (Mono-syllable) বাচন পাঠ (Reading Lesson) নিয়মিক উপপদ (Definite Article) অপূর্ণবর্ত্তমান (Present Participle) প্রবাস সাহসী (Adventurous) সার্ব্বজনিক (Public) লোকমত (Public opinion) বৃহদ্বক (Flamingo) কাঞ্চনপক্ষী (Bird of Paradise) হ্রস্বশৃঙ্গ পক্ষী (Rhinoceros bird) পরচক্র (An invading army) দন্তকথা (Popular story) বানর-চেষ্টা (Monkey tricks and antics) সম্ভাষণ (Conversation) ভাষণ (Discourse) মুখ পৃষ্ঠ (Title page) মল-পৃষ্ঠ (Flyleaf) অক্ষরন্যাস পদ্ধতি বা অক্ষর পদ্ধতি (Orthography) পূরণিকা (Appendix) অপসারণ চিহ্ন (Dash—) অবতরণ চিহ্ন (Inverted comma) পত্র ব্যবহার (Correspondence) মিতি (Date তারিখ) অনিয়মিত পণ্য (Irregularity) সংবিধানক (Plot of a drama) আদ্যাবিদ্যাভূত কথা (Mythology) বিচারশীল (Thoughtful) আদরশীল (Polite) স্বদেশাভিমান (Patriotism) দিন-চর্য্যা (Official journal) ঔষধিক্রিয়াকল্প (Pharmacopæia) দেশস্থিতি-রীতি প্রকরণ (statistics) অবলোকন (Observation) প্রয়োগ (Experiment) বায়ুরূপ প্রবাহী দ্রব্য (Fluid) দ্রবরূপ পদার্থ (Liquid) আকারমান (Volume) গুরুত্বাকর্ষণ (Gravitation) দ্রব্যপরিমাণ (Mass) বিশিষ্ট গুরুত্ব (Specific gravity) ক্ষিতিজ (Horizon) ক্ষিতিজ সমান্তর (Level) হিমফেন (Snow) হিমমর্য্যাদা (Snow line) হিমশৃঙ্গ (Icebergs) স্ফটিকাকৃতি (Crystalized) স্ফটিকীভবন (Crystalization) সমশীতোষ্ণ কটিবন্ধ (Temperate zone) বিষুবগামী বায়ু (Trade winds) সংসর্পণ (Conviction) স্নেহাকর্ষণ (Cohesion) ধনবিদ্যুৎ (Positive Electricity) ঋণবিদ্যুৎ (Negative Electricity)

দুঃসঙ্কোচত্বতা (Incompressibility) উত্তরদিকের অরুণোদয় (Aurora Borealis) বেমানিক (Balloonist) আন্দোলনগতি (Vibratory motion) ধ্বনিলেখন যন্ত্র (Phonograph) প্রকাশ-লেখন কলা (Photography) ধ্বনিবাহক যন্ত্র (Telephone) উষ্ণমান (Temperature) উষ্ণতাবাহক (Conductor) উষ্ণাংশুবিক্ষেপণ (Radiation) উষ্ণাংশুনিগ্রহণ (Absorption) প্রাণবায়ু (Oxygen) অগ্নিস্ফোট(Volcanic erruption) ভূস্তর বিদ্যা (Geology) গতি-সংক্রমণ (Transference of motion) দর্শনানুশাসন (conics) নেত্র বাহ্য পটল (Sclerotic) স্বচ্ছবৎপিধান (Cornea) নেত্র মধ্য পটল (Choroid) নেত্রস্থদর্পণ (Retina) কনীনিকা মণ্ডল (Iris) স্ফটিকবৎ রস (Crystalline lens) ঘনবর্দ্ধনীয়তা (Malleability) জলরাজ (Aqua regia) বহির্গোল (Convex).

এই সকল শব্দের অন্ততঃ কতকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইতে পারে কি না, সাহিত্যসেবিগণ সে কথার বিচার করিবেন।

বারতলার মেলা।

'বারতলা' কাহাকে বলে প্রথমে তাহার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। পল্লীগ্রামে কখন কখন কোন মাঠে, বাগানে বা নদীতীরে, কোন বৃক্ষমূলে বা তরুগুল্মের পাদদেশে অকস্মাৎ দৈব শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়; কোন দৈবানুগৃহীত ব্যক্তির প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে অমুক মাঠে অমুক গাছতলাতে দেবতার ভর হইয়াছে, অতএব প্রতি সপ্তাহে অমুক বারে যেন ধুমধাম

করিয়া সেখানে পূজা দেওয়া হয়, যাহার যে কামনা থাকিবে তাহা পরিপূর্ণ হইবে।

আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে আমদহ নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের কাছে একটা মাঠে একবার এই রকম এক 'বার' উঠিয়াছিল। একজন গোয়ালা দুগ্ধভার লইয়া মেটে রাস্তা দিয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিল, যাইতে যাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া সে দুধের ভার নামাইয়া পথপ্রান্তে বিশ্রাম করিতে বসিল। উন্মুক্ত আকাশতলে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম দেহে গামছার বাতাস খাইতে খাইতে দেখিতে পাইল অদূরে একটা বেনা-ঝাড়ে আগুন লাগিয়াছে, অগ্নি নির্ধূম, এবং অনেক ক্ষণ জ্বলিয়াও সেই তৃণপুঞ্জ ভস্মীভূত হইল না। গোপপুত্র নির্ণিমেষ চক্ষে অনেক ক্ষণ ধরিয়া এই দৃশ্য দেখিল, ভয় ভক্তি এবং বিস্ময়ে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; ইহা একটি দৈবঘটনা মনে করিয়া সে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উপর অর্দ্ধ ভাণ্ড দুগ্ধ ঢালিয়া দিল। অগ্নি অচিরাৎ নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

সেইদিন রাত্রে গোপনন্দন স্বপ্ন দেখিল, সেই বেনামূলে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি তাহার দুগ্ধে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছেন, অতএব শুক্রবারে সে যেন দুগ্ধ ও সন্দেশ লইয়া সেখানে পূজা দিয়া আসে ও তাহার প্রার্থনা নিবেদন করে, তাহার প্রার্থনা অবিলম্বে সফল হইবে।

গোয়ালা বেচারীর একটি ভাগিনেয় ছিল; দুই বৎসর হইতে সে জ্বর ও প্লীহায় ভুগিতেছিল। ডাক্তারের 'ওষুদ', বৈদ্যের 'পাঁচন' এবং সন্ন্যাসী ফকিরের 'তাকৃতুক' ও জলপড়াতে সে নিদারুণ জ্বর কিছুতে আরোগ্য হইল না, উপরন্তু তাহার প্লীহা বাড়িয়া পেটটি ঢাকের মত স্থূল, হাত পা গুলি 'কঞ্চির' মত সরু এবং মাথাটি

কেশশূন্য হইয়া বেলের মত মসৃণ হইয়া পড়িয়াছিল। গোপপুত্র এই সংশয়াপন্ন ভাগিনেয়টিকে সঙ্গে লইয়া যথানিয়মে দুগ্ধ ও সন্দেশ সহযোগে বারতলায় পূজা দিয়া আসিল। তিনদিনের মধ্যে তাহার বহুদিনসঞ্চিত জ্বর সারিয়া গেল, পাঁচদিনের মধ্যে সে লোহা চিবাইয়া হজম করিতে লাগিল। এ সম্বাদ অতি শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, গ্রামস্থ লোকেরা, যাহার যে কিছু কামনা ছিল তাহা পূর্ণ করিবার আশায়, প্রতি শুক্রবার বারতলায় আসিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া পূজা দিতে আরম্ভ করিল। দুধ চিনি ও গঙ্গাজলের আতিশয্যে সে স্থানটি পঙ্কিল হইয়া উঠিল। শেষে প্রতি শুক্রবার সেখানে লোকারণ্য হইতে লাগিল, জিনিষ পত্র কেনাবেচার ধুম পড়িয়া গেল; শুনিয়া আমরাও একদিন 'বারতলা' দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, সকালে স্নান শেষ করিয়া বেলা আটটার সময় আমরা চারি বন্ধুতে মেলা দেখিতে যাত্রা করিলাম; সূর্য্য আকাশের অনেকদূর উঠিয়াছিল এবং প্রভাতের মুক্ত দিবালোকে আমাদের গ্রামখানি অত্যন্ত সজাগ বলিয়া বোধ হইতেছিল। যতক্ষণ আমরা গ্রামের মধ্য দিয়া চলিলাম, ততক্ষণ রোদের উত্তাপ তত বেশী বুঝিতে পারি নাই। গ্রামের দক্ষিণে প্রকাণ্ড মাঠ, সেই মাঠের ভিতর দিয়া মেটে পথ চলিয়া গিয়াছে, পথের দুই ধারে বাঁশঝাড় এবং আম কাঠালের বাগান অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; দুই পাশের বাঁশের কঞ্চি ও পাতা রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছায়াচ্ছন্ন রমণীয় কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

আম কাঁঠালের বাগানগুলি এখন আর নির্জ্জন নহে। আমরা পথ ছাড়িয়া বাগানের মধ্যে দিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রত্যেক বাগানের মধ্যে এক একখানি কুটীর, তিন চার হাত উঁচু বাঁশের

খুঁটার উপর মাচা পাতিয়া তাহাতে খড়ের ছাওয়া ছোট দুখানি চাল, এই কুটীরগুলিকে "টোঙ" বলে; বাগানের রাখালীরা রাত্রে এই টোঙের মধ্যে শুইয়া বাগান 'পাহারা' দেয়। আম কাঁটাল পাকিতে আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই পাহারা দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়, নতুবা দিনে রাখালের উৎপাতে আম এবং রাত্রে চোরের উৎপাতে কাঁঠাল রাখা দুরূহ হইয়া পড়ে।

রাখালীরা তখন বাগানের মধ্যে আম ও কাঁঠাল পাড়িতে ব্যস্ত ছিল। তাহারা কতকগুলি কাঁঠাল পাড়িয়া টোঙের নীচে জড় করিয়া রাখিয়াছিল, এবং বড় বড় আম গাছে উঠিয়া 'নগা' দিয়া ছোট ছোট ডাল ঝাঁকড়াইতেছিল; দুড়দাড় করিয়া আম পড়ে আর ছোট ছোট ছেলের দল তাহা কুড়াইয়া একটা খোলা জায়গায় জমা করে। আম কুড়াইতে তাহাদের বড়ই আনন্দ।

আম কাঁঠালের বাগানের মধ্যে ছোট ছোট ঝোপ, আস্যাওড়া, ভাঁট, বঁইচি এবং ময়না কাঁটার গাছে পরিপূর্ণ। অন্য সময় এই ঝোপের মধ্যে দিয়া যাতায়াত করা কঠিন, নানারকমের লতায় তাহা আচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু আম ও কাঁঠালের কল্যাণে সর্ব্বদা জন-সমাগম হওয়াতে এখন আর তাহা তেমন দুর্গম নহে। বাগানের মধ্যে যে সংকীর্ণ পদচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে দেখিলাম একটা রাখাল পাঁচন ছুড়িয়া একটি ফল-পূর্ণ জামরুল গাছ হইতে জামরুল পাড়িতেছে, এক এক আঘাতে আট দশটা করিয়া পড়িতেছে, আর তিন চারি জনে ছুটিয়া গিয়া তাহা কুড়াইতেছে, পরস্পরকে ঠেলিয়া ফেলিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিতেছে। আর একটু দূরে একটা ফলসা গাছ;—একটি ছেলে গাছের এক ডালে পা ও আর এক ডালে পিট বাধাইয়া, ফলসা পাড়িতেছে এবং মুখে পুরিতেছে, নীচে আর একটি ছেলে

দাঁড়াইয়া বলিতেছে "হেই দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে দুটো দেও।" দাদা মুখ হইতে বিচিগুলি বাহির করিয়া বৃক্ষতলবর্ত্তী উৎক্ষিপ্তদৃষ্টি ভ্রাতাটির গাত্রে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে।

চলিতে চলিতে দেখিলাম ঝোপগুলি আবও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। অগণ্য বঁইচি গাছ, গাছগুলি কাঁচা ও পাকা ফলে পরিপূর্ণ; রাখালেরা বাগানের বাহিরে মাঠের মধ্যে গরু ছাড়িয়া দিয়া কাল কাল বঁইচি তুলিয়া 'কোঁচড়' ভরিতেছে, একটা ছোট ছেলে ঘাসের উপর বসিয়া অঞ্চলস্থিত বঁইচি লইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে মালা গাঁথিতেছে এবং বাঁশঝাড়ের আড়ালে শুষ্ক বংশপত্রসমাচ্ছন্ন গর্ত্তের পাশে যে খুব ঘন একটা বেত বন আছে, সেখানে কয়েকটা চাষার ছেলে পাকা বেতফল পাড়িবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে, কেহ বেতফলের থোকার গোড়ায় একগাছি কঞ্চি বাধাইয়া টানাটানি করিতেছে, কেহবা কাবারিতে 'কাস্তে' বাঁধিয়া তদ্বারা বেতফল পাড়িবার মতলব আঁটিতেছে; কিন্তু সঙ্গে দড়ী না থাকাতে সে অভাব পূর্ণ করিবার জন্য একটা বনলতা ছিঁড়িয়া আনিল। বঁইচি ও বেতফল এই সময় পল্লী বালকগণের অতি আদরের জিনিষ।

ক্রমে আম কাঁঠালের বাগান অতিক্রম করিয়া আমরা খোলা-মাঠে পড়িলাম; নিকটে ও দূরে ছোট ছোট বাবলা গাছ, মাঠের মধ্যে একটা জায়গায় কুমারদের আড্ডা, দুখানি ছোট পর্ণকুটীর, কুটীরের চারিদিকে কতকগুলি কাঁচা এবং পোড়ান মাটির গামলা ও কুয়ার পাট স্তূপাকারে রহিয়াছে। একপাশে বিশ পঁচিশটি ছোট বড় মৃত্তিকাস্তূপ, তাহার উপর মাটি রাখিয়া দুই জন লোক গামলা তৈয়ারী করিতেছিল, একটা গোলাকার ছোট ভাঁটির

কাছে রাশিরাশি পাটের কাঠি এবং খড় জমান দেখিলাম। কুমারেরা এই সকল পাটের কাঠি এবং খড় প্রায় দাম দিয়া ক্রয় করে না, চাষী গৃহস্থদিগকে দুই একটা গামলা দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এই সকল জিনিষ বোঝা বোঝা সংগ্রহ করিয়া আনে।

রৌদ্রে চলিতে চলিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে বেলা বেশী না হইলেও তাহার তেজ অত্যন্ত অধিক, চারিদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর ধুধূ করিতেছে, দলে দলে কুতূহলী যাত্রী আমাদের ন্যায় বারতলা অভিমুখে চলিয়াছে, কাহারো পায়ে জুতা নাই, মাথায় ছাতা; কেহ কাল মেরজাইয়ের উপর একখানি নূতন চাদর ঘাড়ে ফেলিয়া চলিয়াছে, চওড়াপেড়ে কাপড় জানুর অনেক উপরে তুলিয়া পরিয়াছে এবং ছিন্নপ্রায় চটি বা নাগরা জুতা বাম-হস্তে শোভা পাইতেছে। জুতা হাতে করিয়া লইবার ঠিক কারণ বোঝা গেল না, বোধ হয় বারতলায় উপস্থিত হইয়া খানিক-ক্ষণ তাহা পায়ে দিয়া কিঞ্চিৎ আরাম অনুভব করিবে, মানুষ-মাত্রেরই যে সখটা স্বাভাবিক ইহারা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। একটি মেয়ে একখানি লাল গুলদার সাড়ীতে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া একটি বর্ষীয়সীর অনুগমন করিতেছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকা সেই বালিকার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি ত্রস্তপদে ছুটিয়া চলিতেছে, প্রত্যেক পদবিক্ষেপেই বোধ হয় তাহার মনে হইতেছে অনেক বেলা হইল, হয়ত এতক্ষণ হাট ভাঙ্গিয়া গেল; বালিকা একে দ্রুতগমনে নিপুণ নহে তাহার উপর এই খোলা মাঠের মধ্যে পড়িয়া তাহার প্রতি-দিনের অভ্যস্ত ক্ষুদ্র গৃহ এবং সংকীর্ণ অঙ্গনমধ্যে আবদ্ধ হৃদয়টি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে মধ্যে মধ্যে তাহার আবক্ষবিলম্বিত ঘোমটা অল্প ফাঁক করিয়া এই অপরিচিত পথ, বিচিত্র পরিচ্ছদ-

ধারী মনুষ্যদল, এবং প্রান্তরের প্রান্তবর্ত্তী শ্যামল গাছপালা দেখিয়া লইতেছে সুতরাং একভাবে চলিতে পারিতেছে না, আর প্রাচীনার মুখনাড়া খাইতেছে।

আমরা শ্রান্তভাবে কুমারের কুটীরে আসিয়া বসিলাম এবং হাত মুখ ধুইবার জন্য তাহাদের কাছে এক ঘটি জল চাহিলাম। একজন লোক একটি ঘটি বেশ ভাল করিয়া মাজিয়া সম্মুখস্থ কূপ হইতে একঘটি জল তুলিয়া দিল, অতি পরিষ্কার এবং শীতল জল। আমরা হাতমুখ ধুইলাম, দক্ষিণদিক হইতে হুহু করিয়া বাতাস আসিয়া আমাদের গায়ে লাগিতেছিল। আমার বোধ হইল এখানে চাদর বিছাইয়া যদি খানিকক্ষণ শুইয়া থাকা যায় তবে মেলা দেখার সুখ অপেক্ষা অনেকখানি স্বস্তি লাভ হইতে পারে।

কিন্তু তাহা হইল না, উঠিয়া চলিতে লাগিলাম। বারতলার প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িলে, দেখা গেল চারিদিক হইতে জল-স্রোতের ন্যায় জনস্রোত চলিয়া আসিতেছে; অনেক গরুর গাড়ীতে প্রাচীন এবং রুগ্ন লোক, পাঁচ সাতখানি গাড়ীর সম্মুখভাগ কাপড় দ্বারা ঘেরা, অনুমান হইল গৃহস্থের মেয়েরা পূজা দিতে যাইতেছে।

বারতলার প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূর হইতে লোকের ভীড়; সেখানে তিন চারিটা তালগাছ, গাছে কাঁদি কাঁদি তাল ফলিয়া আছে, দুই জন লোক তালের কাঁদি কাটিয়া যাত্রীদিগের কাছে তালসাঁশ বিক্রয় করিতেছে। সাঁশগুলি বেশ ছোট এবং অতি নরম, বিশেষ তাহার মধ্যের জলটুকুর আস্বাদন অতি মধুর। দুই একটি বন্ধু তাহার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা সেই বৃক্ষতলে বসিয়া বিক্রেতাদিগের অর্থ উপার্জ্জনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। একদল স্কুলের ছেলে পাঁচ সাত কাঁদি তালের সাঁশ উদরস্থ করিয়া উঠিয়া গেল।

আমরা প্রায় বেলা দশটার সময় বারতলায় উপস্থিত হইলাম। চারিদিকেই লোকের ভীড়, কোথায় বার উঠিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া লওয়া প্রথমে আমাদের পক্ষে কিছু কঠিন হইল। অবশেষে অনেক কষ্টে বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষকে ঠেলিয়া আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছিলাম।

কয়েকগাছ বেনার মূলে দৈবশক্তির আবির্ভাব কতকটা বিস্ময়কর বটে। কিন্তু তাহাতে ভক্তবৃন্দের অভাব লক্ষিত হইল না। নিকটে দশ বারোজন গোয়ালা কলসী ভরিয়া দুগ্ধ আনিয়াছে, এবং এক একটা ছোট বাঁশের চোঙ্গাতে করিয়া তাহা বিক্রয় করিতেছে, দুধের সাদা রঙ বজায় রাখিয়া যতদূর সম্ভব ইহারা তাহাতে জল মিশাইয়াছে। ভক্তগণ সেই দুধ এবং ময়রার দোকান হইতে এক আধপয়সার চিনি কিনিয়া বেনার মূলে ঢালিয়া দিতেছে, কোন ব্যক্তি ধূপধুনা এবং বাদ্যভাণ্ড লইয়া সমারোহে পূজা দিতে আসিয়াছে, কেহ মকদ্দমা জিতিয়াছে,. কাহারো ব্যারাম সারিয়াছে, কাহারো শত্রুর মুণ্ডপাত হইয়াছে, কেহ বা পুত্রলাভ করিয়াছে। এইরূপ সিদ্ধকাম অনেক লোককে পূজার উপকরণ লইয়া উপস্থিত হইতে দেখা গেল। সুযোগ বুঝিয়া একজন নৈমিত্তিক পুরোহিতও কিছু সংস্থানের চেষ্টায় একখান দোকান খুলিতে ক্রুটী করে নাই, তাহার পূজার কোন রকম অনুষ্ঠান দেখা গেল না, কতকগুলি ফুল ও ফুলের মালা লইয়া সে সেখানে বসিয়াছিল, প্রত্যেক পূজার্থীর কাছে সে দুই এক পয়সা দক্ষিণা লইতেছিল, এবং দক্ষিণার পরিমাণ অনুসারে মালা বা ফুল বিতরণ করিতেছিল।

সকাল হইতেই মাঠের মধ্যে চারিদিকে বাজার বসিয়াছিল। মাছের দোকান, তরকারীর দোকান, ফলের দোকান, এমন কি বটতলার পুঁথিরও দোকান দেখা গেল; গাড়ীতে করিয়া দু তিন

গাড়ী পাকা কাঁঠাল, ঝুড়ি ঝুড়ি আম, তরমুজ, কাঁকুড় প্রভৃতি বিক্রয় হইতে আসিয়াছে, দোকানে অনেক যাত্রী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একপাশে তুগাড়া হাঁড়ি, ভাড়, চিত্রিত ছোবা এবং মাটির পুতুল; স্ত্রীলোকের ভীড় সেখানে অত্যন্ত বেশী। বেলা বেশী হইল দেখিয়া মেয়েদের কেহ তুইটি হাঁড়ি, কেহ ছেলেদের জন্য তুই একটি পুতুল, কেহ বা তুই সের পটল বা একটা তরমুজ কিনিয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিল। বারতলার অল্পদূরে একটা দিঘি, দিঘিতে বেশী জল নাই, পঙ্কের ভাগই অধিক—এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া কেহ স্নান করিতেছে, কেহ স্নান করিয়া উঠিয়া পদ্মের পাতায়ে চিড়ামুড়কী ভিজাইয়া মহাউৎসাহে ফলার করিতে বসিয়াছে; কতকগুলি লোকের সখ আরো বেশী, তাহারা দিঘির ধারে মাটির উনান কাটিয়া নূতন হাঁড়িতে 'খিচুড়া' চড়াইয়া দিয়াছে, অনাবৃত মাঠে উনানের মধ্যে হুহু করিয়া বাতাশ ঢুকিয়া আগুণ নিবাইয়া দিতেছে কিন্তু কিছুতেই সেই সৌখিন লোক কয়টির উৎসাহের বিরাম নাই, উপু হইয়া পড়িয়া তাহারা প্রবলবেগে উনানে ফুঁ দিতে লাগিল এবং বহু চেষ্টায় সেই অর্দ্ধসিদ্ধ চা'ল ডা'ল নামাইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

একটু দূরে দেখিলাম অনেকগুলি লোক একত্র জড় হইয়া যেন কি দেখিতেছে, মনে হইল হয়ত কোন বাজীকর সেখানে ভেল্কী দেখাইতেছে; ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম একটা ছোট তাম্বুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুইজন লোক খৃষ্টধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু তাহাদের বক্তৃতাতে খৃষ্টধর্ম্মের মহিমা অপেক্ষা হিন্দু দেব দেবীর নিন্দার কথাই বেশী। আর একজন লোক একপাশে দাঁড়াইয়া "সত্য গুরু কে" "প্রকৃত ত্রাণকর্ত্তা"

"মুক্তি লাভের উপায়"—ইত্যাদি নামের ছোট ছোট বহি চাষার ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিল।

এখানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে হঠাৎ একজন পরিচিত লোকের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার বাড়ী এই তলা হইতে বড় বেশী দূর নহে, এক ক্রোশের মধ্যেই একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। তিনি আমাদের দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সে বেলার মত তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে চরিতার্থ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বেলা এবং আমাদের ক্ষুধা উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছিল, বিশেষতঃ তত বেলায় প্রায় তিন ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া বাড়ী যাওয়া বড় সহজ কথা নহে, এজন্য আমরা পূর্ব্বে হইতেই নৌকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু সেখান হইতে প্রায় এক ক্রোশ হাঁটিয়া গিয়া আমাদের নৌকায় চড়িতে হইবে, বেলা দুইটার পূর্ব্বে বাড়ী পৌছান সম্ভব নহে, এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া দুই একবার যথারীতি মৌখিক অসম্মতি প্রকাশের পর তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে লোক ছিল, তাহারই একজনকে তিনি নৌকার মাঝিদের নৌকা লইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। আর একজন লোক তাহার আদেশ অনুসারে হাট হইতে মাছ তরকারি কিনিতে গেল।

এই ভদ্রলোকটি তাঁহার গ্রামের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, চাষী গৃহস্থ—জমাজমী এবং লাঙ্গল গরু অনেক; গ্রামের পঞ্চাইত হইতে চৌকিদার পর্য্যন্ত তাঁহার যথেষ্ট খাতির করে। হাটের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে দেখিলাম একজন কাঁঠালবিক্রেতার সঙ্গে একটা গ্রাম্য-চৌকিদারের বড় বচসা হইতেছে, চৌকীদার মাথায় লাল পাগড়ী, গায়ে সাদা জিনের কোট এবং কোমরে এক চাপরাস্

বাঁধিয়া পাঁচ হাত দীর্ঘ বংশদণ্ড হস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দোকানীদের নিকট হইতে গ্রামের পঞ্চাইত মহাশয়ের জন্ত 'তোলা' তুলিতেছিল। এই কাঁঠালওয়ালার দোকানে আসিয়া সে একটা প্রকাণ্ড কাঁঠাল 'তোলা' লইতে চাহে, দোকানী বলে, "তোলা দিতে হয় এক পয়সা দিব, চার গোণ্ডা পয়সার কাঁঠালটা দিব কেন?" বাধা পাইয়া সেই চাপরাসধারী কোম্পানীর চাকরের ক্রোধাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে সেই দোকানীকে শ্যালক সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তাহাকে দশ হাত দূরে ঠেলিয়া দিল। এমন সময় আমাদিগকে সম্মুখীন দেখিয়া দোকানী আমাদের সঙ্গী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল; এবং সকাতরে তাহার অভিযোগ জ্ঞাপন করিল। সমস্ত শুনিয়া সঙ্গীটি চোক রাঙ্গাইয়া সেই চৌকিদারকে বলিলেন "দেখ্ নফরা, তোর উৎপাতের কথা যখন তখন শোনা যায়, এই গরীব বেচারা কেন তোকে এত বড় একটা কাঁঠাল দেবে, যা, এক আধটা পয়সা নিয়ে সরে পড়, আবার যদি তোর দৌরাত্ম্যের কথা শুনি ত তোর চাকরীর মাথা খেয়ে দিব।"—দোকানদার বেচারী নফরের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিল; সঙ্গীর সঙ্গে আমরাও গ্রামের দিকে চলিলাম। হাট তখন প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ক্রেতারা ও দর্শকবৃন্দ অনেকেই চলিয়া গিয়াছে; গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা গাড়ীতে আরোহী তুলিয়া বলদ জুড়িয়া দিয়াছে এবং দোকানীরা তাহাদের বিক্রয়লব্ধ পয়সা গুণিয়া লাভ লোকসানের হিসাব দেখিতেছে।

বেলা প্রায় বারোটার সময় আমরা বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলাম; কিছুকাল বিশ্রামের পর নদীতে স্নান করিতে যাওয়া গেল। নদীটি তাঁহাদের বাড়ী হইতে বেশী দূরে নহে, আমাদের গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র নদীই এই গ্রামের নীচে দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। মধ্যাহ্ন-

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, দুইটি বড় তেঁতুল গাছের পাশ দিয়া নদীতে নামিবার সংকীর্ণ পথ, পথ জনহীন, স্নানের ঘাটে দুই একজন মাত্র লোক, নদীর ক্ষুদ্র দেহ শৈবালে আচ্ছন্ন। স্নানের ঘাটের দুই পাশে কয়েকখানি জেলেডিঙ্গি বাঁধা রহিয়াছে, দূরে দূরে শৈবালের উপর দুই একটি জলচর পক্ষী দ্রুত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং নদীর অপর পারে একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের ডালের উপর হইতে একটা চীল অনেক্ষণ থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, তাহার তীব্র দীর্ঘ কণ্ঠস্বর এই নিদাঘমধ্যাহ্নে রৌদ্রক্লান্ত ক্ষুব্ধ ধরণীর ব্যথিত আর্ত্তনাদের মত কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল।

আহারাদির পর ঠাণ্ডা খড়ের ঘরে মাদুর বিছাইয়া সমস্ত মধ্যাহ্নটা কাটান গেল। বেলা পাঁচটার পর আমরা বন্ধুগৃহ হইতে বিদায় লইলাম, দুইটি বাগানের মধ্য দিয়া, মাঠের চষা জমী ঘুরিয়া, 'আইলের' উপর দিয়া নদীতীরে আমাদের নৌকার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সূর্য্য তখন অস্তগমনোন্মুখ, নদীর অপর পারে বাহাদুরপুরের নীলকুঠী, তীরের উপরেই দেবদারু ও ঝাউ গাছের সারি, তাহার ভিতর দিয়া কুঠীর শ্বেত অট্টালিকা দেখা যাইতেছে, ঝাউ ও দেবদারুর মাথায় সূর্য্যের কনককান্তি শোভা পাইতেছে, তরুতল হইতে নদীর জল পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গাটা ঢালু, তাহার উপর ঘন সবুজ ঘাস বিছান আছে। ছায়ায় বসিয়া দুজন লোক ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল।

আমরা নৌকায় উঠিলে নৌকা ছাড়িয়া দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নদীবক্ষ শৈবালাচ্ছন্ন, দাঁড় টানিবার যো নাই, দুজন লোক গুণ টানিয়া চলিতে লাগিল, নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, দুইধারে মাঠ, বাগান, আবার মাঠ, বট, পাকুড় ও বাবলার গাছ, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গ্রামের প্রান্তসীমা দেখা যাইতেছে, গ্রাম

হইতে সরু পথ নদীতে আসিয়া মিলিয়াছে, গ্রাম্য বধূগণ গা ধুইয়া কলসী কাঁকে জল লইয়া যাইতেছে, মেয়েরা পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেছে, মধ্যে মধ্যে খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, তাহাদের চপল উচ্চহাস্যে স্তব্ধ সন্ধ্যার মৌনব্রত ভঙ্গ হইতেছে। দুইজন রাখাল নদীর অপর পারে মহিষ চরাইতেছিল, সন্ধ্যা দেখিয়া তাহারা মহিষের পিঠে চড়িয়া নদী পার হইল, তাহার পর ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

সুন্দর সন্ধ্যাকাল, শীতল, শান্তিময়। পূর্ব্ব গগন উদ্ভাসিত করিয়া তৃতীয়ার চন্দ্র আকাশে উঠিল; সমস্ত প্রকৃতি জ্যোৎস্না-প্লাবিত, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কখন দূর বনে একটা পাখীর শব্দ, কখন নৈশবায়ুপ্রবাহে তরুপল্লবের মর্ম্মরধ্বনি, বোধ হইতে লাগিল আমরা কয় বন্ধুতে যেন এক মায়ার তরণীতে চড়িয়া কোন মায়া-পুরীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি।

রাত্রি প্রায় নটার সময় নৌকা আসিয়া আমাদের স্নানের ঘাটে লাগিল, সংকীর্ণ বনপথ দিয়া ত্রস্তপদে গৃহে চলিলাম।

মেয়েলি ব্রত।

৪

সাঁজপূজনী।

সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া এই ব্রতটীর নাম "সাঁজপূজনী"। সধবা বিধবা কুমারী সকলেই এই ব্রতের অধিকারিণী। কেবল তাহাই নহে, "সাঁজপূজনী ব্রত" সকলের পক্ষেই অবশ্য। কর্ত্তব্য

যিনি যতই বারব্রত উপবাসাদি করুন না কেন, এই ব্রতটী না করিলে সমস্তই বৃথা হয়। মহিলারা এই কথার প্রমাণস্বরূপ এই ছড়াটীর উল্লেখ করিয়া থাকেন,—

"সকল ব্রত কল্লেন ধনী।
কিন্তু বাকী রইল সাঁজপূজনী॥"

অর্থাৎ "সাঁজপূজনী" ব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে আর সমুদায় ব্রত-নিয়ম পণ্ড হইয়া যায়। সুতরাং বালিকারা প্রায়শঃ কুমারী অবস্থাতেই এই ব্রত সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ভ্রাতার কল্যাণকামনা এই ব্রতটীর উদ্দেশ্য, রমণীরা এই কথা বলিয়া আপনাদের ভ্রাতৃপ্রীতির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্রতের মন্ত্র বা ছড়াগুলি পাঠ করিলেই জানা যায়, ভ্রাতার কল্যাণ অপেক্ষা সপত্নীর সর্ব্বনাশকামনাই এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্ব্যতীত ধন ধান্য অলঙ্কার প্রভৃতি সংসারের তাবৎ সুখসৌভাগ্য লাভ করাও ইহার অন্যতর লক্ষ্য।

ব্রতের পদ্ধতিপ্রকরণ এইরূপ—কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে স্নানান্তে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণের প্রথম দিন হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। সন্ধ্যাকালের পূজা এই অর্থে মেয়েলি ভাষায় ইহার নাম "সাঁজ পূজনী"। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ অথবা গৃহের বারাণ্ডা উত্তমরূপ পরিষ্কৃত করিয়া তদুপরি আলিপনা দিতে হয়। আলিপনাতে সর্ব্বাগ্রে অর্দ্ধচন্দ্র, গঙ্গাযমুনা চিত্রিত করিয়া তৎপরে একে একে হাতা, বেড়ি, উনন, ঢেঁকি, ঘট, গোশালা, হাটবাজার, বাসরঘর, কাজললতা, নানারূপ অলঙ্কার, ফুলগাছ, ছাতা, ঘাট, শর, বেণা ও টাকা পয়সা ধান চাউল প্রভৃতির অনেক বস্তা ইত্যাদি, অর্থাৎ ছড়ায় যে যে বিষয়ের উল্লেখ আছে, তৎসমস্তই অঙ্কিত

করিতে হয়। বাসরঘর ব্যতীত আরও বারোটী ঘর আঁকিয়া তাহাতে তেরটী প্রদীপ জ্বালিয়া দিতে হয়। তৎপরে আলিপনার সম্মুখভাগে আম্রশাখাসমন্বিত নির্ম্মল বারিপূর্ণ পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া এই সমস্তের পূজা করিতে হয়। স্বতন্ত্র কোন দেবদেবীর পূজার নিয়ম নাই। পূজার উপকরণ ধান দূর্ব্বা সচন্দন পুষ্প এবং দুগ্ধ সুগন্ধরণ্ডা ও মিষ্টান্নমিশ্রিত তণ্ডুলমুষ্টির নৈবেদ্য। ব্রতন্তী (ব্রত-চারিণী রমণীকে মেয়েলি ভাষায় ব্রতন্তী বলে) নিজেই পুরোহিত, কখন কখন অন্য স্ত্রীলোকেও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। পূজার মন্ত্র ও বরপ্রার্থনার ছড়া উচ্চারণ ও শ্রবণ ব্যতীত স্বতন্ত্র ব্রতকথা শুনিবার নিয়ম নাই। একাকী অথবা অনেকে একত্র হইয়া এই ব্রত করিতে পারে। ব্রতন্তীর আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম নাই।

প্রথমতঃ দ্বাদশটী ঘরের পূজা করিতে হয়। মন্ত্র এই—

"সাঁজপূজনী সেঁজোতি।
বারো ঘরে তের বাতী।
সেই ঘরে মোর ঘরটী॥
ঘরটী পূজি মাগি বর।
ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর॥"

ইহার পর ক্রমে ক্রমে গঙ্গাযমুনা, চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতির পূজা করিবার নিয়ম। যথা,—

গঙ্গাযমুনা পূজা।

"গঙ্গাযমুনা যুড়ি হয়ে,
সাতভেয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রী সমান হয়ে,

গঙ্গাযমুনা পূজ্যান্।
সোণার থালে ভুজ্যান্॥
সোণার থালে ক্ষীরের লাড়ু।
শঙ্খের উপর সুবর্ণের খাড়ু॥”

চন্দ্রসূর্য্য পূজা।

“চন্দ্রসূর্য্য পূজ্যান্।
সোণার থালে ভুজ্যান্॥
সোণার থালে ক্ষীরের লাড়ু।
শঙ্খের উপর সুবর্ণের খাড়ু॥”

এইরূপ মন্ত্রে “হাটবাট” ও “গো-গোয়ালের” পূজা করিতে হইবে। পুনরুক্তি ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

অনন্তর নিম্নের ছড়াগুলি আবৃত্তি করিয়া আলিপনায় আর যাহা যাহা আঁকা হইয়াছে, তৎসমুদায়ের উপর ফুল দূর্ব্বা চন্দন প্রভৃতি অর্পণ করিয়া পূজা করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলির প্রথমেই বর প্রার্থনা। যথা—

“বেণা বেণা বেণা।
আমার ভাই গাঁয়ের সোণা॥
সোণা সোণা ডাক পড়ে।
গা গুচি গুয়ো পড়ে॥
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে।
অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়॥
শর শর শর।
আমার ভাই গাঁয়ের বর।
আমার ভাই লঙ্কেশ্বর॥

লক্ষেশ্বর লক্ষেশ্বর ডাক পড়ে।
গা গুচি গুয়ো পড়ে॥
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে
অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়॥
কুলগাছ কুলগাছ ঝেঁকুড়ি।
তিন বেটির সমাকুড়ি॥
সাত সতীনের সাতটা কৌটো।
আমার আছে নবীন কৌটো॥
নবান কৌটো নড়ে চড়ে।
সাত সতীনে পুড়ে মরে॥
ময়না ময়না ময়না।
সতীন যেন হয় না॥
হাতা হাতা হাতা।
খাই সতীনের মাথা॥
বেড়ি বেড়ি বেড়ি।
সতীন মাগী টেরী*॥
পাখী পাখী পাখী।
সতীন মাগী মর্ত্তে যাচ্চে
ছাদে উঠে দেখি॥"

কুলীনকামিনীরা সপত্নীর অশুভসূচক আরও অনেক কামনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। ব্রতচারিণী এই প্রকারে নিরপরাধা সপত্নীর সর্ব্বনাশ কামনা করিয়া নিজের সুখসৌভাগ্য প্রার্থনা করে। যথা,—

* যাহার চক্ষু বক্র, তাহাকে গ্রাম্যকথায় "টেরা" বলে। স্ত্রীলিঙ্গে "টেরী"

"ঢেঁক্ পড়ন্ত † উনন জ্বলন্ত ‡।
বাপঘর শ্বশুরঘর একই চলন্ত § ॥
বাসি গোবর থাসি থুসি।
উননে না দিই ফুঁ।
বউরান্না ভাত খেয়ে
চান্দপারা মু॥"

ইহার পর পিটলী নির্ম্মিত নানা রূপ অলঙ্কার আলিপনার উপর প্রদান করিয়া বলিতে হয়,—

"সাজপূজনী! সাঁজপূজনী!
তোমাকে দিলাম পিটলীর বালা।
আমি যেন পাই সোণার বালা।

যার যে অলঙ্কারে অভিরুচি, সে পিটলী নির্ম্মিত সেই অলঙ্কার প্রদান করিয়া এই প্রকারে প্রার্থনা করিয়া থাকে। বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। তৎপরে, টাকা পয়সা ধান চাউল ইত্যাদির যে 'ছালা" (বস্তা) অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহার উপর ফুলচন্দন প্রদান করিয়া বলিতে হয়,—

"ঐ আস্‌চে টাকার ছালা।
তাই গুণ্‌তে গেল বেলা॥
ঐ আস্‌চে ধানের ছালা।
তাই মাপতে গেল বেলা।"

---

† ঢেঁকি সর্ব্বদাই পড়িতেছে, অর্থাৎ ধান্য গম প্রভৃতি শস্যসম্পত্তিতে গৃহ পরিপূর্ণ।

‡ পাকশালায় চুল্লী সর্ব্বদা প্রজ্বলিত রহিয়াছে। অর্থাৎ দীনদরিদ্র অতিথি অভ্যাগত সতত ভোজন করিতেছে।

§ পিতৃগৃহ ও স্বামিগৃহের চল্‌তি অবস্থা এইরূপ একই প্রকার।

এইরূপে চাউল কলাই লবণ তৈল প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া পূজা করিতে হয়। অতঃপর "কাজললতা" ও "বাসরঘরের" পূজা।

"কাজললতা কাজললতা বাসরঘর।
দাও মা মেলিনী যাই শ্বশুরঘর॥"

ইহার পর নাতির (পৌত্র বা দৌহিত্র) আগমন ও অভ্যর্থনার উল্লেখ করিয়া বলিতে হয়,--

"'কেনরে নাতি! এত রাতি?'
'কাদায় পড়িল ছাতি।
তাই তুল্‌তে এত রাতি॥'
'এস নাতি! বস খাটে।
পা ধোওগে গ'ড়ের ঘাটে॥
সোণার ভেঁটা দেব হাতে।
খেল্ কর্‌বে পথে পথে॥'"

পূজা ও বরপ্রার্থনা শেষ হইলে সমুদায় ফুলগুলি কুড়াইয়া লইয়া প্রণাম করিতে হয়। ফুল কুড়ান' ও প্রণামের মন্ত্র এই,—

"অরুণ ঠাকুর বরণে।
ফুল ফুটেছে চরণে॥
যখন ঠাকুর বর দেন।
আপনার ফুল কুড়িয়ে নেন॥"

অনন্তর আলিপনা মুছিয়া ফেলিয়া সেই স্থানটী ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। পরে ব্রতচারিণী পূর্ব্বোক্ত পূর্ণকুম্ভ স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া হুলুধ্বনি করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করিতে যায়।

এই প্রকার বিধানানুসারে চারি বৎসর কার্ত্তিক সংক্রান্তি হইতে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া

চতুর্থ বৎসরে উদ্‌যাপন করিতে হয়। উদ্‌যাপনের বৎসরে শেষ দিনে পূজা ইত্যাদি সমাপ্ত হইলে ব্রতচারিণীর সহোদর ভ্রাতা, অভাব পক্ষে নিকট-সম্পর্কীয় কোনও ভাই ছাতা মাথায় দিয়া বারাণ্ডার নীচে দণ্ডায়মান হইবেন, ব্রতচারিণী ভগিনী ছাতার উপরে বিবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ফেলিয়া দিবে। ভ্রাতা এই সময় ছাতাটী আড়াই পাক ঘুরাইবেন। পরে ভ্রাতাকে নববস্ত্র ও নবছত্র এবং নানারূপ মিষ্টদ্রব্য প্রদান করিলে ব্রত সাঙ্গ হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতবড় একটী অনুষ্ঠানে পুরোহিত মহাশয়রা অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। 'ভ্রাতা' মহাশয়ই তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া "নববস্ত্র ও নবছত্র" আত্মসাৎ করিয়াছেন।

প্রতিহিংসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুকুন্দ বাবুদের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের পৌত্রী, বর্ত্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভক্ষণে বাবুদের বাড়িতে তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বৌভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্ব্বেকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দ বাবুও ভূতপূর্ব্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে

বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যখন কোন জীবনোপায় ছিল না, তখন মুকুন্দলাল কেবল মাত্র মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বল্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য্য সুলভ মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দলালের সম্পত্তি ভুক্ত করিলেন তখন হইতে মুকুন্দ বাবুরা গণ্যমান্য জমিদার শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যেরও উন্নতি হইল;— অল্পে অল্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি, জোতজমা, এবং পূজার্চ্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এককালে সামান্য তহশিলদার শ্রেণীর ছিলেন তিনি সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব্ব কালের ইতিহাস। বর্ত্তমান কালে মুকুন্দ বাবুর একটি পোষ্যপুত্র আছেন তাঁহার নাম বিনোদবিহারী এবং গৌরী-কান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পুত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না—সেই জন্য বার্দ্ধক্যবশতঃ নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাতজামাই অম্বিকাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম্ম বেশ চলিতেছে; পূর্ব্বের আমলে যেমন ছিল এখনও সকলি প্রায় তেমনি আছে কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে; এখন প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্ম্মের সম্পর্ক—

হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্ব্বকালে টাকা শস্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছু সুলভ ছিল, এখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে; নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা হইতে!

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বৌভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজির পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা। এখানে কতকগুলা বিচিত্র-চরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বৌভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্য্যের মধ্যে দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানীর মধ্যে একটা নূতন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নূতন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিববাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্ত্রী নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহ-কর্ম্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই,—মুকুন্দ বাবুরা প্রভু ধনী বটেন কিন্তু কুলমর্য্যাদায় গৌরীকান্ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে না। সেই জন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে খাওয়াইবার

জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল—কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ান গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্ত্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণীকে দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থির সৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্য্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্ব্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দ বাবু তাঁহার পোষ্যপুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারও নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হোক্ এবং কর্ত্তা তাঁহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে যতই প্রশ্রয় দিন তিনি কখনও ভ্রমেও স্বপ্নেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সন্নত হইয়া পড়িতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভুভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্য্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন! মুকুন্দলালের পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভৃত্যের এই কুলগর্ব্ব মুকুন্দলালের ভাল লাগে নাই। তিনি

আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে; গৌরীকান্ত যখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিমুখভাব গৌরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পৌত্রীর সহিত এক পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্ব্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভুগৃহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্দ্ধা নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিববাড়িতে এত ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল?

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে কিন্তু তাহার গর্ব্বটা সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না এই জন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্ব্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা,—চলিত ভাষায় যাহাকে বলে দেমাক্। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছিল—অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারও সহিত মাখামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা সোরগোল

করা, অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে "আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী" "আমাদের দেওয়ানের নাত্‌নী" বলিয়া বারম্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মুখরা দাসীকে শিখাইয়া দিল—সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া পরম সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল;—কণ্ঠী এবং বাজু-বন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিল্টি-করা?" ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীর মুখে কহিল, "না, এ পিতলের!" নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কি করচ, এই খাবারগুলো হাটখোলার পাল্কীতে তুলে দিয়ে এস না।" অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল। ইন্দ্রাণী কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্মচ্ছায়া-গভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিষ্টান্নপূর্ণ সরা খুরি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পাল্কীর উদ্দেশে নীচে চলিল। যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন ভাই কষ্ট করচ, দাও না ঐ দাসীর হাতে দাও!" ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, "এতে আর কষ্ট কিসের!" অপরা কহি-লেন, "তবে ভাই আমার হাতে দাও!" ইন্দ্রাণী কহিলেন, "না, আমিই নিয়ে যাচ্চি"—বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তেমনি অটলস্নিগ্ধভাবে তিনি পাল্কীতে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিলেন—

এবং সেই দুই মিনিটকালের সংশ্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনীগৃহবধূ এই স্বল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মত প্রাণের সখিত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনটাকেই গায়ে বিঁধিতে দিল না;—সকলগুলিই তাহার অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্ম্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়, অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূর সম্পর্কের নিঃস্ব পিস্তুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়;-সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্ম্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনো মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরীকান্তকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্‌ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর্য্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাহার সেই অকালপক্বতার

নিকট মুখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত এই মেয়েটির অনর্গল কথায় বার্ত্তায় এবং চেহারায় বড়ই খুসী হইয়াছিলেন কিন্তু কুলের যৎ-কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোন সান্ত্বনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল। মহা-ভারতে বর্ণিত শুক্রাচার্য্য দুহিতা দেবযানী এবং শর্ম্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্ম্মি-ষ্ঠার দর্পচূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ন্যায় মুকুন্দ বাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরী-কান্ত একান্ত আবশ্যকীয় ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মুকুন্দ বাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারি-তেন—কিন্তু তিনিই মুকুন্দলালের বিষয় সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়া-ছেন অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি পর-গণা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা যে একপ্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে? আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্ব্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপ-

স্নান করিবার অধিকার পাইয়াছ ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারী কাছারির সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভৃত খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, স্বামী স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাৎ কোন কোন স্থলে স্বামীস্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা আশা করি এই নিয়ম বুঝি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দুই একটা বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক্ লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পূরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী—ইহাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্য্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন অম্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হয়েচে?" ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "কি আর হবে? সম্প্রতি আমার স্মারত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"সে ত আমার অগোচর নেই। তৎপূর্ব্বে?" ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তৎপূর্ব্বে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েচে।" অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমাদরটা কি রকমের?" ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সে রকমের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না, এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্ব্বে কখনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধনমোচন করিয়া ফেলিত—সেখানে লেশমাত্র আত্ম-গোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এখনি আমি কাজে ইস্তফা দিব। তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদ বাবুকে এক কড়া চিঠি লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুর পাতা মেঝের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল—এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।

অম্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মৃণালে একটিমাত্র পদ্মের মত

ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দলালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে একটি অচল নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্ত্তব্য এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতী করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টচিত্তে বিনোদের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদলালের কাজ ছাড়িয়া দিবে এ তাহার কিছুতেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদু মিষ্টস্বরে কহিল—বিনোদ বাবুর ত কোন দোষ নেই তিনি এর কিছুই জানেন না—তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে কেন?

শুনিয়া অম্বিকা বাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—নিজের সংকল্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে! কিন্তু মনিব হোন্ আর যিনিই হোন্ ওদের ওখানে আর কখন তোমাকে পাঠাচ্চিনে।"

এই অল্প একটু ঝড়েই সে দিনকার মত মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারীর কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতান্ত-নির্ভর ও অতি-নিশ্চয়তাবশতঃ কোন কোন স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারার প্রতিও বিনোদের কতকটা সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারীর আয় এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বলিয়া বোধ হয় না—তাহা অভ্যস্ত, এবং তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না। বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সুড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেই জন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানা প্রকার আজ্‌গবী ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত দেশের সমস্ত বাব্‌লা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করাইবেন, কখনও পরামর্শ হইত সুন্দর বনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন, কখনও লোক পাঠাইয়া পশ্চিম প্রদেশের বনগুলি বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকীর ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে, অন্য লোকে শুনিলে হাসিবে, সেই জন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষতঃ অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লজ্জা করিতেন; অম্বিকা পাছে মনে করেন তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বসিয়াছেন সেজন্য মনে মনে সঙ্কুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমনভাবে থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কত টাকা করিয়া বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কানে মন্ত্র

দিতে লাগিলেন। তুমি ত নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য্য করিয়া লও; এদিকে ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজরের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনো চক্ষেও দেখি নাই। এ সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এত দেমাক্‌ই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে! ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজ মুখে তাহার দাসীকে কি সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক—একদিকে সে পরের প্রতি নির্ভর না করিয়াও থাকিতে পারে না, অপরদিকে যে তাহার কানে যেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষতঃ কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই—মহা মুস্কিল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্ম্মচারীগণ সকলেই ঈর্ষান্বিত ছিল। বিশেষতঃ গৌরীকান্ত তাঁহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন, অম্বিকার প্রতি বিদ্বেষ তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষ্যাবশতঃই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না,

এ ধারণা তার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি যোগায় এই তাহার মত। বিশেষতঃ ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিত;—বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেই-রূপ—ঘোড়াবেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্ব্বে কাজকর্ম্মের কোন খোঁজখবর লইত না—কেবল যখন ব্যবসা উপলক্ষ্যে হঠাৎ অনেক টাকার আবশ্যক হইত তখন গোপনে খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে? খাজাঞ্চি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত—যেন তাহা পরের টাকা। খাজাঞ্চি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত। তাহার পরে কিছু কাল ধরিয়া অম্বিকা বাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোন মতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ, জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া তহবিলে প্রায় আমানতী, সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মত লুকাইয়া বেড়াইত, যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না—পত্র লিখিলেও কোন ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষুলজ্জা ছিল আর কোন লজ্জা ছিল না, এই জন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল তখন অম্বিকা-

চরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্ধুকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্ব্বলপ্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোনপ্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা! অলক্ষ্মী যাহার সহায়, লোহার সিন্ধুকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুসি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না - এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনও সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপষের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপরপক্ষ হইতে ঘুষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপষ করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই—যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘুষ না লইয়া থাকিতে পারে ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মুখ হইতে ফুৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোন উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক

চক্ষুলজ্জা, দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা, পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোন অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিলেন—"তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও!"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্ব্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য্য হন নাই; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান?" বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, কখনই না।" অম্বিকাচরণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার উপর কি আপনার কোন সন্দেহের কারণ ঘটেছে?" বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"কিছুমাত্র না!" অম্বিকা-চরণ নয়নতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন—বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছুদিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্ত ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ অনেকদিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড় ভীড়। সেই জন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, আপনি বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না। অম্বিকাচরণ নিজের দুর্ব্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আম্‌লারা

সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকা ডেস্ক্ খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি; সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে, কি, ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। বামাচরণ কহিল, "আরে মশায় আপনারা ন্যাকামি রেখে দিন্! সকলেই জানেন্, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন।" অম্বিকা রুদ্ধ-রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?" বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, "সে আমরা কেমন করে বল্‌ব?" বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতি সুযোগে বামাচরণের মন্ত্রণাক্রমে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজরের প্রাইভেট্ ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না—অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্কে চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন—বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে; সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্ব্বলদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থির সৌদামিনী আর স্থির রহিল না—তাহার বক্ষ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র শুভ্রজ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"বিনোদ ছেলেমানুষ, দুর্ব্বলস্বভাব, পাঁচ জনের কথা শুনে তার মন বিগ্‌ড়ে গেছে!" তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে সমস্ত অপমান হইতে দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়!

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনি কাজ ছাড়িয়া দিবেন—আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন কিছুই সান্ত্বনা মানিল না। যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কি শাসন হইল? কাজে জবাব দিবার সংকল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম্ম সকল আরাম বিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট।

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল বাবুদের বাড়ির খাজাঞ্চি আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষুলজ্জাবশতঃ খাজাঞ্চির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই জন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র

লিখিয়া খাজাঞ্চির হস্তে গিয়া দিলেন। খাজাঞ্চি তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে ?

তদুত্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতাবশতঃ খাজাঞ্চিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ্ চড়িয়া যাইতেছিল—ততই নূতন নূতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিল তখন বিনোদ সেই সুযোগে তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগণা অনেক-কাল হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ পর্য্যন্ত টাকার জন্য কোন প্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বুঝিয়া হঠাৎ ডিক্রী করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই ত বিপদ !

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠতে পারচিনে—কাল এর পরামর্শ করা যাবে।" খাজাঞ্চি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন—বিনোদের এ অবস্থায় ত আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারিনে। ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল—অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধদ্বন্দ্ব সবলে দলন করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—না, এখন ছাড়তে পার না।

তাহার পরে কোথায় টাকা কোথায় টাকা করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল—যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বিনোদ সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না;—তিনি মনে করিলেন তাঁহার চারিদিক হইতে সকলি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে এখন এই গহনাগুলি তাঁহার একমাত্র শেষ অবলম্বনস্থল—এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোন টাকা পাওয়া গেল না তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-ভ্রুকুটির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতি পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত করিয়াছ এখন তুমি ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার তা হোক্।

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত সতীর রোষানল এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়া আছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইয়াছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন তাঁহার নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না।

অম্বিকাচরণ বড় ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া

গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বুঝাইবার যত্নই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া গম্ভীর হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহুকষ্টে দুইহস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলঙ্কাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণ মাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্ব্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব।

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুভ্রকেশধারা, সরলসুন্দর মুখচ্ছবি, শান্তস্নেহহাস্যময়, ধী-প্রদীপ্ত উজ্জ্বলগৌরকান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মুহূর্ত্তে এখানে উপস্থিত আছেন, এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগণা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিলেন; আর তাঁহার মনে কোন অপমানবেদনা রহিল না।

দুই বিঘা জমি।

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই ;
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়-জোর মরিবার মত ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে "বাপু, জানত হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে।"—কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন্ রক্ষে গরীবের ভিটেখানি!
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোণার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!"
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রুর হাসি হেসে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে!"

পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি!
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি!
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্ত্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্ব-নিখিল দু বিঘার পরিবর্ত্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি!

হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে বছর পনেরো ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হোলো।

নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমিছে চরণ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ।
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌, চখে আসে জল ভরে'।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি, রথ-তলা করি বামে
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পহুঁছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

ধিক্ ধিক্ ওরে, শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি!
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র-মাতা,
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা!
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস-বেশ,
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী হাসিয়া কাটাস্ দিন!

ধনীর আদরে গরব না ধরে!—এতই হয়েছ ভিন্ন
কোন খানে লেশ নাহি অবশেষ সে দিনের কোন চিহ্ন!
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি;
যত হাস আজ, যত কর সাজ, ছিলে দেবী, হলে দাসী!

বিদীর্ণহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আম গাছ এ কি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক কালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধূম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা!
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী!
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালী।
কহিলাম তবে, "আমিত নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!"
চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধরে' কাঁধে তুলি লাঠিগাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।

শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন্ "মারিয়া করিব খুন!"
বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ!
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভীখ্ মাগি মহাশয়!"
বাবু কহে হেসে "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়!"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে!
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!
৩১ শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩০২।

অপূর্ব্ব রামায়ণ।

(পাঞ্চভৌতিক সভা)

বাড়িতে একটা শুভকার্য্য ছিল, তাই বিকালের দিকে অদূরবর্ত্তী মঞ্চের উপর হইতে বারোয়াঁ রাগিণীতে নহবৎ বাজিতেছিল। ব্যোম অনেকক্ষণ মুদ্রিত চক্ষে শুনিয়া হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল:—

আমাদের এই সকল দেশীয় রাগিণীর মধ্যে একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের ভাব আছে; সুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে সংসারে কিছুই স্থায়ী হয় না। সংসারে সকলি অস্থায়ী, এ কথাটা সংসারীর পক্ষে নূতনও নহে, প্রিয়ও নহে, ইহা একটা অটল কঠিন সত্য; কিন্তু তবু এটা বাঁশির মুখে শুনিতে এত ভাল লাগিতেছে কেন? কারণ, বাঁশিতে জগতের এই সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠোর সত্যটাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর করিয়া বলিতেছে—মনে হইতেছে মৃত্যুটা

এই রাগিণীর মত সকরুণ বটে কিন্তু এই রাগিণীর মতই সুন্দর। জগৎ সংসারের বক্ষের উপরে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম যে জগদ্দল পাথরটা চাপিয়া আছে এই গানের সুরে সেইটাকে কি এক মন্ত্রবলে লঘু করিয়া দিতেছে। একজনের হৃদয়কুহর হইতে উচ্ছসিত হইয়া উঠিলে যে বেদনা চীৎকার হইয়া বাজিয়া উঠিত, ক্রন্দন হইয়া ফাটিয়া পড়িত, বাঁশি তাহাই সমস্ত জগতের মুখ হইতে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া এমন অগাধ করুণাপূর্ণ অথচ অনন্ত সান্ত্বনাময় রাগিণীর সৃষ্টি করিতেছে।

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী আতিথ্যের কাজ সারিয়া সবেমাত্র আসিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় আজিকার এই মঙ্গলকার্য্যের দিনে ব্যোমের মুখে মৃত্যু সম্বন্ধীয় আলোচনা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। ব্যোম তাহাদের বিরক্তি না বুঝিতে পারিয়া অবিচলিত অম্লানমুখে বলিয়া যাইতে লাগিল। নহবৎটা বেশ লাগিতেছিল আমরা আর সে দিন বড় তর্ক করিলাম না।

ব্যোম কহিল, আজিকার এই বাঁশি শুনিতে শুনিতে একটা কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে উদয় হইতেছে।—প্রত্যেক কবিতার মধ্যে একটি বিশেষ রস থাকে—অলঙ্কার শাস্ত্রে যাহাকে আদি করুণ শান্তি নামক ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ করিয়াছে—আমার মনে হইতেছে, জগৎরচনাকে যদি কাব্যহিসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেখানেই যদি অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধিমন্দিরের মত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় দুরূহ

হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্ব্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে, এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যেদিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্য ভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত ধর্ম্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মত নীড় অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে।—একে, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা বর্ত্তমান, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল,—আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত তবে তাহার একেশ্বর দৌরাত্ম্যের আর শেষ থাকিত না—তবে তাহার উপরে আর আপীল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দ্দেশ করিয়া দিত ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে? অনন্তের ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিয়া না রাখিত?

সমীর কহিল, মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোন মর্য্যাদাই থাকিত না। এখন জগৎসুদ্ধ লোক যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত। যদি নিতান্ত বাঁচিয়াই থাকিতে হইত তাহা হইলে জীবনটা বড় অবহেলার হইত।

ক্ষিতি কহিল, আমি সে জন্য বেশি চিন্তিত নহি; আমার মতে মৃত্যুর অভাবে কোন বিষয়ে কোথাও দাঁড়ি দিবার যো থাকিত না সেইটাই সব চেয়ে চিন্তার কারণ। সে অবস্থায় ব্যোম যদি অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিত কেহ যোড়হাত করিয়া এ কথা বলিতে পারিত না, যে, ভাই, এখন আর সময় নাই অত-এব ক্ষান্ত হও। মৃত্যু না থাকিলে অবসরের অন্ত থাকিত না। এখন মানুষ নিদেন সাত আট বৎসর বয়সে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কলেজের ডিগ্রি লইয়া অথবা দিব্য

ফেল্ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়; তখন কোন বিশেষ বয়সে আরম্ভ করারও কারণ থাকিত না, কোন বিশেষ বয়সে শেষ করিবারও তাড়া থাকিত না। সকলপ্রকার কাজকর্ম্ম ও জীবনযাত্রার কমা, সেমি কোলন্, দাঁড়ি একেবারেই উঠিয়া যাইত।

ব্যোম এ সকল কথায় যথেষ্ট কর্ণপাত না করিয়া নিজের চিন্তাসূত্র অনুসরণ করিয়া বলিয়া গেল:—জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী—সেই জন্য আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব সেইখানে। যে সব জিনিষ আমাদের এত প্রিয়, যে, কখনো তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না, সেগুলিকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি। পৃথিবীতে বিচার নাই, সুবিচার মৃত্যুর পরে; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিস্ফল হয়, সফলতা মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতের আর সকল দিকেই কঠিন স্থূল বস্তুরাশি আমাদের মানসী আদর্শকে প্রতিহত করে, আমাদের অমরতা অসীমতাকে অপ্রমাণ করে—কেবল জগতের যে সীমায় মৃত্যু, যেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রিয়তম প্রবলতম বাসনার, আমাদের শুচিতম সুন্দরতম কল্পনার কোন প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্মশানবাসী—আমাদের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যুনিকেতনে।

মুলতান বারোয়াঁ শেষ করিয়া সূর্য্যাস্ত কালের স্বর্ণাভ অন্ধকারের মধ্যে নহবতে পূরবী বাজিতে লাগিল। সমীর বলিল—মানুষ মৃত্যুর পারে যে সকল নিত্যকালস্থায়ী আশা আকাঙ্ক্ষাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে, এই বাঁশির সুরে সেই সকল চিরাশ্রুসজল হৃদয়ের ধনগুলিকে পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে ফিরাইয়া আনি-

তেছে। সাহিত্য এবং সঙ্গীত এবং সমস্ত ললিত কলা, মনুষ্য হৃদয়ের সমস্ত নিত্য পদার্থকে মৃত্যুর পরকাল প্রান্ত হইতে ইহ-জীবনের মাঝখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বলিতেছে, পৃথিবীকে স্বর্গ, বাস্তবকে সুন্দর, এবং এই ক্ষণিক জীবনকেই অমর করিতে হইবে। মৃত্যু যেমন জগতের অসীমরূপ ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে; তাহাকে এক অনন্ত বাসর শয্যায় এক পরম-রহস্যের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; সেই রুদ্ধ-দ্বার বাসর গৃহের গোপন বাতায়নপথ হইতে অনন্ত সৌন্দর্য্যের সৌগন্ধ্য এবং সঙ্গীত আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে; তেমনি সাহিত্যরস এবং কলারস আমাদের জড়ভারগ্রস্ত বিক্ষিপ্ত প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষের, অনি-ত্যের সহিত নিত্যের, তুচ্ছের সহিত সুন্দরের, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সহিত বিশ্বব্যাপী বৃহৎ রাগিণীর যোগ সাধন করিয়া তুলিতেছে। আমাদের সমস্ত প্রেমকে পৃথিবী হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া মৃত্যুর পারে পাঠাইয়া দিব, না, এই পৃথিবীতেই রাখিব ইহা লইয়াই তর্ক। আমাদের প্রাচীন বৈরাগ্যধর্ম্ম বলিতেছে; পরকালের মধ্যেই প্রকৃত প্রেমের স্থান—নবীন সাহিত্য এবং ললিতকলা বলিতেছে, ইহলোকেই আমরা তাহার স্থান দেখাইয়া দিতেছি।

ক্ষিতি কহিল; এই প্রসঙ্গে আমি এক অপূর্ব্ব রামায়ণ কথা বলিয়া সভা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি।

রাজা রামচন্দ্র—অর্থাৎ মানুষ—প্রেম নামক সীতাকে নানা রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়া নিজের অযোধ্যাপুরীতে পরমসুখে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র দল বাঁধিয়া এই প্রেমের নামে কলঙ্ক রটনা করিয়া দিল। বলিল, উনি

অনিত্য পদার্থের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন উঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাস্তবিক অনিত্যের ঘরে রুদ্ধ থাকিয়াও এই দেবাংশজাত রাজকুমারীকে যে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই সে কথা এখন কে প্রমাণ করিবে? এক, অগ্নিপরীক্ষা আছে, সে ত দেখা হইয়াছে—অগ্নিতে ইঁহাকে নষ্ট না করিয়া আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। তবু শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা প্রেমকে এক দিন মৃত্যু-তমসার তীরে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মহাকবি এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া এই অনাথিনী, কুশ এবং লব, কাব্য এবং ললিতকলা নামক যুগল সন্তান প্রসব করিয়াছেন। সেই দুটি শিশুই কবির কাছে রাগিণী শিক্ষা করিয়া রাজসভায় আজ তাহাদের পরিত্যক্তা জননীর যশোগান করিতে আসিয়াছে। এই নবীন গায়কের গানে বিরহী রাজার চিত্ত চঞ্চল এবং তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখনও উত্তরাকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। এখনো দেখিবার আছে কাহার জয় হয়—ত্যাগপ্রচারক প্রবীন বৈরাগ্য-ধর্ম্মের, না, প্রেমমঙ্গল-গায়ক দুটি অমর শিশুর?

ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মী বাই।

(২)

১৮৫৮ অব্দের সিপাহি-বিদ্রোহ বঙ্গদেশে সূত্রপাত হইয়া ক্রমশঃ সেই বিদ্রোহানল মিরট, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত হইল। মিরট ও দিল্লির বিদ্রোহ-সমাচার ঝাঁশিতে আসিয়া পৌঁছিল। এই সময়ে, ঝাঁশি-স্থিত সিপাহী পল্টনের অধিনায়ক কাপ্তেন ডন্‌লপ্‌

এবং ঝাঁশির কমিশনর ও সমস্ত রাষ্ট্রীয় বিভাগের কর্ত্তা, কাপ্তেন আলেক্জাণ্ডার স্কীন ছিলেন। তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আর সকল স্থানের সৈন্য বিগ্‌ড়াইলেও, ঝাঁশির সৈন্য কখনই বিগ্‌ড়াইবে না। বিশেষতঃ, ঝাঁশির রাণী অবলা রমণী, কঠোর বৈধব্য ব্রতানুষ্ঠানে দিনপাত করিতেছেন। ঝাঁশি খাস হইবার পরেও, রাণী কোন প্রকার দুরাগ্রহ বা জেদ্ প্রদর্শন করেন নাই; তিনি অতি সহিষ্ণু, উদার-বুদ্ধি ও রাজনিষ্ঠ;—অতএব তাঁহার অধিকারের মধ্যে রাজদ্রোহ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, ইহাই স্কীন সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অথচ এই সময়ে তলে তলে, বিদ্রোহের যে গুপ্ত-পরামর্শ চলিতেছিল তাহা তিনি আদৌ জানিতে পারেন নাই। ২ জুন তারিখে ঝাঁশি-সিপাহীদিগের প্রকৃত ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই দিন, একটা ঘরে আগুন লাগে; লোকে ভাবিল, উহা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। তাহার পর, ৪ তারিখে, কালা-পদাতিক-পল্টনের তৃতীয় দলের মধ্যে বিদ্রোহের প্রকাশ্য কার্য্য আরম্ভ হইল। গুরবক্ষ নামক এই পল্টনের হাওলদার কতকগুলি সিপাহী সঙ্গে লইয়া "ষ্টার ফোর্টের" মধ্যে প্রবেশ করিল। এই ক্ষুদ্র ইমারতের মধ্যে, বন্দুক বারুদ গোলা, খাজনা-তহবিল সমস্তই রক্ষিত হইত। এই বিদ্রোহী সিপাহীরা তৎসমস্ত দখল করিয়া লইল। ইহা জানিতে পারিয়া, ডনলপ্ সাহেব, দ্বাদশ পল্টনের বাকী লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগের কাওয়াৎ (প্যারেড্) করাইলেন, এবং তাহাদিগকে প্রশমিত করিবারও বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ভয়-চিহ্ন দেখিবামাত্র, সমস্ত য়ুরোপীয় লোক ছাউনী ত্যাগ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কাপ্তেন স্কীন ও গর্ডন সাহেব কেল্লার মধ্যে যাইবার জন্য সমস্ত য়ুরোপীয়দিগকে গুপ্তভাবে পরামর্শ

দিলেন। কাপ্তেন ডনলপ্ সাহেবও তাঁহার সাহায্যার্থে একদল সৈন্য পাঠাইতে নৌগাঙ্গের সেনা-নায়ককে পত্র লিখিলেন। পর দিন সকালে, কাপ্তেন স্কীন ও গর্ডন, ইঁহারা সেনা-নায়ক ডনলপ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছাউনী-স্থানে আসিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে গুপ্ত পরামর্শ হইয়া প্রতিবিধানেয় সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইল। ডনলপ এনসাইন্ টেলরকে সঙ্গে করিয়া, কাওয়াৎ-স্থানে কাওয়াৎ করাইবার জন্য আসিলেন। পল্টনের বিদ্রোহী সিপাহীরা দুই জনকে গুলি করিয়া মারিল। ঝাঁশির প্রধান সেনানায়ক নিহত হওয়ায়, বিদ্রোহী দল বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে যম-সদনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এই সময়ে, স্ত্রীপুত্র সহ স্কীন—কমিশনর সাহেব; গর্ডন—ডেপুটি কমিশনর সাহেব ইত্যাদি প্রায় ৪৫ জন কেল্লার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা সশস্ত্র হইয়া দুর্গরক্ষণের ব্যবস্থা কবিতে লাগিলেন। কেল্লার প্রকাণ্ড সিংহদ্বার রুদ্ধ করিয়া স্থানে স্থানে প্রস্তর-রাশি স্তূপাকার করিয়া রাখিলেন। বিদ্রোহীগণ ছাউনী-স্থিত য়ুরোপীয়দিগকে নিহত করিয়া কেল্লার অভিমুখে অগ্রসর হইল। কেল্লার অভ্যন্তরস্থ য়ুরোপীয়েরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে হটাইবার চেষ্টা করিল, এবং পর দিবস রাণী সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় তিন জন য়ুরোপীয়কে রাজবাটীতে প্রেরণ করিল। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে পথে ধৃত করিয়া নিহত করিল। এবং কতকগুলা পুরাতন তোপ তৈয়ার করিয়া কেল্লার উপর গোলা বর্ষণের উদ্যোগ করিল। কিন্তু সেই তোপগুলা বেমেরামৎ অবস্থায় থাকায়, কোন ফল হইল না। এদিকে, কেল্লার লোকেরাও বিদ্রোহীদিগের উপব গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক বিদ্রোহী

পিছু হটিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের লোকসংখ্যা অধিক থাকায় তাহারা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা কেল্লার গুপ্তদ্বারের সন্ধান পাইয়া কেল্লার মধ্যে হল্লা করিয়া প্রবেশ করিল। এবং কেল্লার দরজা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল। য়ুরোপীয়েরা গুলিবর্ষণ করিয়া প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; য়ুরোপীয় মহিলারাও যুদ্ধে সাহায্য করিতে লাগিল। কাপ্‌তেন স্কীন সাহেব চিতা-বাঘের ন্যায় ইতস্তত ঘূরিয়া ফিরিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে, বিদ্রোহীদিগের মধ্যে একজন তীরন্দাজ লক্ষ্য সন্ধান করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। ক্রমে য়ুরোপীয়দিগের গোলা-বারুদও নিঃশেষ হওয়ায়, বিদ্রোহীরা কেল্লার অনেক স্থান অধিকার করিল। ইহাতে য়ুরোপীয়েরা হতবীর্য্য ও হতাশ হইয়া সন্ধির নিশান প্রদশন করিল। বিদ্রোহীরা স্কীন সাহেবকে বলিয়া পাঠাইল, যদি তোমরা অস্ত্রত্যাগ করিয়া, কেল্লার দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে আইস তাহা হইল তোমাদিগের একটা কেশও স্পর্শ করিব না। কিন্তু এই কথা অনুসারে য়ুরোপীয়েরা দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক যেমন বাহিরে আসিল, অমনি বিদ্রোহীরা হল্লা করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ কবিল এবং তাহাদিগের সকলকে পীঠমোড়া করিয়া ফেলিল এবং এই ভাবে তাহাদিগকে শহরের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইতি মধ্যে, বক্‌শিস আলী নামক এক সোয়ার আসিয়া বলিল, উহাদের প্রাণবধের হুকুম হইয়াছে, এই বলিয়া সে তলোয়ারের এক ঘায়ে স্কীন সাহেবের মস্তক উড়াইয়া দিল এবং তাহার অধীনস্থ লোকেরা, স্ত্রী পুত্রসহ বাকী য়ুরোপীয়দিগের প্রাণ নাশ করিল।

ইংরাজদিগের বিশ্বাস, এই সমস্ত নৃশংস কার্য্যে রাণী সাহেবের সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সহায়তা ছিল। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকার

বলেন, তিনি এ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্র হইতে যে প্রকৃত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টরূপে দেখা যায়, ইহাতে রাণী সাহেবের কোন হাত ছিল না।

জুন মাসের প্রারম্ভেই, ঝাঁশির সৈন্য মধ্যে একটু বিদ্রোহ ভাবের সূচনা দেখিয়াই, ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন গর্ডন সাহেব ও ছাউনীস্থিত আর আর য়ুরোপীয়েরা রাণীসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন ও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে রাণী এইরূপ বলেন, তোমাদিগকে আশ্রয় দান করিলে বিদ্রোহী সিপাহীরা আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবে আমি জানি, তথাপি আমি তোমাদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তৎকালে, রাণীর খাস-সৈন্যের মধ্যে দেড় দুই শত জন মাত্র ছিল, ইংরাজদিগের সাহায্য করিবার জন্য আরও বেশি লোক রাখিতে গর্ডন সাহেব রাণীকে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর দিবস, গর্ডন সাহেব একক রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাণীসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমাদিগের যাহাই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু আমাদিগের মহিলাদিগের সংরক্ষণভার আপনাকে লইতেই হইবে। তাহাদিগকে আপনার রাজবাটীতে আশ্রয় দিউন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। রাণী সাহেব উত্তর করিলেন, আমার যতদূর সাধ্য আমি করিব, তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই। তাহার পর দিবস, য়ুরোপীয় মহিলারা রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। তাহাদিগের থাকিবার জন্য একটা প্রশস্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাহাদিগের রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল। কিন্তু ছাউনী মধ্যে বিদ্রোহীরা যখন হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল, তখন তত্রস্থ য়ুরোপীয়েরা ভীত হইয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাদিগের মহিলাদিগকেও রাজবাটী হইতে

উঠাইয়া আনিয়া কেল্লার মধ্যে স্থাপন করিল। কেল্লার মধ্যে চলিয়া যাইবার পরেও, রাণী সাহেব য়ুরোপীয়দিগকে বারম্বার ভরসা দিলেন এবং দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত গোপনে রাত্রিকালে তিন মন করিয়া গমের রুটি তাহাদের আহারের জন্য পাঠাইতে লাগিলেন। এদিকে, কর্ণেল ম্যালিসন সাহেব বলেন, "রাণীসাহেব মুখ্য মুখ্য মণ্ডলী সমভিব্যাহারে দুই নিশান উড়াইয়া মহাসমারোহে ছাউনীর মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে হাসন-আলী নামক এক মোল্লা, সকল মুসলমানকে নিমাজ পড়িতে ডাকিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিল এবং সেই উত্তেজনা-বাক্যে সকল লোকে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল।" কিন্তু আমাদের লেখক বলেন, ইহা ম্যালিসন সাহেবের বুঝিবার ভুল। কারণ, রাণীসাহেবের সপত্নীমাতা বলেন, সে সময়ে রাণী সাহেব রাজবাটী হইতে কখনই বাহির হন নাই। বোধ হয়, বিদ্রোহীরা একটা মিথ্যা ঠাট সাজাইয়া লোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্যই এইরূপে বাহির হইয়া থাকিবে।

রাণীসাহেব, প্রথমে বিদ্রোহীদিগকে যে সাহায্য করেন নাই তাহার বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে, তাঁহার অধীনে সুচতুর বুদ্ধিমান লোক ও সৈন্যসামন্ত অধিক না থাকায় এবং বিদ্রোহীদল প্রবল হইয়া উঠায়, তিনি ইংরাজদিগকে সমুচিত সাহায্য করিতে পারেন নাই। তথাপি, বিদ্রোহীরা দিল্লি অভিমুখে চলিয়া গেলে, নিহত য়ুরোপীয়দিগের শব, তিনি আপনার লোকজনের দ্বারা উঠাইয়া আনিয়া তাহাদিগের রীতিমত সমাধি সংকার করাইয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যে দুই একজন ইংরাজপুরুষ ও স্ত্রীলোক লুকাইয়া আপনাদিগের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, রাণীসাহেব তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের

জন্য উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মার্টিন নামক এক সাহেব আগ্রাতে এখনও জীবিত আছেন। তিনি, রাণী সাহেবের দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে ২০ আগষ্ট, ১৮৮৯ অব্দে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি বলেন ঃ—"আপনার মাতা বেচারার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ও নৃশংস ব্যবহার করা হইয়াছে এবং তাঁহার আসল বৃত্তান্ত আমি যেমন জানি এমন আর কেহই জানে না। ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে ঝাঁশীনিবাসী য়ুরোপীয়দিগের যে হত্যাকাণ্ড হয়, তাহাতে রাণী বেচারা আদৌ যোগ দেন নাই। তদ্বিপরীতে বরং তিনি, য়ুরোপীয়েরা কেল্লার মধ্যে যাইবার পরে, দুই দিবস ধরিয়া তাহাদিগের আহারের যোগান দিয়াছিলেন এক শত জন বন্দুকধারী লোক "করারা" হইতে আনাইয়া আমাদিগের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু একদিন কেল্লার মধ্যে রাখিয়া, সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে রাণীসাহেব, মেজর স্কীন ও কাপ্তেন গর্ডনকে,—"দত্তিয়া" নামক স্থানে পলায়ন করিয়া—তত্রস্থ রাজার আশ্রয়ে থাকিতে পরামর্শ দেন কিন্তু এ কথাতেও তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না এবং অবশেষে তাঁহারা আপনাদিগের নিজের সৈন্যের দ্বারাই নিহত হইলেন"।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার কে-সাহেবও এইরূপ বলেন ঃ—"আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, হত্যাকাণ্ডের সময় রাণীর কোন ভৃত্যই উপস্থিত ছিল না। ইহা প্রধানতঃ আমাদের নিজের অনুচরবর্গেরই কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়। অনিয়মিত দলের অশ্বারোহী সিপাহীরাই এই রক্তময় ভীষণ আদেশ প্রচার করে এবং দারোগাই এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান সর্দার।"

সে যাহাই হউক, ধারাবাহিক ঘটনার সূত্রটী আবার ধরা

যাউক। ঝাঁশির বিদ্রোহীরা য়ুরোপীয়দিগকে নিহত করিয়া রাজবাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল এবং রাণীসাহেবকে এই কথা বলিয়া পাঠাইল;—আমাদিগের দিল্লি যাইতে হইবে, ইহার দরুন তিন লক্ষ টাকা আবশ্যক; এই টাকা যদি আপনি না দেন, তাহা হইলে আপনার রাজবাটী তোপের দ্বারা এখনই উড়াইয়া দিব। রাণীর পিতা মৌরপন্ত ও দেওয়ান লক্ষণ রাও, রাণীর নিকট আসিলেন এবং এই সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী অবলা স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার অপরিসীম সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি ছিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া রাজ্যরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বিদ্রোহের নেতাদিগের নিকট এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন; "আমার সমস্ত রাজ্য ইংরাজ সরকার খাস করিয়া লওয়ায় আমি অর্থহীন হইয়াছি—এক্ষণে আমার নিতান্ত দৈন্যদশা উপস্থিত। এই সময়ে আমার ন্যায় গরিব অবলাকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের উচিত নহে।" বিদ্রোহীরা ইহার প্রত্যুত্তরে এইরূপ বলিয়া পাঠাইল; "তোমার নিকট হইতে যদি খর্চ্চার হিসাবে কিছু টাকা না পাওয়া যায়, তবে তোমার প্রাসাদ দখল করিয়া, আমাদের অধিকৃত ঝাঁশির রাজ্য তোমার স্বসম্পর্কীয় সদাশিবরাও নারায়ণকে দেওয়া যাইবে।" রাণী এই কথা শুনিয়া নিরুপায় হইয়া আপনার নিজ সম্পত্তি হইতে এক লক্ষ টাকা বিদ্রোহীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন; তখন, বিদ্রোহীরা রাজবাটী ছাড়িয়া দিয়া, আপনাদিগের সমস্ত সৈন্য মধ্যে এই দোহাই বাক্য প্রচার করিল "খোদার মুলুক, বাদশার মুলুক, রাণী লক্ষ্মীবাইর আমল", এই দোহাই দিয়া বিদ্রোহীরা দিল্লি, নৌগাঙ্গ প্রভৃতি স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল।

এই সময়ে রাণী সাহেবের অধীনে, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি কেহই ছিল না। ঝাঁশি খাস হইয়া গেলে, অনেক ভাল ভাল লোক ঝাঁশি হইতে বিদায় হইয়া যায়। এক্ষণে, কোন গুরুতর রাষ্ট্রীয় কাজ উপস্থিত হইলে সুপরামর্শ দিবার কেহই ছিল না। রাণী স্বয়ং কুশাগ্রবুদ্ধি ও চতুর ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ায় অনেক সময় অনেক কথা তাঁহার গোচর হইত না। তাঁহার অধীনস্থ অযোগ্য কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে না জানাইয়াই অনেক কাজের নিষ্পত্তি করিত। ইংরাজ সরকার হইতে কোন পত্রাদি আসিলে তাহারা তাহার রীতিমত জবাব দিত না; সুতরাং রাণীসাহেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মিত্রভাব ইংরাজদিগের গোচর হইত না। ইহা হইতে অনেক অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। একজন ইংরাজী-জানা শিরেস্তাদার পূর্ব্বে ছিল, প্রধান কর্ম্মচারীরা তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করায় আরও গণ্ডগোল ও কাজের বেবন্দবস্ত আরম্ভ হইল। রাণী মনে করিতেন, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে পত্রাদি লিখিত হইয়া ইংরাজ সরকারের নিকট যাইতেছে, অথচ সেরূপ কিছুই হইত না। এই গণ্ডগোলের মধ্যেও, দুই একটা পত্র বোধ হয় ইংরাজ সরকারের নিকট পৌঁছিয়াছিল। কারণ, ঝাঁশির কমিশনর পিন্‌কলে সাহেব স্পষ্ট লিখিয়াছেন: "খুব বিশ্বস্ত সূত্র হইতে অগবত হওয়া গিয়াছে, রাণী আমাদিগের স্বদেশীয়দিগের হত্যাকাণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করিয়া জব্বলপুরের কমিশনরকে পত্র লেখেন এবং এইরূপ পত্রাদি লিখিয়া তিনি ইংরাজ সরকারের সহিত মিত্রভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আরও এইরূপ লেখেন যে, সেই হত্যাকাণ্ডে তাঁহার কোন হাত ছিল না এবং যাবৎ না ইংরাজ সরকার ঝাঁশি পুনরাধিকার করিবার বন্দবস্ত করিবেন, তাবৎ ঝাঁশি

রাজ্য রাণী তাঁহার নিজ দখলে রাখিবেন। এতদ্ব্যতীত, এই পত্র যিনি স্বহস্তে কমিশনর সাহেবের হাতে দিয়াছিলেন, সেই মার্টিন সাহেব এখনও জীবিত আছেন। তিনি রাণীসাহেবের দত্তকপুত্রকে যে পত্র লেখেন তাহার মধ্যে একস্থলে এইরূপ আছেঃ "তিনি (রাণী) এর্কসিন সাহেবের নিকট জব্বলপুরে পত্র পাঠাইয়া দেন, আমি সেই পত্র নিজহস্তে কমিশনর সাহেবকে দেই-- রাণীর কৈফিয়ৎ শুনিয়া তিনি কি বলেন, আমি জানিতে উৎসুক হইলাম—কিন্তু না!—ঝাঁশির নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে—কিছু না শুনিয়াই—কোন বিচার না করিয়াই, ঝাঁশি অপরাধী সাব্যস্ত হইল।"

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রথমে রাণী ইংরাজের বিরুদ্ধে ছিলেন না, তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ ঝাঁশি-রাজ্য শাসন করিতেছিলেন মাত্র।

এদিকে, ঝাঁশি-রাজ্য ইংরাজের হস্তচ্যুত হইয়া আবার রাণীর হস্তগত হইয়াছে দেখিয়া, ঝাঁশিরাজ্যের একজন দাবীদার সদাশিব দামোদর এই অবসরে ঝাঁশির গদি অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ঝাঁশির ৩০ মাইল দূরে, করেরা নামক একটি কেল্লা দখল করিয়া সদাশিব রাও "ঝাঁশির মহারাজা" এই উপাধি ধারণ করিলেন। ঝাঁশির রাণী এই কথা শুনিবামাত্র এক সহস্র সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সেই সৈন্যমণ্ডলী করেরা অবরোধ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি সিন্ধিয়ার রাজ্যে পলায়ন করিলেন এবং সেখান হইতে ঝাঁশি আক্রমণের উদ্যোগ করায়, রাণী তাঁহার বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ সদাশিবকে এইবার বন্দী করিয়া আনিল।

একদল শত্রু পরাভূত না হইতে হইতেই ঝাঁশির নিকটস্থ বোর্‌ছা নামক সংস্থানের দেওয়ান নথে খাঁ বিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যহারে ঝাঁশির বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। এবং ঝাঁশির নিকটস্থ বেত্রবতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে রাণীর সৈন্য অতি অল্প ছিল। নথে-খাঁ রাণী সাহেবকে বলিয়া পাঠাইল ঃ "ইংরাজ সবকার তোমার ভরণ-পোষণের জন্য যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই বৃত্তি আমি দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি ঝাঁশির কেল্লা ও সহর আমাকে ছাড়িয়া দেও।" এই কথা শুনিবামাত্র রাণীর অত্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তিনি এই বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য আপনার দেওয়ান ও প্রধান মণ্ডলীকে ডাকাইলেন। তাহারা বলিল, যদি আপনি বোর্‌ছার রাণী লড়য়ী বাইর নিকট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন, তবে আর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? এই কথা শুনিয়া রাণীর অত্যন্ত কষ্ট হইল; এবং এই কাপুরুষোচিত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সেই তেজস্বিনী মহিলা নথে খাঁর নিকট এইরূপ উত্তর পাঠাইয়া দিলেন ঃ—"আমি শিবরাঙ ভাউর পুত্রবধু; তোমাদিগের ন্যায় বুণ্ডেলখণ্ডের লোক-দিগকে স্ত্রীলোক বানাইয়া ছাড়িয়া দিতে পারি, এরূপ সামর্থ্য আমার আছে—অতএব তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" এই উত্তর প্রাপ্ত হইবামাত্র নথেখাঁর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইল এবং তিনি সসৈন্যে ঝাঁশি অভিমুখে যাত্রা করি-লেন। এদিকে রাণীসাহেব, ঝাঁশি-সংস্থানের অভিজাত ঠাকুর মণ্ডলী ও বুণ্ডেলখণ্ডের জাগীরদারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দরবার বসাইলেন এবং সেই দরবারে তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার অধীনস্থ সরদার—আমার আব্রু ও মান রক্ষা করা তোমা-দিগের কর্ত্তব্য। রাণী সাহেবের এই কথা শুনিয়া বুণ্ডেল-সর্দ্দা-

রেরা বলিল "ঝাঁশির উপর ইংরাজদিগেরই সার্ব্বভৌম আধিপত্য। বোর্ছা আমাদিগের সমান একটী সংস্থান মাত্র—বোর্ছার হস্তে সার্ব্বভৌম অধিকার ন্যস্ত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেহে প্রাণ থাকিবে সে পর্য্যন্ত এই রাজ্য তাহাদিগকে অধিকার করিতে দিব না।" এই পণ অনুযায়ী পত্র লিখিয়া নথেখাঁর নিকট পাঠান হইল। এবং সেই সঙ্গে পাঁচটা গোলা ও কিঞ্চিৎ বারুদ পাঠাইয়া এইরূপ ইঙ্গিত করা হইল যে "এই সমস্ত উপকরণ আমাদিগের নিকট আছে—অতএব তোমরা যদি মরণের মুখে আসিতে চাও, তো ঝাঁশিতে আসিবে।" যুদ্ধের আমন্ত্রণ পৌছিবামাত্র নথেখাঁ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এদিকে রাণীর সৈন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে, ইংরাজ সরকার ঝাঁশির সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন এবং কেল্লার উপরিস্থিত তোপ ও তাহার গোলা-বারুদ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এক্ষণে, রাণী সাহেব আবার সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—গোলাবারুদ প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিলেন; কেল্লার মধ্যে পূর্ব্বেকার যে তিন তোপ পোঁতা ছিল এবং রাজবাড়ির মধ্যে যে চারিটা তোপ লুকানো ছিল—এই সকল এক্ষণে বাহিরে আনাইয়া কেল্লার প্রকাণ্ড বুরুজের উপর তাহাদিগকে উঠানো হইল; ঝাঁশি-সংস্থানের সর্দ্দার ও ঠাকুর মণ্ডলীর নিকট গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রণ পাঠান হইল। তাহারা স্বীয় অধীনস্থ সশস্ত্র অনুচর লইয়া উপস্থিত হইল। রাতারাতি তোপ চালাইবার সুব্যবস্থা হইল, উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ নিযুক্ত হইল এবং প্রাতঃকালে দেওয়ান—জওহর সিংহের হস্তে রণকঙ্কণ পরাইয়া তাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ করা হইল। সেনাপতি জওহর সিংহ দুর্গপ্রাচীরের উপর তোপ ও গোলন্দাজ সৈন্য সজ্জিত রাখিলেন এবং এক সহস্র বাছা-বাছা শস্ত্রধারী পদাতিক, শত্রুর মোহরা আক্র-

মণ করিবার জন্য প্রস্তুত রাখিলেন। স্বয়ং রাণী সাহেব পাঠানী বেশ ধারণ করিয়া কেল্লার মুখ্য বুরুজের উপর উপস্থিত রহিলেন এবং সেইখানে পেশোয়া আমলের পুরাতন নিশান ও ইংরাজদত্ত "য়ুনিয়নজ্যাক" পতাকা স্থাপিত করিলেন। এদিকে, নথেখাঁ, ভাবী বিজয়াশায় উৎফুল্ল হইয়া রাষ্ট্রীয় নিশান-পতাকা উড্ডীন করিয়া মহা সমারোহে ঝাঁশিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী সাহেব, কেল্লার দক্ষিণ অভিমুখে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন—তাহাতে কোন বাধা দিলেন না; পরে, তোপের আন্দাজের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহার চতুর গোলন্দাজ গোলাম-গোশ-খাঁকে গোলা-বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। নথে খাঁর লোকেরাও তীর ও বন্দুকের গুলি এক সঙ্গে ছুঁড়িতে লাগিল। দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কেল্লার উপরিস্থিত তোপের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে অস্থির হইয়া নথে খাঁর সৈন্য পিছু হটিল এবং কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া কেল্লা অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রতিদিন উভয় সৈন্যের এক একবার সাক্ষাৎকার হইতে লাগিল। যুদ্ধের প্রথম আরম্ভেই, নথে খাঁর ধ্বজপতাকা ধরাশায়ী হইল এবং বিস্তর সৈন্য বিনষ্ট হইল। ঝাঁশির অবলা বিধবা রাণীর সহিত যুদ্ধে তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইবে, ইহা অতি লজ্জার কথা বিবেচনা করিয়া নথে খাঁ, রাত্রিকালে, ঝাঁশি-কেল্লার "বোর্‌ছা" দরজার উপর লক্ষ্য সন্ধান করিয়া চারিটা তোপ বসাইলেন এবং সমস্ত সৈন্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ঝাঁশি-সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। যদিও রাণী সাহেবের সৈন্য সুসজ্জিত ও প্রস্তুত ছিল, তথাপি "বোর্‌ছা"—দরজার উপর, চারিটা তোপের গোলা বর্ষিত হওয়ায়, দরজা ভগ্নপ্রায় হইল। এই সংবাদ রাণী সাহেব জানিবা-

মাত্রই, তাঞ্জামে আরোহণ করিয়া "বোর্ছা" দরজার উপরিস্থিত তোপ-শ্রেণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রভূত আবেশ-ভরে তত্রস্থ সৈন্যদিগকে সাবাশি দিয়া তাহাদিগকে আরও উত্তেজিত করিবার জন্য কিছু কিছু বক্‌শিসও দিলেন। তাহারা উৎসাহিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে, বীর-চূড়ামণি সর্দ্দার লালা-ভাউ-বক্‌শিকে হুকুম করিয়া, "কড়ক বিজলী" নামক কেল্লার প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড তোপ বুরুজের উপর আনাইলেন এবং গোলন্দাজকে সুবর্ণ-বলয় বক্‌শিস দিয়া তুমুল যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। এই তোপের বর্ষণ সুরু হইবামাত্র শত্রুপক্ষের সমস্ত গোলন্দাজ ভয়চকিত হইয়া রণবিমুখ হইল এবং উহাদিগের তোপ ঝাঁশি-সৈন্যের হস্তগত হইল। রঘুনাথ সিংহ প্রভৃতি সরদার-গণ পলায়োন্মুখ শত্রু সৈন্যের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাভূত করিল। রাণী সাহেব, রঘুনাথ সিংহের শৌর্য্য-বীর্য্যের স্তুতিবাদ করিয়া, তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। এইক্ষণে, বোর্ছার পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব আসিল। বোর্ছা-সংস্থান অতীব প্রাচীন ও ক্ষত্রিয় কুল মধ্যে বোর্ছার রাজবংশ সর্ব্বজনবন্দ্য হওয়ায়, রাণী সাহেব অতীব উদার-বুদ্ধি সহকারে যুদ্ধের খরচা প্রভৃতি লইয়া, বোরছার রাণীর সহিত সখ্যমূলক সন্ধিস্থাপন করিলেন। শ্রীমতী চিমাবাই বলেন, "ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মীবাই ও বোর্ছার রাণী লড়য়্যী বাই—ইহাঁদের মধ্যে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় মিলন হইল।"

এই প্রকারে, ঝাঁশির উপস্থিত বিপদ নিবারণ করিয়া, রাণী লক্ষ্মীবাই ঝাঁশি-প্রদেশের সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন এবং পত্রের দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত হ্যামিল্টন সাহেবের গোচর করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, নথে খাঁ পথিমধ্যে পত্রবাহককে

ধৃত করিয়া, সে পত্র পৌছিতে দিল না। শুদ্ধ তাহা নহে, সে স্বয়ং হ্যামিল্টন সাহেবকে এই মর্ম্মে একটা পত্র লিখিল যে, রাণী লক্ষ্মী-বাই বিদ্রোহীর দলভুক্ত হইয়াছেন—সেই জন্য আমি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সকল কারণে, রাণী লক্ষ্মীবাই ইংরাজদিগের হইয়াই যে ঝাঁশির সুশাসন ও সুব্যবস্থা করিতেছিলেন, ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা জানিতে পারিল না।

৯। ১০ মাস যাবৎ ঝাঁশি ইংরাজের হস্তচ্যুত হইয়া রাণীর শাসনাধীনে ছিল। এই সময়ে তিনি রাজ্যশাসন কার্য্যে যেরূপ প্রবীনতা, দক্ষতা, প্রজাবাৎসল্য, ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তিনি কিরূপে সময় অতিবাহিত করিতেন, তৎসাময়িক একজন ব্যক্তি এইরূপ বর্ণনা করেনঃ প্রাতঃকালে ৫টার সময় উঠিয়া, উত্তম সুরভি-দ্রব্য-সহযোগে মঙ্গল স্নান করিতেন। স্নানাদি করিয়া পরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনারূঢ় হইতেন। তদনন্তর, পতিবিয়োগের পর কেশ রাখিতে হইলে যে কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক সেই প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিয়া. রৌপ্যনির্ম্মিত তুলশি-বৃন্দাবনে শ্রীতুলশির পূজা করিতেন। তাহার পর পার্থিব শিব পূজা আরম্ভ হইত। সেই সময়ে সরকারী গায়ক গান করিত। ইহার পর, সর্দ্দার ও আশ্রিত লোকের দরবার বসিত। যদি কোন দিবস, কোন ব্যক্তিবিশেষ না আসিত অমনি পরদিবস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "কাল আপনি কেন আসেন নাই"? এইরূপে পূজার্চ্চনা সমাপন করিয়া ভোজন করিতেন ও ভোজনান্তে একটু নিদ্রা যাইতেন কিম্বা অপর কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

প্রাতঃকালে যে নজরের টাকা জমা হইত তাহা রূপার থালায় রেশমি বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিত। সেই টাকা হইতে ইচ্ছামত

স্বয়ং কিছু গ্রহণ করিয়া, বাকী টাকা আশ্রিত মণ্ডলীর জন্য কোষাধ্যক্ষের জিম্মা করিয়া দিতেন। তদনন্তর. প্রায় তিন ঘটিকার সময়ে কাছারী যাইতেন। সেই সময় প্রায়ই পুরুষ বেশ ধারণ করিতেন। পায়ে পায়জামা, অঙ্গে বেগুণী রঙ্গের অঙ্গরখা, মাথায় টুপী, তাহার উপর পাঠানী পাগ্‌ড়ি কোমরে জরির দোপাটা ও তাহাতে রত্নখচিত তলোয়ার ঝোলানো; এইরূপ বেশভূষায় সেই গৌরবর্ণ মূর্ত্তি গৌরীর ন্যায় উপলব্ধি হইত। কখন কখন স্ত্রীলোকের উপযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিতেন। পতিবিয়োগের পর নথ প্রভৃতি অলঙ্কার আদৌ ধারণ করিতেন না। হাতে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মালা এবং অনামিকায় এক হীরার আংটি—ইহা ব্যতীত তাঁহার অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার দেখা যাইত না। কেশ, প্রায় গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। তিনি শাদা শাড়ি ও শাদা চেলি পরিতেন। এইরূপ কখন পুরুষবেশে ও কখন স্ত্রীবেশে রাণী ঠাকুরাণী দরবারে আসিতেন। তাঁহার বসিবার ঘর, দরবার-ঘরের সংলগ্ন ছিল। সেই ঘরের দ্বারে সোণালী "মেহেরাপ" তাহার উপর জরির লতা-পাতা-কাটা চিকের পর্দ্দা খাটানো হইত। সেই ঘরের ভিতরে গদির উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিতেন। দ্বারের বাহিরে, দুই জন ভল্লধারী রূপা ও সোণার আসাসোটা লইয়া হাজির থাকিত। সম্মুখে, রাজশ্রী লক্ষণরাও, দেওয়ানজী, কোমর বাঁধিয়া কাগজের তাড়া লইয়া দণ্ডায়মান ও তাহার কিঞ্চিৎদূরে হুজুর মুন্সি উপবিষ্ট থাকিত। কুশাগ্রবুদ্ধি রাণী ঠাকুরাণী, উপস্থিতকার্য্যসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইয়া তাহার হুকুম মুখে মুখে বলিয়া দিতেন কিম্বা কখন কখন নিজ হস্তে লিখিয়া দিতেন। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার অতীব দক্ষতা সহকারে নিষ্পন্ন করিতেন।

শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর উপর রাণীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবারে, স্বীয় দত্তকপুত্র সঙ্গে লইয়া, সন্ধ্যা-কালে সরোবর-মধ্যস্থিত মন্দিরে, মহালক্ষ্মী দর্শনে যাত্রা করিতেন। সরোবরে সুন্দর সুন্দর কমল ফুটিয়া থাকিত, তাহাতে সে স্থানের রমণীয় শোভা হইত। তিনি কখন পাল্কীতে চড়িয়া কখন বা অশ্বপৃষ্ঠে দেবীদর্শনে যাত্রা করিতেন। যে সময়ে তিনি পাল্কীতে আরোহণ করিতেন, কিন্‌খাব কাপড়ের জরির পর্দ্দা দিয়া পাল্কী ঢাকিয়া দেওয়া হইত। রাণী ঠাক্‌রণ যখন অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেন, তখন তাঁহার উষ্ণীষ-বিলম্বিত জরির অঞ্চল পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান হইয়া মনোহর শোভা বিকাশ করিত। যখন পাল্কী সোয়ারীতে যাইতেন, তখন পাল্কীর খুর ধরিয়া চার পাঁচজন দাসী, মহা ধূমধামে চলিত। এই দাসীরা পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিয়া সুবর্ণ রত্নের অলঙ্কার ও জরির চোলি অঙ্গে ধারণ করিত এবং সবুজ, লাল ও ছাই রঙ্গের শাড়ি ও পায়ে চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিত; এক হস্তে রৌপ্য কিম্বা স্বর্ণদণ্ডের চামর লইয়া ও আর এক হস্তে পাল্কী ধরিয়া, বাহকদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাইত। সেই সময়ে, এই অবিবাহিত সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত দাসীদিগকে অতি চমৎকার দেখিতে হইত। সোয়ারীর সম্মুখভাগে ডঙ্কা নিশান প্রভৃতি থাকায় রণবাদ্য বাজিতে থাকিত। নিশানের পশ্চাতে প্রায় দুই শত আফগান পদাতিক ও সোয়ারীর সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রায় একশত ঘোড়শোয়ার যাইত। পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে সংস্থানের প্রধান কর্ম্মচারী ও আশ্রিতমণ্ডলী অশ্বপৃষ্ঠে কিম্বা পদব্রজে যাই-তেন—তাঁহাদের সঙ্গে অনুচরবর্গও থাকিত। এইরূপ মহাসমা-রোহে শিঙ্গা প্রভৃতি নিনাদিত হইত—ভল্লদার, চোপদার প্রভৃতি হাঁক দিতে দিতে চলিত। রাণী ঠাকুরাণীর শোয়ারী কেল্লার

বাহির হইবামাত্র কেল্লার বুরুজ হইতে নহবৎ বাজিতে আরম্ভ হইত এবং ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত বাজিতে থাকিত। মন্দিরের নহবৎখানা হইতেও এই সময়ে নহবৎ বাজিত। যখন রাণী অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে দাসীজন ও আশ্রিতবর্গ যাইত না। কেবল, ঘোড়শোয়ার ও পাঠান পদাতিক সঙ্গে থাকিত। শ্রীমহালক্ষ্মী ঝাঁশি সংস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এই হেতু, তাঁহার সেবায় অনেক টাকা ব্যয় হইত। মঙ্গল দীপরক্ষণ, পূজার্চ্চনা, মহানৈবেদ্য, নহবৎ বাদ্য গায়ন, নর্ত্তকী ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি বন্দোবস্ত সমস্তই ছিল।

রাণী ঠাকুরাণীর আশ্রিত-মণ্ডলীর উপর অদ্ভূত দয়া ছিল। যাহাতে তাহাদিগের ভাল খাওয়া পরা হয়, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে সুখে থাকে, সেই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি সর্ব্ব-প্রকার গুণের মর্য্যাদা বুঝিতেন, এই জন্য তিনি গুণী লোকেরও প্রিয় ছিলেন। বড় বড় শাস্ত্রী, বিদ্বান ব্যক্তি বৈদিক ও যাজ্ঞিক তাঁহার নিকট থাকিত। ঝাঁশির পুস্তক সংগ্রহও অতীব মূল্যবান ছিল। উত্তম পৌরাণিক, গান-বাদন-পটু সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, কুশল কারীগর ইত্যাদি অনেক প্রকারের গুণী লোক তাঁহার আশ্রয়ে থাকিত। এবং তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া দূর দুরান্ত প্রদেশ হইতে কীর্ত্তনকার, গায়ক, শাস্ত্রী প্রভৃতি তাঁহার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

অশ্বপরীক্ষায় রাণী ঠাকুরাণীর বিশেষ দক্ষতা ছিল। সেই সময়ে উত্তর হিন্দুস্থান মধ্যে অশ্বপরীক্ষা সম্বন্ধে তিন জনের খুব খ্যাতি ছিল। এক শ্রীমন্ত নানাসাহেব পেশোয়া; দ্বিতীয়, বাবাসাহেব আপ্‌টে খালুহেরীকর; এবং তৃতীয় ঝাঁশির মহারাণী লক্ষ্মীবাই। ইনিই অশ্বপরীক্ষায় সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার অশ্বপরীক্ষার

অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে একটি গল্প এইঃ—এক দিবস এক সদাগর ভাল-দেখিতে ও চটুল এইরূপ দুইটি ঘোড়া সঙ্গে করিয়া রাজ বাড়িতে বিক্রয়ের উদ্দেশে আইসে। রাণী সেই দুই অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে চক্রপথে দৌড় করাইতে লাগিল এবং এইরূপ পরীক্ষা করিয়া, একের মূল্য হাজার ও দ্বিতীয়-টির মূল পঞ্চাশ টাকা স্থির করিলেন। ইহা শুনিয়া সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। দুই ঘোড়াই দেখিতে সতেজ ও সুন্দর—তবে, উভয়ের মধ্যে মূল্যের এত প্রভেদ হইল কেন, কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না। তখন, রাণীঠাকুরাণী বুঝাইয়া বলিলেন, এই উভয়ের মধ্যে একটী ঘোড়া সুন্দর ও আর একটী ঘোড়া সদ্‌গুণ বিশিষ্ট ও চটুল হইলেও উহার ছাতি ফাটা সেই জন্য একেবারে কাজের বাহির।"

রাণী-ঠাকুরাণীর দাতৃত্ব ও ঔদার্য্যগুণ আপরিসীম ছিল। তিনি কোন দরিদ্র কিম্বা ভিক্ষুককে কথনই বিমুখ করিতেন না। এক দিবস একজন কাশী নিবাশী বিদ্বান ব্রাহ্মণ রাজবাটীর নিত্যদানের সময় উপস্থিত হন। রাণীর কোন সভাসদ্‌ রাণীর নিকট এই ব্রাহ্মণের কুলশীল ও বিদ্যা সম্বন্ধে স্তুতিবাদ করিয়া বলিলেন, এই ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে—পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবার ইহাঁর ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অতি ব্যয়সাধ্য বলিয়া উনি মনে মনে কষ্ট পাইতেছেন। এই কথা শুনিয়া রাণী প্রশ্ন করিলেন, টাকা দিলে কন্যাদান করিতে কেহ প্রস্তুত আছে কি? তাহাতে, ভট্‌জী নম্রতা সহকারে বলিলেন "আমাদিগের স্বশ্রেণীর দেশস্থ ব্রাহ্মণ কাশিতে একজন আছেন। তাঁহার কন্যার বয়ঃক্রম প্রায় ১২ বৎসর হইবে—দেখিতেও সুরূপা, রাশি প্রভৃতিরও মিল আছে। কিন্তু এই কন্যার দরুণ তাঁহাকে চারি শত টাকা দিতে হইবে—আমি

দরিদ্র ব্রাহ্মণ অত টাকা কোথা হইতে দিব? এতদ্ব্যতীত, বিবাহ-ব্যয়ের দরুণ একশত টাকা তো লাগিবেই" এই কথা শুনিবামাত্র রাণী ঠাকুরাণী পাঁচ শত টাকা আনিয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে ঢালিয়া দিলেন ও বলিলেন, "যখন বিবাহ হইবে, আমাদিগকে কুঙ্কুন-পত্রিকা পাঠাইতে ভুলিবেন না" ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য হইয়া প্রস্থান করিল।

এক দিবস রাণী, মহালক্ষ্মীর মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইবার সময়ে, অনেক ভিখারী জমা হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, তাহারা শীতের দরুণ কষ্ট পাইতেছে। তিনি হুকুম করিলেন, সমস্ত ভিখারীদিগকে জমা করিয়া প্রত্যেককে এক-একখান তুলা-ভরা জামা, টুপি ও কম্বল দান করা হয়। রাণী ঠাকুরাণীর দয়াদ্রতা ও পরোপকার-বুদ্ধি নথের্খার সহিত যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। ঝাঁশিসৈন্যস্থিত আহত লোকদিগের ক্ষত-স্থানে যখন মলম-পটি লাগানো হইত, তখন তাহারা রাণী ঠাকুরাণীকে দেখিয়া নিজ কষ্ট আকার ভঙ্গীতে প্রকাশ করিত—তখন তিনি তাহাদিগের গায়ে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা করিতেন। এই সকল সদ্‌গুনপ্রযুক্ত প্রজারা তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত।

রাণী ঠাকুরাণী স্বীয় দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাহার যখন যাহা সাধ হইত তখনই তাহা মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। রাণী ১৮৫৭ অব্দের জুনমাসে ইংরাজ-দিগকে সাহায্য করেন, বহিঃশত্রু দমন করিয়া ঝাঁশি সংরক্ষণের উদ্যোগ করেন—এই সমস্ত বৃত্তান্ত ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণকে পত্রের দ্বারা জানাইবার চেষ্টা করেন—নিজ অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করিতে ইংলণ্ডে মোক্তিয়ার পাঠান এই সব কারণে

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ-সরকার কখনই অন্যায় করিবেন না—তাঁহার অধিকার তিনি ফিরিয়া পাইবেন—ইংরাজ সরকার ঝাঁশির গদিতে দামোদর রাওকেই পুনস্থাপন করিবেন। এই বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন এমন সময়, ঝাঁশির রাণী বিদ্রোহী, এইরূপ ভুল বুঝিয়া, ইংরাজ সেনাপতি সর-হিউ-রোজ প্রবল সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝাঁশিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং নিম্ন লিখিত শ্লোকের উক্তি অনুসারে নলিনী ও নলিনী-মধুমত্ত দ্বিরেফ উভয়ই একসঙ্গে গজ-কবলে পতিত হইল।

"রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাত
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালং
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোশগতে দ্বিরেফে,
হা হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার।"

এসেছিল গিয়েছে চলিয়া।

(অনুবাদ)

(As a twig trembles &.c. J. R. Lowell.)

অতি ক্ষীণ কচি শাখাটিতে
পাখী বসে, গান গাবে বলে'
শাখাটি সে কেঁপে ওঠে শুধু,
পাখী যাই উড়ে যায় চলে।

সেই মত স্মরণ আমার
কাঁপে আর উঠে চমকিয়া,—
আমি শুধু এই মাত্র জানি
সে, এসেছিল, গিয়েছে চলিয়া।

ক্ষণতরে একবার যদি
বায়ুদল শান্ত হয়ে থাকে,
সুবিশাল নভোনীল ছায়া
সরোবর বুকে ধরে' রাখে;
নিমেষের স্বরগের ছায়া
বুকে আমি ছিলাম ধরিয়া;—
আমি শুধু এই মাত্র জানি
সে এসেছিল, গিয়েছে চলিয়া।

আমাদের বসন্ত সহসা
কোথা হতে আসিয়া যেমন
ভরে' দেয় কুসুমে সৌরভে
শীত-মৃত বন উপবন;
তার সেই বসন্ত প্রণয়ে
সেই মত গেছিনু ভরিয়া;—
আমি শুধু এই মাত্র জানি
সে এসেছিল, গিয়েছে চলিয়া।

আমার এ কুটীরের দ্বারে
দাঁড়াইয়া ছিল যেন পরী।

চাবি চোখে মিলন হয়েছে
 সে কথাও সত্য মনে কবি।
ফিবিতেছে মাযারূপ তাবি
 ঐ যেন আঁখিবে ছবিয়া ;—
আমি শুধু এই মাত্র জানি
সে এসেছিল, গিয়েছে চলিয়া।

এ আমাব কক্ষখানি যবে
 হয়ে যাবে প্রায অন্ধকাব,
তৈলহীন জীবন বর্ত্তিকা
 মনে হবে নিবিল এবাব ;
তখন এ আঁখি দুটি মম
 একবাব উঠিবে জ্বলিয়া,
শেষবাব ভাবিব যখন,
 আসিয়া সে গিয়াছে চলিয়া

আলোচনা।

ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্ব্বিস্ পরীক্ষা।

হাউস্ অফ্ কমন্স্ সভাব অর্ডব-বুকে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে একই সময়ে সিবিল সর্বিস্ পবীক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে দাদাভাই নওরোজি কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মোশনের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণ ভাবতবাসার নিকট নিবেদন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে প্রচুর স্বাক্ষরসমেত বহুল আবেদনপত্র শ্রীযুক্ত দাদাভাই

নওরোজির যোগে পার্লামেণ্টে প্রেরণ করিলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

মোশনের বিজ্ঞাপন।

মিষ্টার নওরোজি,—সিবিল সর্বিস্ (ইণ্ডিয়া) (ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে সমকালীন প্রকাশ্য পরীক্ষা),—যে, এই সভার মতে, ব্রিটিশ প্রতাপের স্থায়িত্ব এবং ভারতবাসীর রাজভক্তি, রাজবিশ্বাস, সন্তোষ এবং কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্পের বহুল পরিমাণে বিস্তার করিতে হইলে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের অ্যাক্টের প্রতিজ্ঞা সকল, সিপাই বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র, দিল্লির দরবারে সম্রাজ্ঞী উপাধি ধারণ কালীন ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র, এবং মহামহিমান্বিতা রাজ্ঞী ও ভারতসম্রাজ্ঞীর পঞ্চাশৎবার্ষিক রাজ্যাভিষেক উৎসবকালে উক্ত ঘোষণাপত্রগুলির পুনঃপ্রতিশ্রুতি অনুসারে, রাষ্ট্রনীতির অন্যান্য সংস্কারসাধনের মধ্যে, ৩রা জুন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত যে রেজোল্যুশন্ গ্রাহ্য হইয়াছিল তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক :—

যে, এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় সিবিল্ সর্ব্বিস্ পদ প্রাপ্তির জন্য একমাত্র ইংলণ্ডে যে প্রকাশ্য পরীক্ষা সকল নির্দ্ধারিত ছিল এক্ষণ হইতে তাহা ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয়ত্রই সম্পাদিত হইতে থাকিবে—এই সকল পরীক্ষা উভয় দেশেই সমান প্রকৃতির হইবে, এবং যাঁহারা পরীক্ষা দিবেন তাঁহারা সকলেই যোগ্যতা অনুসারে এক তালিকায় শ্রেণীভুক্ত হইতে থাকিবেন।

মতের আশ্চর্য্য ঐক্য।

পাঠকদের স্মরণ আছে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বার্ষিক

নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্য" পত্রে আমাদের বান্ধব শ্রীমান্ যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সরলভাবে "অনুমান" করিয়া লইয়াছেন, যে, যাহাতে "গ্রন্থকারদের ভিক্ষার থলিতে কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগমেরও সম্ভাবনা হয়" আমাদের পঠিত প্রবন্ধের এমন গোপন উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। আমাদের "মাতৃভাষাবৎসলতার ঠাট" যে "অলীক" তাহাও তাঁহার সুতীক্ষ্ণ এবং উদার অনুমানশক্তির নিকট ধরা পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমান্ যোগিনীমোহনের প্রতি আমাদের একটি মাত্র বক্তব্য আছে ;—নানা স্বাভাবিক কারণে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ অন্ধ এবং পক্ষপাতবিশিষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহা "অলীক" এ কথা প্রকাশ করিয়া তিনি যে কেবল আমাদের প্রতি অন্যায় অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে ; সত্যের প্রতি যে সকল ভদ্রজনের স্বাভাবিক ভক্তি আছে তাঁহারা অন্যকে অকারণে এরূপ অপবাদ দিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত বোধ করেন।

মতের ঐক্য আমরা সকলেরই কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না, অতএব শ্রীমান্ যোগিনীমোহন আমাদের বিরুদ্ধবাদী হইলে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু প্রকৃত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি কোথাও আমাদের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করেন নাই। বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গালী জাতির ভাষা ; তাহা, যে, ভারতবর্ষের নানা বিভিন্ন জাতির ভাষা হইবে এ কথা আমরা বলি নাই। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ অথবা বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষা উঠিয়া গিয়া বাঙ্গলা শিক্ষা প্রচলিত হউক্ এমন কথারও আমরা কুত্রাপি আভাস দিই নাই, অতএব আমাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদচ্ছলে শ্রীমান্

যোগিনীমোহন ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের বিশেষ মত-বিরোধ নাই এবং তাঁহার উক্ত চিন্তাশীল সারগর্ভ রচনা "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও ছিল না।

ইংরাজি ভাষা শিক্ষা।

এই প্রসঙ্গে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের একটি বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। ভাষা শিক্ষা ও বিষয় শিক্ষা উভয়ই ছাত্রদের পক্ষে অত্যাবশ্যক;—কিন্তু বিদেশী ভাষা যথাকথঞ্চিৎ আয়ত্ত হইতে না হইতেই সেই ভাষাতেই যদি বিষয় শিক্ষা দিবার উপক্রম করা যায় তবে তাহাতে ভাষা শিক্ষা এবং বিষয়শিক্ষা উভয়েরই ব্যাঘাত হয়। না বুঝিয়া অনবরত মুখস্থ করিতে যে সময় ও শক্তির অপব্যয় হয় তাহাই রীতিমত ভাষাশিক্ষায় প্রয়োগ করিলে উক্ত শিক্ষা অনেক পরিমাণে সম্পূর্ণতা লাভ করে। যাহারা এককালে দুই হাতে দুই লাঠি লইয়া খেলে, তাহারা শিক্ষাকালে প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক হাতের অভ্যাস করিয়া পরে দুই হাত মিলাইয়া লয়। সেইরূপ, আমাদের মতে, অন্ততঃ এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত ভাষা এবং বিষয়কে স্বতন্ত্ররূপে আয়ত্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়কে একত্র মিলাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষা এবং পরীক্ষা দুই ভাষায় হইলে যাহা ইংরাজিতে শিক্ষা করি তাহা বাঙ্গলায়, এবং যাহা বাঙ্গলায় শিখি তাহা ইংরাজিতে পরখ করিয়া লওয়া যায়—নতুবা মুখস্থ বিদ্যার অন্তরালে যে সুগভীর শূন্যতা থাকিয়া যায় তাহার আবিষ্কার এবং সংশোধন করিবার কোন উপায় দেখা যায় না।

জাতীয় সাহিত্য।

আমরা "বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য" প্রবন্ধের নামকরণে ইংরাজি

"ন্যাশনাল" "শব্দের স্থলে "জাতীয়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষ-কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, অনুবাদটি আমাদের কৃত নহে; এই শব্দ বহুকাল হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যে ন্যাশনাল্ শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ভাষার পরিণতি সহকারে স্বাভাবিক নিয়মে অনেকগুলি শব্দের অর্থ বিস্তৃতি লাভ করে। "সাহিত্য" শব্দটি তাহার উদাহরণস্থল। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ও "সাহিত্য" শব্দটিকে ইংরাজি "লিটারেচর্" অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই যে, "লিটারেচর" শব্দের অর্থ যতদূর ব্যাপক, সাহিত্য শব্দের অর্থ ততদূর পৌঁছে না। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে "সাহিত্য" শব্দের অর্থ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "মনুষ্যকৃত শ্লোকময় গ্রন্থবিশেষঃ। স তু ভট্টি রঘু কুমারসম্ভব মাঘ ভারবি মেঘদূত বিদগ্ধমুখমণ্ডন শান্তিশতক প্রভৃতয়ঃ। এমন কি, রামায়ণ মহাভারতও সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হয় নাই, তাহা ইতিহাসরূপে খ্যাত ছিল। এই জন্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "সাহিত্য" শব্দের পরিবর্ত্তে "বাঙ্ময়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে ২৭শ শ্লোকে আছে

লিপেযথাবদ্গ্রহণেন বাঙ্ময়ং
নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ।

অর্থাৎ রঘু লিপিরূপ নদীপথ দিয়া বাঙ্ময়রূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন।

"জাতি" শব্দ এবং "নেশন্" শব্দ উভয়েরই মূল ধাতুগত অর্থ এক। জন্মগত ঐক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য উভয় শব্দের উৎপত্তি। আমরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণকে জন্মগত ঐক্যবশতঃ জাতি

বলি আবার বাঙ্গালী প্রভৃতি প্রজাবর্গকেও সেই কারণেই জাতি বলিয়া থাকি। জাতি শব্দের শোষোক্ত প্রয়োগের স্থলে ইংরাজিতে "নেশন্" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙ্গালী জাতি, = বেঙ্গলি নেশন্। এরূপ স্থলে "ন্যাশনাল্" শব্দের প্রতিশব্দরূপে "জাতীয়" শব্দ ব্যবহার করাতে বিশেষ দোষের কারণ দেখা যায় না। আমরাও তাহাই করিয়াছি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় অকস্মাৎ অকারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে আমরা "জাতীয় সাহিত্য" শব্দে "ভর্ণ্যাক্যুলর্ লিট্রেচর্" শব্দের অপূর্ব্ব তর্জ্জমা করিয়াছি! বিনীতভাবে জানাইতেছি আমরা এমন কাজ করি নাই। সাহিত্য যে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত আমোদ বা শিক্ষাসাধক নহে, তাহা যে সমস্ত জাতির "জাতীয়" বন্ধন দৃঢ়তর করে, বাঙ্গলা সাহিত্য, যে, বাঙ্গালী জাতির ভূত ভবিষ্যৎকে এক সজীব সচেতন নাড়ি-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বৃহত্তর এবং ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিবে—আমাদের প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের বিশেষরূপ অবতারণা ছিল বলিয়া, আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে, ব্যক্তিগত রসসম্ভোগের হিসাবে নহে, পরন্তু জাতীয় উপযোগিতার হিসাবে আলোচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দিয়াছিলাম। সভাস্থলে বক্তৃতা পাঠ করিতে হইলে শ্রোতৃসাধারণের দ্রুত অবগতির জন্য বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে—আমরাও বক্তৃতার বিষয় যথোচিত বিস্তৃত করিয়া বলিয়া কেবল সম্পাদক মহাশয়ের নিন্দাভাজন হইলাম কিন্তু তথাপিও তিনি আমাদের বক্তব্য বিষয়টিকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ইহাতে আমাদের দ্বিগুণ দুঃখ রহিয়া গেল।

চকোর।

১

নন্দন-মন্দার মত অনিন্দ্য-সুন্দর,
যুবতী-উরস মত সরস-কোমল,
নবোঢ়ার লাজ মত মৃদুল-মধুর,
শান্তির হৃদয় মত স্নিগ্ধ-সুবিপুল,
কুসুম-উত্থিত যথা পরিমলোচ্ছ্বাস
বিধু-সুধাহৃদি হতে তথা উৎসারিত,
জগৎ-ডুবানো এই আনন্দ-প্লাবনে,
হে বিহঙ্গ, কি অনন্ত ত্রিদিব তৃষায়
থাক ডুবি নিশি নিশি,—রূপের সাগরে
আকাঙ্ক্ষায় চিত্তহারা প্রেমিক যেমন,
কিম্বা কল্পনার মাঝে কবির প্রয়াস,
কিম্বা নিস্তরঙ্গ জ্ঞান-আলোক-সিন্ধুতে
ধ্যানমগ্ন রুদ্ধবৃত্তি যোগীর হৃদয় ?
কি অনন্ত প্রাণ লভ এ অমৃত পানে,
কি স্বরগ-শক্তি পশে নয়নে তোমার,
কিবা রাজ্য অতীন্দ্রিয়, অমরা-বিভাস,
ভাসে তাহে, সশরীর কল্পনা-মূরতি ?
শশীর দিবসে এই, কিবা কার্য্য তব ?
কিবা সূক্ষ্মতম চিন্তা এ রবি-নিশায় ?
শশীর এ জাগরণে কি মরত-শোভা ?
হের কোন্ স্বর্গ এই রবির স্বপনে ?

২

স্বরগ-বিহঙ্গ তুমি, আলো কর পান,—
মিশানো শোণিতে তব বাসনা-কালিমা ?
পীড়ে কি চেতনা বেড়ি জড়ের নিগড় ?
আনন্দের চারু গৃহ হৃদয়-মন্দিরে,
জীবনে মরণ মত, আছে প্রতিষ্ঠিত
বিষাদের মৃত্যুময়ী নিশীথ-প্রতিমা ?
বিশ্বের কুটিল-গ্রন্থি-ছেদন-প্রয়াসী
মধ্যাহ্ন আলোক-বৎ বুদ্ধির সু-ধার
আছে কি কোষিত হয়ে গোধূলি-সন্দেহে,—
আলো অন্ধকারে বোনা তন্দ্রা-আচ্ছাদনে
অর্দ্ধ নিমীলিত, মুগ্ধ, অলস আঁখিতে
স্ফুরণেচ্ছু লুপ্তপ্রভা কিরণের প্রায় ?
না, না,—হেন কথা কভু মনে নাহি লয়,—
আলোকের শিশু তুমি, অমৃতে পালিত।

৩

ধরণীর স্তন্যপায়ী, মাটিতে গঠিত ,
জড়-বিজড়িত-আত্মা, অস্ফুট-চেতন,
দুর্ব্বল মানব মাগে, গর্ব্ব পরিহরি,
বিশ্বতত্ত্ব শিখিবারে তোমার নিকটে।
অস্বচ্ছ-কঠোর তার মাটির হৃদয় ;
জ্যোতির্ম্ময় ঊর্ম্মিমালা নাচে চারি ভিতে,
আঘাতি তাহার মূলে, লভিতে প্রবেশ,
কিন্তু এসে ফিরে যায়, হয়ে প্রতিহত,
করিমাত্র স্নিগ্ধ কান্তি পরশ-আবিল।

বলে দাও,—কিসে হয় স্ফটিক-বিশদ
হেন মানবের চিত্ত ; যাহে সত্য-ভাতি
পশি প্রতি অণু-কণে করে উদ্ভাসিত
ঘন-অন্ধকার তার মানস-কন্দর,—
নিশাময় আকাশের মসীর হৃদয়
উদ্ভাসে যেমতি ওই রজত চন্দ্রিমা !
বলে দাও,—ডাকে নর তীব্র আর্ত্তনাদে !
শত-অমা-ঘনীভূত নিবিড় তিমিরে
প্রাণপণে মেলি আঁখি (চাপে যাহে গুরু
সে নিশীথ-ভার,দৃঢ় পাষাণের মত,
অবরোধি কাতরতা-উষ্ণপ্রস্রবণ)
বিফলে দেখিতে চাহে আলো-উষাকণা,
গুমরি অন্তরে ঘোর ভূ-কম্প-বেদনে !
বলে দাও !—আলোধারা সে আঁধারে ঢালি !
বলে দাও !—ঢালি সুধা সে নিগূঢ় দাহে !

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

গ্রন্থ সমালোচনা।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

লেখক এই গ্রন্থে স্বহস্তে একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে চড়িয়া বসিয়াছেন, এবং বঙ্কিমকে ও সেই সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের আর কতকগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাল ছেলেকে হাস্য-মুখে ছোট বড় পারিতোষিক বিতরণ করিয়া লেখকসাধারণকে পরম আপ্যায়িত এবং উৎসাহিত করিয়াছেন। লেখক স্পষ্টই

বলিয়াছেন তিনি কাহাকেও খাতির করিয়া কথা কহেন নাই। ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন প্রাণের অভাব দেখিতে পাই। * * স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যখন আমাদের এই মত, তখন অন্য (?) পরে কা কথা।"

শুনিয়া ভয়ে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং এত বড় দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপের নিকট সহজেই অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তথাপি কর্ত্তব্য বোধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। বর্ত্তমান গ্রন্থকার পাঠকদিগকে নিতান্ত যেন ঘরের ছেলে অথবা স্কুলের ছাত্রের মত দেখিয়া থাকেন। এক স্থলে শুদ্ধমাত্র বঙ্কিমের "বন্দে মাতরং" গানটি তুলিয়া দিয়া লেখক প্রবীণ হেড্‌ মাষ্টারের মত লিখিতেছেন "বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিলে?" তাহার পরেই প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ দৃশ্যটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়া লেখক নবীন রসিক পুরুষের মত বলিতেছেন "কবিত্ব কাহাকে বলে দেখিলে? আমরি মরি! কি সুররে!" পর পৃষ্ঠায় পুনশ্চ অতি পরিচিত কুটুম্বের মত পাঠকদের গায়ে পড়িয়া বলিতেছেন "আরও শুনিবে? তবে শুন।" এক স্থলে দামোদর বাবুর রচিত কপালকুণ্ডলার অনুবৃত্তিগ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লেখক নথ-পরিহিতা প্রৌঢ়ার মত বলিতেছেন—"সে মৃণ্ময়ী আবার পুনর্জ্জীবিতা হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল। পোড়াকপাল আর কি!" ভাষার এই সকল অশিষ্ট ভঙ্গিমা ভদ্র সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসনযোগ্য।

গ্রন্থকার, বঙ্কিমরচিত উপন্যাসের পাত্রগুলির মধ্যে কে কতটা পরিমাণে হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই অতি সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা ও প্রশংসা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। এমন কি,

সেই ওজন অনুসারে মডেল ভগিনীকেও চন্দ্রশেখরের সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য এই যে, এ কথা আমাদের সমালোচকদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে, সাহিত্য সমালোচনা কালে মনুসংহিতা আদর্শ নহে মানবসংহিতাই আদর্শ।

কৃষ্ণবিহারী সেন।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের সোদরপ্রতিম পরমাত্মীয় বন্ধু কৃষ্ণবিহারী সেনের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার বান্ধবেরা সকলেই অবগত আছেন অবিচলিত ধৈর্য্যে এবং অগাধ পাণ্ডিত্যে তিনি যেমন প্রবীণ ছিলেন তাঁহার হৃদয়টি তেমনি বালকের মত স্বচ্ছ সরল এবং সদাপ্রফুল্ল ছিল; সংসারের রোগ শোক দুশ্চিন্তা কিছুতেই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার ন্যায় বহু অধ্যয়নশীল উদারবুদ্ধি সহৃদয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই বন্ধুবৎসল স্বদেশহিতৈষী ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সাধনার পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই মনস্বী পুরুষের সহায়তায় বঙ্গভাষা বিশেষ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে আশা পূর্ণ না করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত কবিতাটি আমরা শোকাতুর ভক্তবন্ধুদত্ত পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপে সেই মৃত মহাত্মার স্মরণার্থ উৎসর্গ করিলাম।

সখা ওহে কে বলিল নাহি তুমি আর!
রোগতাপজর্জ্জরিত ফেলি দেহভার

অজর অমররূপে হয়ে জ্যোতির্ম্ময়
নবাকাশে নববেশে হয়েছ উদয়।
সে চিত্র তুলিতে নারে চিত্রকর বটে,
ওঠে না সে দেহছায়া ভানুচিত্রপটে,
কিন্তু সেই সূক্ষ্মছবি চিন্ময় কায়া
চিদাকাশে সদা ভাসে—দিব্য তার ছায়া।
সেই তব চিরস্ফুর সুমধুর হাস
যন্ত্রণারো মাঝে যাহা হইত বিকাশ;
অপ্রতিম ধৈর্য্য তব—আত্মার সে বল—
রোগ তাপ মাঝে যাহা থাকিত অটল;
অনন্ত সে জ্ঞানস্পৃহা—ভেদিয়া আকাশ
সুদূর নক্ষত্রমাঝে হত যা প্রকাশ;
একনিষ্ঠ প্রেম সেই একপত্নীব্রত
সখাসনে যার কথা হইত নিয়ত;
এই সব সূক্ষ্মতত্ত্ব মিলি একসাথে
জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম তনু রচিয়া তাহাতে
কোন্ দিব্য পথে কোন্ সমুন্নত লোকে
গেছ চলি—এড়াইয়া রোগ-তাপ-শোকে।

সংশোধন।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বসন্ত রোগ।

গত মাসের সাধনায়, "বসন্ত-রোগ" নামক প্রবন্ধে, আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, বসন্ত-রোগের কোন উল্লেখ কিম্বা বসন্ত-

রোগের কোন পারিভাষিক শব্দ আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, বসন্ত-রোগের পারিভাষিক নাম "মসূরিকা"। এক্ষণে যেরূপ, "পান-বসন্ত" ও "ইচ্ছা-বসন্ত",—বসন্ত-রোগের এই দুই মুখ্য ভেদ সাধারণের মধ্যে পরিচিত, আয়ুর্ব্বেদে এরূপ কোন ভেদ দেখা যায় না। যে ধাতুবিশেষ অবলম্বন করিয়া মসূরিকা উৎপন্ন হয় তদনুসারে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ভেদ নির্ণীত হইয়াছে। আমরা যাহাকে "পান-বসন্ত" বলি, আয়ুর্ব্বেদে উহা রসধাতুগত মসূরিকা। এই প্রকার, রক্তগত, মাংসগত, মেদোগত, অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকার বর্ণনা আছে। ইহার মধ্যে "ইচ্ছা-বসন্ত" কোন্‌টী, তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না।

মসূরিকোৎপাদন ক্রিয়া—যাহাকে চলিত ভাষায় "টীকা-দেওয়া" বলে—তৎসম্বন্ধে, ধন্বন্তরিকৃত শাক্তেয় গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"সা তু গোস্তনজ নরগাত্রজ মসূরিকাপূয়েন ভবতি—ধেনোস্তন্যমসূরিকা নরাণাঞ্চ মসূরিকা। তজ্জলং বাহুমূলাচ্চ শস্ত্রান্তেন গৃহীতবান্। বাহুমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ। তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকজ্বর-সম্ভবং"।

অতএব দেখা যাইতেছে, গোবসন্ত ও নরবসন্ত রোগকে "গোস্তনজ" ও "নর-গাত্রজ" মসূরিকা বলা হইত। এবং এই উভয় প্রকার বসন্তের পূয-রস লইয়া টীকা দেওয়ার রীতি ছিল। তবে, "গোস্তনজ" টীকা—যাহাকে ইংরাজিতে "হ্ব্যাক্‌সিনেশন" বলে—এবং "নর-গাত্রজ" টীকা যাহাকে "ইন্-অক্যুলেশন" বলে—এই উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারিতার কিরূপ তারতম্য তদ্বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না।

"আনাড়ী" শব্দ।

বৈশাখ মাসের "সাধনা"য় "মারাঠী ও বাঙ্গলা" নামক প্রবন্ধে, মহারাষ্ট্রীয় "অড়ানী" শব্দ "আড়" শব্দ হইতে উৎপন্ন, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ব্যাকরণ পাঠ করিয়া জানিলাম, "অড়ানী" শব্দ অজ্ঞানী শব্দ হইতে উৎপন্ন। এবং "অড়ানী" শব্দ বিকল্পে "অনাড়"ও হয়।

সাধনা।

ভদ্রতার আদর্শ।

(পাঞ্চভৌতিক সভা)

স্রোতস্বিনী কহিল, দেখ, বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, তোমরা ব্যোমকে একটু ভদ্রবেশ পরিয়া আসিতে বলিয়ো।

শুনিয়া আমরা সকলে হাসিতে লাগিলাম। দীপ্তি একটু রাগ করিয়া বলিল—না, হাসিবার কথা নয়; তোমরা ব্যোমকে সাবধান করিয়া দাও না বলিয়া সে ভদ্রসমাজে এমন উন্মাদের মত সাজ করিয়া আসে। এ সকল বিষয়ে একটু সামাজিক শাসন থাকা দরকার।

সমীরণ কথাটাকে ফলাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল—কেন দরকার?

দীপ্তি কহিল—কাব্যরাজ্যে কবির শাসন যেমন কঠিন; কবি যেমন ছন্দের কোন শৈথিল্য, মিলের কোন ত্রুটি, শব্দের কোন রূঢ়তা মার্জ্জনা করিতে চাহে না,—আমাদের আচার ব্যবহার বসন ভূষণ সম্বন্ধে সমাজ-পুরুষের শাসন তেমনি কঠিন হওয়া উচিত, নতুবা সমগ্র সমাজের ছন্দ এবং সৌন্দর্য্য কথনই রক্ষা হইতে পারে না।

ক্ষিতি কহিল, ব্যোম বেচারা যদি মানুষ না হইয়া শব্দ হইত, তাহা হইলে এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি ভট্টিকাব্যেও তাহার

স্থান হইত না ; নিঃসন্দেহ তাহাকে মুগ্ধবোধের সূত্র অবলম্বন করিয়া বাস করিতে হইত।

আমি কহিলাম, সমাজকে সুন্দর, সুশিষ্ট, সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য সে কথা মানি কিন্তু অন্যমনস্ক ব্যোম বেচারা যখন সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া দীর্ঘ পদবিক্ষেপে চলিয়া যায় তখন তাহাকে মন্দ লাগে না।

দীপ্তি কহিল—ভাল কাপড় পরিলে তাহাকে আরও ভাল লাগিত।

ক্ষিতি কহিল—সত্য বল দেখি, ভাল কাপড় পরিলে ব্যোমকে কি ভাল দেখাইত? হাতীর যদি ঠিক ময়ূরের মত পেখম্ হয় তাহা হইলে কি তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়? আবার ময়ূরের পক্ষেও হাতীর লেজ শোভা পায় না—তেমনি আমাদের ব্যোমকে সমীরের পোষাকে মানায় না, আবার সমীর যদি ব্যোমের পোযাক পরিয়া আসে উহাকে ঘরে ঢুকিতে দেওয়া যায় না।

সমীর কহিল, আসল কথা, বেশভূষা আচার ব্যবহারের স্খলন যেখানে শৈথিল্য, অজ্ঞতা ও জড়ত্ব সূচনা করে সেইখানেই তাহা কদর্য্য দেখিতে হয়। সেই জন্য আমাদের বাঙ্গালীসমাজ এমন শ্রীবিহীন। লক্ষ্মীছাড়া যেমন সমাজছাড়া তেমনি বাঙ্গালীসমাজ যেন পৃথ্বীসমাজের বাহিরে। হিন্দুস্থানীর সেলামের মত বাঙ্গালীর কোন সাধারণ অভিবাদন নাই। তাহার কারণ, বাঙ্গালী কেবল ঘরের ছেলে, কেবল গ্রামের লোক; সে কেবল আপনার গৃহসম্পর্ক এবং গ্রামসম্পর্ক জানে,—সাধারণ পৃথিবীর সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই—এ জন্য অপরিচিত সমাজে সে কোন শিষ্টাচারের নিয়ম খুঁজিয়া পায় না। একজন হিন্দুস্থানী ইংরাজকেই হোক্ আর চীনেম্যান্‌কেই হোক্ ভদ্রতাস্থলে সকলকেই সেলাম

করিতে পারে—আমরা সেস্থলে নমস্কার করিতেও পারি না, সেলাম করিতেও পারি না, আমরা সেখানে বর্ব্বর। বাঙ্গালী স্ত্রীলোক যথেষ্ট আবৃত নহে এবং সর্ব্বদাই অসম্বৃত—তাহার কারণ,সে ঘরেই আছে; এই জন্য ভাসুর শ্বশুর সম্পর্কীয় গৃহপ্রচলিত যে সকল কৃত্রিম লজ্জা তাহা তাহার প্রচুর পরিমাণেই আছে কিন্তু সাধারণ ভদ্রসমাজসঙ্গত লজ্জা সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ শৈথিল্য দেখা যায়। গায়ে কাপড় রাখা বা না রাখার বিষয়ে বাঙ্গালী পুরুষদেরও অপর্য্যাপ্ত ঔদাসীন্য; চিরকাল অধিকাংশ সময় আত্মীয়সমাজে বিচরণ করিয়া এসম্বন্ধে একটা অবহেলা তাহার মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অতএব বাঙ্গালীর বেশভূষা চালচলনের অভাবে একটা অপরিমিত আলস্য, শৈথিল্য, স্বেচ্ছাচার ও আত্মসম্মানের অভাব প্রকাশ পায় সুতরাং তাহা যে বিশুদ্ধ বর্ব্বরতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমি কহিলাম—কিন্তু সে জন্য আমরা লজ্জিত নহি। যেমন রোগবিশেষে মানুষ যাহা খায় তাহাই শরীরের মধ্যে শর্করা হইয়া উঠে তেমনি আমাদের দেশের ভাল মন্দ সমস্তই আশ্চর্য্য মানসিক বিকার বশতঃ কেবল অতিমিষ্ট অহঙ্কারের বিষয়েই পরিণত হইতেছে। আমরা বলিয়া থাকি আমাদের সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, অশনবসনগত সভ্যতা নহে, সেই জন্যই এই সকল জড় বিষয়ে আমাদের এত অনাসক্তি।

সমীর কহিল, উচ্চতম বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য স্থির রাখাতে নিম্নতন বিষয়ে যাঁহাদের বিস্মৃতি ও ঔদাসীন্য জন্মে তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দার কথা কাহারও মনেও আসে না। সকল সভ্যসমাজেই এরূপ এক সম্প্রদায়ের লোক সমাজের বিরল উচ্চশিখরে বাস করিয়া থাকেন। অতীত ভারতবর্ষে অধ্যয়ন-অধ্যাপনশীল ব্রাহ্মণ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন;—তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় সাজসজ্জা ও কাজ-

কর্ম্মে নিরত থাকিবেন এমন কেহ আশা করিত না। য়ুরোপেও সে সম্প্রদায়ের লোক ছিল এবং এখনও আছে। মধ্যযুগের আচার্য্যদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্ আধুনিক য়ুরোপেও ন্যুটনের মত লোক যদি নিতান্ত হাল্ ফেশানের সান্ধ্যবেশ না পরিয়াও নিমন্ত্রণে যান এবং লৌকিকতার সমস্ত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করেন তথাপি সমাজ তাঁহাকে শাসন করে না, উপহাস করিতেও সাহস করে না। সৰ্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই স্বল্পসংখ্যক মহাত্মা লোক সমাজের মধ্যে থাকিয়াও সমাজের বাহিরে থাকেন, নতুবা তাঁহারা কাজ করিতে পারেন না এবং সমাজও তাঁহাদের নিকট হইতে সামাজিকতার ক্ষুদ্র শুল্কগুলি আদায় করিতে নিরস্ত থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, বাঙ্গলা দেশে, কেবল কতকগুলি লোক নহে, আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই সকলপ্রকার স্বভাববৈচিত্র্য ভুলিয়া সেই সমাজাতীত আধ্যাত্মিক শিখরে অবহেলে চড়িয়া বসিয়া আছি। আমরা ঢিলা কাপড় এবং অত্যন্ত ঢিলা আদবকায়দা লইয়া দিব্য আরামে ছুটি ভোগ করিতেছি,—এখন আমরা যেমন করিয়াই থাকি আর যেমন করিয়াই চলি তাহাতে কাহারও সমালোচনা করিবার কোন অধিকার নাই—কারণ আমরা উত্তম মধ্যম অধম সকলেই খাটো ধুতি ও ময়লা চাদর পরিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লয় পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি।

হেনকালে ব্যোম তাহার বৃহৎ লগুড়খানি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহার বেশ অন্যদিনের অপেক্ষাও অদ্ভুত; তাহার কারণ, আজ ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ি বলিয়াই তাহার প্রাত্যহিক বেশের উপরে বিশেষ করিয়া একখানা অনির্দ্দিষ্ট-আকৃতি চাপকান গোছের পদার্থ চাপাইয়া আসিয়াছে;—তাহার আশপাশ হইতে ভিতরকার অসঙ্গত কাপড়গুলার প্রান্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে;—দেখিয়া

আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল এবং দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর মনে যথেষ্ট অবজ্ঞার উদয় হইল।

ব্যোম জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি বিষয়ে আলাপ হইতেছে?

সমীর আমাদের আলোচনার কিয়দংশ সংক্ষেপে বলিয়া কহিল, আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই বৈরাগ্যের "ভেক" ধারণ করিয়াছি।

ব্যোম কহিল, বৈরাগ্য ব্যতীত কোন বৃহৎ কর্ম্ম হইতেই পারে না। আলোকের সহিত যেমন ছায়া, কর্ম্মের সহিত তেমনি বৈরাগ্য নিয়ত সংযুক্ত হইয়া আছে। যাহার যে পরিমাণে বৈরাগ্যে অধিকার পৃথিবীতে সে সেই পরিমাণে কাজ করিতে পারে।

ক্ষিতি কহিল, সেইজন্য পৃথিবীসুদ্ধ লোক যখন সুখের প্রত্যাশায় সহস্র চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল তখন বৈরাগী ডারুয়িন্ সংসারের সহস্র চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রমাণ করিতেছিলেন, যে, মানুষের আদিপুরুষ বানর ছিল। এই সমাচারটি আহরণ করিতে ডারুয়িনকে অনেক বৈরাগ্যসাধন করিতে হইয়াছিল।

ব্যোম কহিল, বহুতর আসক্তি হইতে গারিবাল্‌ডি যদি আপনাকে স্বাধীন করিতে না পারিতেন তবে ইটালীকেও তিনি স্বাধীন করিতে পারিতেন না। যে সকল জাতি কর্ম্মিষ্ঠ জাতি তাহারাই যথার্থ বৈরাগ্য জানে। যাহারা জ্ঞান লাভের জন্য জীবন ও জীবনের সমস্ত আরাম তুচ্ছ করিয়া মেরুপ্রদেশের হিমশীতল মৃত্যুশালার তুষাররুদ্ধ কঠিন দ্বারদেশে বারম্বার আঘাত করিতে ধাবিত হইতেছে,—যাহারা ধর্ম্মবিতরণের জন্য নরমাংসভূক্ রাক্ষসের দেশে চিরনির্ব্বাসন বহন করিতেছে,—যাহারা মাতৃভূমির আহ্বানে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই ধনজনযৌবনের সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুঃসহ ক্লেশ এবং অতি নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে

ঝাঁপ দিয়া পড়ে তাহারাই জানে যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে। আর আমাদের এই কর্ম্মহীন শ্রীহীন নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীব বৈরাগ্য কেবল অধঃপতিত জাতির মূর্চ্ছাবস্থামাত্র—উহা জড়ত্ব, উহা অহঙ্কারের বিষয় নহে।

ক্ষিতি কহিল, আমাদের এই মূর্চ্ছাবস্থাকে আমরা আধ্যাত্মিক "দশা" পাওয়ার অবস্থা মনে করিয়া নিজের প্রতি নিজে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছি।

ব্যোম কহিল—কর্ম্মীকে কর্ম্মের কঠিন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেই জন্যই সে আপন কর্ম্মের নিয়মপালন উপলক্ষ্যে সমাজের অনেক ছোট কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিতে পারে—কিন্তু অকর্ম্মণ্যের সে অধিকার থাকিতে পারে না। যে লোক তাড়াতাড়ি আপিসে বাহির হইতেছে তাহার নিকটে সমাজ সুদীর্ঘ সুসম্পূর্ণ শিষ্টালাপ প্রত্যাশা করে না। ইংরাজ মালী যখন গায়ের কোর্ত্তা খুলিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া বাগানের কাজ করে তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিজাতবংশীয়া প্রভুমহিলার লজ্জা পাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা যখন কোন কাজ নাই কর্ম্ম নাই, দীর্ঘ দিন রাজপথপার্শ্বে নিজের গৃহদ্বারপ্রান্তে স্থূল বর্ত্তুল উদর উদ্ঘাটিত করিয়া হাঁটুর উপর কাপড় গুটাইয়া নির্ব্বোধের মত তামাক টানি, তখন্ বিশ্বজগতের সম্মুখে কোন্ মহৎ বৈরাগ্যের কোন্ উন্নত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া এই কুশ্রী বর্ব্বরতা প্রকাশ করিয়া থাকি! যে বৈরাগ্যের সঙ্গে কোন মহত্তর সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত নাই তাহা অসভ্যতার নামান্তর মাত্র।

ব্যোমের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া স্রোতস্বিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমরা সকল ভদ্রলোকেই যতদিন না আপন ভদ্রতা রক্ষার কর্ত্তব্য সর্ব্বদা মনে

রাখিয়া আপনাদিগকে বেশে ব্যবহারে বাসস্থানে সর্ব্বতোভাবে ভদ্র করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিব ততদিন আমরা আত্মসম্মান লাভ করিব না এবং পরের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইব না। আমরা নিজের মূল্য নিজে অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছি।

ক্ষিতি কহিল, সে মূল্য বাড়াইতে হইলে এদিকে বেতন বৃদ্ধি করিতে হয়, সেটা প্রভুদের হাতে।

দীপ্তি কহিল, বেতন বৃদ্ধি নহে চেতন বৃদ্ধির আবশ্যক। আমাদের দেশের ধনীরাও যে অশোভনভাবে থাকে সেটা কেবল জড়তা এবং মূঢ়তাবশতঃ, অর্থের অভাবে নহে। যাহার টাকা আছে সে মনে করে জুড়ি গাড়ি না হইলে তাহার ঐশ্বর্য্য প্রমাণ হয় না, কিন্তু তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, তাহা ভদ্রলোকের গোশালারও অযোগ্য। অহঙ্কারের পক্ষে যে আয়োজনের আবশ্যক তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে কিন্তু আত্মসম্মানের জন্য, স্বাস্থ্য শোভার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার বেলায় আমাদের টাকা কুলায় না। আমাদের মেয়েরা এ কথা মনেও করে না, যে, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য যতটুকু অলঙ্কার অবেশ্যক তাহার অধিক পরিয়া ধনগর্ব্ব প্রকাশ করিতে যাওয়া ইতরজনোচিত অভদ্রতা,—এবং সেই অহঙ্কার তৃপ্তির জন্য টাকার অভাব হয় না, কিন্তু প্রাঙ্গণপূর্ণ আবর্জ্জনা এবং শয়নগৃহভিত্তির তৈলকজ্জলময় মলিনতা মোচনের জন্য তাহাদের কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। টাকার অভাব নহে, আমাদের দেশে যথার্থ ভদ্রতার আদর্শ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্রোতস্বিনী কহিল - তাহার প্রধান কারণ, আমরা অলস। টাকা থাকিলেই বড়মানুষী করা যায়, টাকা না থাকিলেও ধার করিয়া নবাবী করা চলে, কিন্তু ভদ্র হইতে গেলে আলস্য অবহেলা

বিসর্জ্জন করিতে হয়--সর্ব্বদা আপনাকে উন্নত সামাজিক আদর্শের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হয়, নিয়ম স্বীকার করিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে হয়।

ক্ষিতি কহিল, কিন্তু আমরা মনে করি আমরা স্বভাবের শিশু—অতএব অত্যন্ত সরল!—ধূলায় কাদায় নগ্নতায়, সর্ব্বপ্রকার নিয়মহীনতায় আমাদের কোন লজ্জা নাই;—আমাদের সকলই অকৃত্রিম এবং সকলই আধ্যাত্মিক!

মেয়েলি ব্রত।

(৫)

মঙ্গলবার বা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। বৈষ্ণবেতিহাসলেখক কবি বৃন্দাবন দাস বিরচিত "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থে লিখিত আছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে হরিভক্তির নামগন্ধও ছিল না, সমগ্র জনসমাজ কেবল কর্ম্মকাণ্ডের কোলাহলে নিমগ্ন ছিল; মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও গীত শ্রবণ এবং বিষহরী অর্থাৎ মনসাদেবীর পূজাকেই লোকে একমাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম জ্ঞান করিত। * ভয় এবং স্বার্থ এই দুইটী বৃত্তিই সাধা-

---

* "কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পাতুলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥"
শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড॥

রণতঃ মানুষকে দেবপূজায় প্রবৃত্ত করে, ইহাই লৌকিক ধর্ম্মের মূল। সর্পভয় নিবারণের জন্য বিষহরী পূজা এবং পারিবারিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলকামনায় মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা আমাদের দেশে অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। প্রতি পল্লীতে এইরূপে আরও কত গ্রাম্য-দেবতার আবির্ভাব* হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

দুঃখদুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবীই মঙ্গলচণ্ডী। মঙ্গলবার ইহাঁর পূজার প্রশস্ত সময়। মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবার সংকল্প করিয়া যে ব্রত গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম "মঙ্গলবারের ব্রত"। প্রতি মঙ্গলবারে, অসমর্থ পক্ষে মাসের যে কোন একটী মঙ্গলবারে এই ব্রত করিলে তাহাকে "বারমেসে মঙ্গলবার ব্রত" বলে। এতদ্ভিন্ন ষাণ্মাসিক ও ত্রৈমাসিক ব্রত আছে। আমরা অদ্য "বারমেসে" ব্রতসম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কুমারী সধবা বিধবা এবং বালিকা বা বৃদ্ধা, যে কোন স্ত্রীলোক এই ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। কখন কখন পুরুষগণও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রতের অনুষ্ঠানপ্রণালী এইরূপ,—

মঙ্গলবারে পুরোহিত আসিয়া যথাবিধি মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবেন। পূজার উপকরণ ধূপ দীপ পুষ্প চন্দন আতপতণ্ডুলের

* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে ওলাউঠা পীড়ায় অতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়ায় "দিদি ঠাকুরাণী" নামে এক দেবী আবির্ভূত হইয়াছেন। সিন্দূরমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড মাত্র ইহাঁর স্বরূপাবগ্রহ। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া ইনি পূজা আদায় করিয়া থাকেন। যে গ্রামে ওলাউঠা আরম্ভ হয়, সেখানে ইহাঁর প্রভাব অপ্রতিহত। ইতর জাতীয় লোকেরাই "দিদি ঠাকুরাণীর" পূজক ও পাণ্ডা।

নৈবেদ্য ও কয়েকটী সুপারি। সুতরাং পুরোহিত মহাশয়ের প্রাপ্য যৎসামান্য। যৎসামান্য হইলেও বৎসরের মধ্যে অনেকবার তিনি ইহা লাভ করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন একটী 'অর্ঘ্য' দিতে হয়। ৮টী আতপ চাউল নখ দিয়া খুঁটিয়া লইয়া ৮ গাছি দুর্ব্বার সহিত কার্পাসসূত্র দ্বারা বাঁধিয়া 'অর্ঘ্য' প্রস্তুত করিতে হয়। ব্রতচারিণীর নামে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সংকল্প করিবেন, সংকল্পের সময় আর একটি সুপারি আবশ্যক। পূজার পূর্ব্বে ব্রতচারিণী স্নান করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজাস্থলে উপবেশন করিবেন, এবং পূজা সমাপ্ত হইলে হস্তে একটী সুপারি গ্রহণ করিয়া নিজে ব্রতকথা বলিবেন ও শুনিবেন। নিজে না জানিলে অন্য কোন স্ত্রীলোকের মুখে কথা শুনিতে হয়। কথা শোনা শেষ না হইলে আহার করিতে নাই। এই দিন একবার মাত্র আহারের নিয়ম। এই ব্রত উদ্‌যাপনের কোন নিয়ম নাই।

এই ব্রতটীর তিনপ্রকার কথা প্রচলিত আছে। তিনটী কথাই একে একে শুনিতে হয়। যথা—

প্রথম কথা।

"নমঃ বন্ধু নমঃবন্ধু নমঃ বন্ধু নমঃ নারায়ণী।
তারিণী ভৈরবী মায়ের সিদ্ধের যোগিনী॥
সংসারের সার মায়ের ঈশের ঝিয়ারী।
ভক্তকে বুঝতে মা হলেন দিগম্বরী॥
হনি হনি দৈত্য মারি রুধির থাপর ধরি।
চৌষট্টি যোগিনী নিয়ে নাচেন মা মহেশ্বরী॥
এইত সয়ালের (১) কথা শোন মুনিজনে।
মঙ্গলচণ্ডীর কথা রটিল ভুবনে॥

উজানী নগরে সাধু নামে ধনপতি।
লহনা খুল্লনা তার দুইটী যুবতী ॥
প্রথমে লহনা নারী নিজের জুহিতে।
ছাগল রাখেন খুল্লনা বিধি বিড়ম্বিতে ॥
নিজ কর্ম্মের ফলে ছাগলটী হারিয়ে বেড়ান দীঘুষি সরোবরে ॥
সুরলোকে শোনে কথা বিবিধ বিধানে।
ছাগল বাঞ্ছা করিয়া খুল্লনা কথা শোনে ॥
যে কথা শুন্‌লেন খুল্লনা যুবতী।
সেই কথা শুনে মা করেন অবগতি ॥
সৎশৃঙ্গী নামে রাজা কলিঙ্গ নগরে।
বিষয় বিসর্গ দেখি চণ্ডীর হরিষে ॥
হাতে খড়্গ করে কালু বলেন 'তেকেনা যুবতী।
মোরে পরিচয় দেও চণ্ডিকা পার্ব্বতী ॥'
গোধিকামূর্ত্তি ছেড়ে মা কন্যামূর্ত্তি ধরে ॥
"আজ হৈতে না মেরো কালু বনের হরিণী।
আজ হৈতে না মেরো কালু বনের পরাণী ॥
মোর সেবা করেন কালু প্রতি মঙ্গলবারে।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিয়ে ফল ফুলে ॥"
ধন সম্পত্ত্যে কালুর কতকাল গেল।
দেবী মঙ্গলচণ্ডীর পূজা পাসরিল ॥
ঠগে যেয়ে জানাইল রাজার গোচরে।
"কালুর সমান ধন নাই একো ঘরে ॥
ইট পাথরে নানা বিচিত্র ধরে।
লেপের পতাকা তার প্রতিঘরের চালে ॥"

যে কথা শুন্‌লেন রাজা শুন্‌লেন শ্রবণে।
দলমল্ কটকে কালুকে আন্‌লেন বাঁধিয়ে॥
বন্দিশালে থাকেন কালু পান দুক্ষুভার।
মঙ্গলচণ্ডীর কথা হৈল সমৎকার॥ (১)
"মূঢ়মতি! মোর পূজা পাসরিলি।
তেকারণে এত দুক্ষু বন্ধন পাইলি॥"
মঙ্গলবারের দিন পবিত্র হইয়ে।
সুবর্ণ পঞ্চের গুঁড়ি মণ্ডল আঁকিয়ে॥
তা দেখে যমের দূত পাকাপাকি পাড়ে ধূত।
তা দেখে দেবী মায়ের বাড়িল কৌতুক॥
কাঁদে রাজা যম রায় ধরিয়ে ব্রহ্মার পায়
বিষয় করহে অবধূত॥
আকুমারী করে বৎ (২) সদৃশ বর পায়।
কুড়েয় করে বৎ কামদেব হয়।
অন্ধকে করে বৎ চক্ষুদান পায়॥
পুরুষ হ'য়ে শোনে কথা শোনে সাবধানে।
অবিশ্যি বাঞ্ছাপূর্ণ হয় ততক্ষণে॥
সধবায় করে বৎ সংসারের সার।
জন্ম জন্ম থাকে তার হাতের এয়োত॥
বিধবায় করে বৎ করে একবার।
পরজন্মে বিধবা না হয় আরবার॥
মালাধরের (৩) কথা শোন একচিত্ত হঞা।

১। সমৎকার—স্মরণ।

২। বৎ—ব্রত।

৩। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রণীত "চণ্ডীকাব্যে" লিখিত আছে দেবরাজ ইন্দ্র-কুমার মালাধর, মহাদেবের "হাড়মালার" নিন্দা করায়, মহাদেবের অভিশাপে

মালাধর বিষ্ণুপদ র'বের (১) কিঙ্কর।
কলির গোসাঞি তুমি দিন দিবাকর॥"

এই ব্রতকথার সকল স্থানে ছন্দের মিল নাই, এবং কোন কোন অংশের অর্থবোধ হয় না। আমরা সংগ্রহ করিবার সময় অর্থবোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সম্যক কৃতকার্য্য হই নাই। আমরা যে মহিলার নিকট এই ব্রতকথা সংগ্রহ করিয়াছি, তিনি বয়সে প্রাচীনা, এবং নানাবিধ বারব্রতের অভিজ্ঞতায় সবিশেষ প্রবীণা; অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছেন, "এইরূপ শিখিয়াছি এবং এইরূপই বলিয়া আসিতেছি, সকল কথার অর্থ জানি না।" ফলতঃ "মালাধর বিষ্ণুপদ র'বের কিঙ্কর" এই ছত্রটীর অর্থ আমাদের কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। শ্রীমন্ত সওদাগরের বৃত্তান্ত আমাদের রমণীসমাজেও সুপরিচিত, তাহা অবলম্বন করিয়া ভগবতী চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য খ্যাপন করা ব্রতকথার তাৎপর্য্য বলিয়া বোধ হয়।

ব্রতকথার মধ্যে ধনপতি সওদাগর, লহনা, খুল্লনা, কালকেতু ব্যাধ (কালু) ও মালাধর প্রভৃতির নাম এবং এতৎসংক্রান্ত উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত চণ্ডীকাব্যে এই সকল আখ্যায়িকা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। মুকুন্দরামের কাব্য রচিত হওয়ার পর মঙ্গলচণ্ডীর গান প্রচলিত হইয়াছে—অথবা প্রাচীনকাল হইতে যে উপাখ্যান আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে তাহাকেই ভিত্তিস্বরূপ করিয়া মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের রচনা করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায় না। চণ্ডীকাব্য প্রণয়নের শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে—যখন শ্রী-

---

উজানীনগর নিবাসী ধনপতি সওদাগর পত্নী খুল্লনার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মালাধর মর্ত্ত্যলোকে "শ্রীমন্ত সওদাগর" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

১। র'বের—রবির।

চৈতন্য বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হন নাই—তখনও বঙ্গদেশে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও গান প্রচলিত ছিল একথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। ফলতঃ প্রচলিত কোন পুরাণ বা উপপুরাণে চণ্ডীকাব্য-বর্ণিত কালকেতুব্যাধ ও ধনপতি সওদাগরের আখ্যায়িকার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশপ্রচলিত কোন পুরাতন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ভগবতী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করা চণ্ডীকাব্যরচনার উদ্দেশ্য বলিয়াই বোধ হয়। এবিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে প্রসঙ্গতঃ দুই এক কথা লিখিত হইল মাত্র।

ব্রতকথাতে বর্ণিত হইয়াছে, কালকেতু চণ্ডীপূজা বিস্মৃত হওয়াতেই কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক নানারূপ নির্য্যাতন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মুকুন্দরামের গ্রন্থে এসম্বন্ধে লিখিত আছে, চণ্ডী কলিঙ্গনগরের কারাগারে উপস্থিত হইয়া কালকেতুকে বলিতেছেন—

"শুন পুত্র কালকেতু পশুবধ পাপ হেতু
আছিল তোমায় বড় পাপ।
দূর হৈল এতকালে রাজার বন্ধনশালে
মনে না করিহ পরিতাপ॥"

চণ্ডীপূজা যে একটি ব্রতরূপে অনুষ্ঠিত হয়, ইহাও মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের "অষ্টমঙ্গলার" প্রথমেই লিখিত আছে। যথা,—

"শ্রবণ মঙ্গলকথা দেবীর পূজার গাথা
শুনিলে বিপদ প্রতিকার।
এই ব্রত ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
কলিযুগে হইল প্রচার॥"

পূজার বিধি সম্বন্ধেও চণ্ডীকাব্যে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"হেমঝারী জলগর্ভা অষ্টম তণ্ডুল দূর্ব্বা
পূজা লবে বাসর মঙ্গলে ॥"

অন্যত্র

"কোমরে নায়ের্ কাছি লয়ে অষ্ট দূর্ব্বাগাছি
অষ্টম তণ্ডুলযুত করি।
স্নান করি সরোবরে সত্বরে কুসুমনীরে
পূজা কৈল আমারে সওরি ॥"

আটটী তণ্ডুলসহ আটগাছি দূর্ব্বা সংযোগ করিয়া অর্ঘ্য প্রদানের কথা আমরা প্রথমেই বলিয়াছি। এবিষয়ে চণ্ডীকাব্যের সহিত প্রচলিত নিয়মের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা।

"প্রভাতে উঠিয়ে যান কুমারী কুমতকলিকলা।
ব্রহ্ম চিন্তিয়া মায়ের হাতে জপমালা ॥
রক্ত বস্ত্র পরিধান লোহিত লোচন।
প্রণাম মঙ্গলচণ্ডী পদ্ম আসন ॥
প্রথমে প্রহরে রাতি হাস্যবদন।
দ্বিতীয় প্রহরে মা লৌহিল্য যৌবন ॥ (১)
তৃতীয় প্রহরে মা শিবের আলয়।
হর সম্ভাষিতে গেলেন হিমালয় ॥
চতুর্থ প্রহরে মা হরের ঘরণী।
হরের ঘরণী মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥
তুমি রক্ষা করলে মা রক্ষে পাই আমি ॥

---

(১) লৌহিল্য—বোধ হয়, হিল্লোল।

চার প্রহরে চার নাম যেবা নরে শোনে।
তারে মা রক্ষা করেন সংকট দুর্গমে ॥”

তৃতীয় কথা।

“প্রণাম মঙ্গলচণ্ডী জয় জয়কার।
ললাটে সিন্দূর শোভে লক্ষপতি হার ॥
সিন্দূরে মণ্ডিত ঘট কাঞ্চন পূজিয়ে ঘট বারা।
অষ্ট দিনে অষ্টখানি নৈবেদ্য দিয়ে অষ্টখানি কলা ॥
বিধির বিধানে পূজা সর্ব্বমঙ্গলা ॥
দেবী হলেন বুধবারে।
আনন্দ করিয়ে মা বেড়ান প্রতি ঘরে ॥
বুধবারের দিনে মা হয়ে বুদ্ধমতী।
পুরুষকে বুঝাতে মা হলেন সরস্বতী ॥
আদিত বারের দিনে মা আদার ভবানী।
অতিথের ভক্ত দেবী যান তার বাড়ী ॥
বৃহস্পতিবারে দেবী বৃহস্পতিবার।
বিপ্র দেখিয়ে ভক্তি করিবে অপার ॥
বিপ্র দেখিয়ে যেবা বেঁকা মুখ করে।
তার ঘর ছেড়ে লক্ষ্মী যান অন্তরে ॥
প্রাতঃকালে ছড়া ঝাঁটি সন্ধ্যাকালে বাতী।
তার ঘরে থাকেন মা লক্ষ্মী ভগবতী ॥
রবিবার অষ্টমী একাদশী করে।
আনিয়ে হরের রথ নাও সুরপুরে ॥
কুম্‌কুম্‌ কস্তুরী পাত্রে থুয়ে।
মহামায়ার সেবা করেন একচিত্ত হয়ে ॥

মহামায়ার সেবা করেন র'বের কিঙ্কর।
কলির প্রত্যক্ষ গোসাঞি দিন দিবাকর॥"

প্রত্যেক ব্রতকথা শেষ হইলে—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। ইতি মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা সমাপ্ত।

ক্ষুধিত পাষাণ।

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আরও ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন সকল অশ্রুতপূর্ব্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ান্‌রা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন সকল গোপন মৎলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your

newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখন বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েৎ আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান, বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন কি, আমার থিয়সফিষ্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীটির সহিত কোন এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু একটা যোগ আছে; কোন একটা অপূর্ব্ব ম্যাগ্নে-টিজ্‌ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তি-বিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন; আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুসী হইয়া-ছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপে-ক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা কি ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুইএকটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম সরকারে

প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক ও মজ্‌বুৎ লোক দেখিয়া প্রথমেই বরীচে তুলার মাশুল আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ্‌ জায়গাটি বড় রমণীয়। নির্জ্জন পাহাড়ের নীচে বড় বড় বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত "স্বচ্ছতোয়া"র অপভ্রংশ) উপল-মুখরিত পথে নিপুণা নর্ত্তকীর মত পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে—নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় শা মামুদ্‌ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জ্জনস্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন ইহার স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকর-শীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্ম্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্ম্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্ব্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল্‌ গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই শাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না—এখন ইহা আমাদের মত নির্জ্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুলকালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধকেরাণী করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা

বলিল, তাহারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, তথাস্তু। এ বাড়ির এমন বদ্‌নাম ছিল, যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ঙ্কর ভারের মত চাপিয়া থাকিত আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া অবিশ্রাম কাজ কর্ম্ম করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব্ব নেশা আমাকে ক্রমশঃ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মত আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহ-রসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণ মাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু আমি যেদিন সচেতন ভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোন কাজ ছিল না। সূর্য্যাস্তের কিছুপূর্ব্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম-কেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে;—ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙীন্ হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বন-তুলশী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য্য যখনি গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ

দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়া-যবনিকা পড়িয়া গেল;— এখানে পর্ব্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্য্যাস্তের সময় আলো আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম,— কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল— যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোন মূর্ত্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল, যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জ্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শত ধারার মত সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ব্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মত আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে এক প্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে

উত্তেজনা ভয়ের, কি, আনন্দের, কি, কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল ভাল করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে, দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল, ভাল করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে,—কিন্তু একান্ত মনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে ঝুলিতেছে—ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমট্ ভাঙ্গিয়া হুহু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি একমুহূর্ত্তে এক সঙ্গে মর্ম্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বল আর সত্যই বল, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকল-হাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিঃশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড় আশঙ্কা হইল, যে, হঠাৎ বুঝি নির্জ্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন; আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্ব্বনাশিনী এইবার বুঝি

আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম ভাল করিয়া আহার করিতে হইবে ;—শূন্য উদরেই সকলপ্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুর ঘৃতপক্ক মস্‌লা-সুগন্ধি রীতিমত মোগ্‌লাইখানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে, সাহেবের মত সোলাটুপি পরিয়া নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া গড়্‌গড়্‌ শব্দে আপন তদন্তকার্য্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট্‌ লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না ; কিন্তু মনে হইল আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জ্জন পথ রথ-চক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্ত্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতি বৃহৎ। তিন সারি বড় বড় থামের উপর কারুকার্য্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুল শূন্যতা ভরে অহর্নিশি গম্‌গম্‌ করিতে থাকে। সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনো প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল – যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকের দরজা জান্‌লা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্‌ দিকে পালাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে

রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ-শ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম—ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল শাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কি সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখন বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুনঠুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুল্‌বুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দ্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল, এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি—অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, ৺ অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চারশো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্ত্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস্ করিতে যাই, এ সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনি আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্জ্বলিত কেরোসিন্ ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল, যে, আমি ৺ অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে; ইহাও

মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোন মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি এবং কবিবরেরাই বলিতে পারেন কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য, যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্ব্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসীন্-প্রদীপ্ত ল্যাম্প্ টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগ্‌লাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্ত্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটি যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতি তুচ্ছ ক্যাম্প-খাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল,—ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম;—ঘরে যে কোন শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোন যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্ব্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসঙ্কুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোন লোককেই দেখিলাম না তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া

উঠিতেই সে কোন কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল। আমি অত্যন্ত চুপি চুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময় প্রকাণ্ড শূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনিময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত, এবং সে সকল ঘরে আমি কখন যাই নাই। সে রাত্রে নিঃশব্দপদক্ষেপে সংযত নিঃশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই। আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্ত্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগ্‌দাদের নির্ব্বাপিতদীপ সঙ্কীর্ণ পথে কোন এক সঙ্কটশঙ্কিল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দ্দার সম্মুখে সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া

গেল। আমি অনুভব করিলাম সেই পর্দ্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজপরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙ্গাইয়া পর্দ্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল। ভিতর হইতে একটি পারস্য গালিচা পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফ্‌রান্‌ রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটিপরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপী মখ্‌মল্‌ আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের একপার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিক পাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশ্‌পাতী, নারাঙ্গী এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোট পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম্র আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল। আমি কম্পিত বক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম অমনি সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজে শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম আমার সেই ক্যাম্প্‌ খাটের উপরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বসিয়া আছি—ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে—এবং আমাদের পাগ্‌লা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে "তফাৎ যাও" "তফাৎ যাও" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে। এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের একরাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে কর্ম্ম করিতে যাইতাম, এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মোহময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিশম্পাৎ করিতে থাকিতাম—আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্ম্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ, মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্ব্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতী খাটো কোর্ত্তা, এবং আঁট প্যাণ্ট্‌লুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখ্‌মলের ফেজ্‌ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া রঙীন্‌ রুমালে আতর মাখিয়া বহুযত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট্‌ ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহু কুণ্ডলায়িত বৃহৎ আল্‌বোলা লইয়া এক উচ্চ গদিবিশিষ্ট বড় কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোন এক অপূর্ব্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কি যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণ্যমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্ত্তের মধ্যে,—এই কচিৎ হেনার গন্ধ,

ক্বচিত সেতারের শব্দ, কচিৎ সুরভি জলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মত চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারি জাফ্‌রান্ রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটিপরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লালটুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতিরাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় বড় আয়নার দুইদিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্ব্বক শাহজাদার মত সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণীর ছায়া আসিয়া পড়িল;—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে উর্দ্ধাভিমুখে আবর্ত্তিত করিয়া, মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত; - আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্ত্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারিদিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের

মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভ-রমণীয় সুকোমল ওড়্না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদক বেষ্টনে আমার সর্ব্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্ণে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম - কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না — কিন্তু সে দিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবী হ্যাট্ এবং খাটো কোর্ত্তা ঝুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় শুস্তানদীর বালী এবং অরালী পর্ব্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্ত্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্য্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল। সে দিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্ত্তা এবং সাহেবী হ্যাট্ পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেই দিন অর্দ্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে — যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে, এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্ত্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর

হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর!

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জুর-কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে! তোমাকে কোন বেদুয়ীন্ দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদ্শাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোণার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক্, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেন্ শা বাদ্শা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাব্শী দেবদূতের মত সাজ করিয়া খোলা তলোয়ার হাতে

দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষা-ফেনিল ষড়যন্ত্র-সঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে ?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগ্‌লা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট্ হায় সব ঝুঁট্ হায়!" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে; চাপ্‌রাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেই দিনই আমার জিনিষপত্র তুলিয়া আপিস ঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরাণী করীম্ খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাস্যিতে বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল এখনি কোথায় যাইবার আছে—তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামৎও আমার কাছে বেশি কিছু বোধ হইল না—যাহা কিছু বর্ত্তমান, যাহা কিছু আমার চারি-দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন, অর্থহীন, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌-টম্ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম, টম্‌টম্ ঠিক গোধূলি মুহূর্ত্তে আপনিই সেই পাষাণপ্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার

করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জ্জনা চাহিব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র. হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি, বলি, হে বহ্নি, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে! এবার তাহাকে মার্জ্জনা কর, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেল!

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সে দিন অরালী পর্ব্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটা ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জলস্থলআকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলচ্ছিন্ন উন্মাদের মত পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড় বড় শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিস্‌ঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ় বদ্ধ মুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনো ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে,

মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই, কাহাকে সান্ত্বনা করিব? এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার? এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে?

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট্ হ্যায় সব ঝুঁট্ হ্যায়!" দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহেরআলি এই ঘোর দুর্য্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয় ত ঐ মেহের আলিও আমার মত এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগ্‌লার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহেরআলি, ক্যা ঝুঁট্ হ্যায়রে?" সে আমার কথায় কোন উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুঁট্ হ্যায় সব ঝুঁট্ হ্যায়!"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মত আপিসে গিয়া করীমখাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, ইহার অর্থ কি আমাকে খুলিয়া বল।

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্ম্মার্থ এই, এক সময় ঐ প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—

সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত্ত তৃষার্ত্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মত খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ঐ প্রাসাদে বাস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার উদ্ধারের কি কোন পথ নাই?

বৃদ্ধ কহিল, একটি মাত্র উপায় আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঐ গুল্‌বাগের একটি ইরাণী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য্য এবং তেমন হৃদয়বিদারণ ঘটনা সংসারে আর কখন ঘটে নাই।

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল—গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফাষ্ট ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জান্‌লা হইতে মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই "হ্যালো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেণ্ড্ ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মত দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল—গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষ্যে আমার থিয়সফিষ্ট্ আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

শীতে ও বসন্তে।

প্রথম শীতের মাসে
শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে,
হিহি করে কাঁপে গাত্র।
আমি ভাবিলাম মনে,
এবার মাতিব রণে,
বৃথা কাজে অকারণে
কেটে গেছে দিন রাত্র।
লাগিব দেশের হিতে
গরমে বাদলে শীতে,
কবিতা নাটকে গীতে
করিব না অনাসৃষ্টি ;
লেখা হবে সারবান্,
অতিশয় ধার্-বান্,
খাড়া র'ব দ্বারবান
দশদিকে রাখি দৃষ্টি।
এত বলি গৃহকোণে
বসিলাম দৃঢ় মনে
লেখকের যোগাসনে,
পাশে লয়ে মসীপাত্র।
নিশিদিন রুধি দ্বার,
স্বদেশের শুধি ধার,

নাহি হাঁফ ছাড়িবার
অবসর তিলমাত্র।
রাশি রাশি লিখে লিখে
একেবারে দিকে দিকে
মাসিকে ও সাপ্তাহিকে
করিলাম লেখাবৃষ্টি।
ঘরেতে জ্বলে না চুলো,
শরীরে উড়িছে ধূলো,
আঙুলের ডগাগুলো
হয়ে গেল কালীকৃষ্টি!

খুঁটিয়া তারিখ মাস
করিলাম রাশ রাশ,
গাঁথিলাম ইতিহাস,
রচিলাম পুরাতত্ত্ব।
গালি দিয়া মহারাগে
দেখালেম দাগে দাগে
যে যাহা বলেছে আগে
কিছু তার নহে সত্য।
পুরাণে বিজ্ঞানে গোটা
করিয়াছি সিদ্ধি-ঘোঁটা,
যাহা-কিছু ছিল মোটা
হয়ে গেছে অতি সূক্ষ্ম।
করেছি সমালোচনা,
আছে তাহে গুণপণা,

কেহ তাহা বুঝিল না,
মনে রয়ে গেল দুঃখ।
মেঘদূত—লোকে যাহা
কাব্যভ্রমে বলে "আহা,"—
আমি দেখায়েছি, তাহা
দর্শনের নব সূত্র।
নৈষধের কবিতাটি
ডারুয়িন-তত্ত্ব খাঁটি,
মোর আগে এ কথাটি
বল কে বলেছে কুত্র?
কাব্য কহিবার ভাণে
নীতি বলি কানে কানে
সে কথা কেহ না জানে,
না বুঝে হতেছে ইষ্ট।
নভেল লেখার ছলে
শিখায়েছি সুকৌশলে
শাদাটিরে শাদা বলে,
কালো যাহা তাই কৃষ্ণ।

কত মাস এই মত
একে একে হ'ল গত,
আমি দেশহিতে রত
সব দ্বার করি বন্ধ।
হাসি গীত গল্পগুলি
ধূলিতে হইল ধূলি,

বেঁধে দিয়ে চোখে ঠুলি
কল্পনারে করি অন্ধ
নাহি জানি চারি পাশে
কি ঘটিছে কোন্ মাসে,
কোন্ ঋতু কবে আসে,
কোন্ রাতে উঠে চন্দ্র।
আমি জানি, রুশিয়ান্
কতদূরে আগুয়ান,
বজেটের খতিয়ান্
কোথা তার আছে রন্ধ্র।
আমি জানি কোন্ দিন
পাশ্ হল কি আইন,
কুইনের বেহাইন্
বিধবা হইল কন্যা;
জানি সব আটঘাট ;—
গেজেটে করেছি পাঠ
আমাদের ছোটলাট
কোথা হতে কোথা চল্ল।

একদিন বসে বসে
লিখিয়া যেতেছি কসে'
এদেশেতে কার দোষে
ক্রমে কমে' আসে শস্য;
কেনই বা অপঘাতে
মরে লোক দিবারাতে,

কেন ব্রাহ্মণের পাতে
        নাহি পড়ে চর্ব্ব্য চোষ্য।
হেনকালে দুদ্দাড়্
খুলে গেল সব দ্বার,
চারিদিকে তোল্‌পাড়
        বেধে গেছে মহাকাণ্ড!
নদীজলে, বনে, গাছে
কেহ গাহে কেহ নাচে,
উলটিয়া পড়িয়াছে
        দেবতার সুধাভাণ্ড।
উতলা পাগল-বেশে
দক্ষিণে বাতাস এসে
কোথা হতে হাহা হেসে
        প'ল যেন মদমত্ত!
লেখাপত্র কেড়েকুড়ে—
কোথা কি যে গেল উড়ে,—
ওই রে আকাশ জুড়ে
        ছড়ায় "সমাজ-তত্ত্ব!"
"রুশিয়ার অভিপ্রায়"
ওই কোথা উড়ে যায়,
গেল বুঝি হায় হায়
        "আমিরের ষড়যন্ত্র!"
"প্রাচীন ভারত" বুঝি
আর পাইব না খুঁজি,

কোথা গিয়ে হল পুঁজি
"জাপানের রাজতন্ত্র!"

গেল গেল, ও কি কর,
আরে আরে ধর ধর!—
হাসে বন মর্-মর,
হাসে বায়ু কলহাস্যে!
উঠে হাসি নদীজলে
ছলছল কলকলে,
ভাসায়ে লইয়া চলে
"মনুর নূতন ভাষ্যে"।
বাদ প্রতিবাদ যত
শুক্‌নো পাতার মত
কোথা হল অপগত,—
কেহ তাহে নহে ক্ষুণ্ণ!
ফুলগুলি অনায়াসে
মুচকি মুচকি হাসে,
সুগভীর পরিহাসে
হাসিতেছে নীল শূন্য!
দেখিতে দেখিতে মোর
লাগিল নেশার ঘোর,
কোথা হতে মন-চোর
পশিল আমার বক্ষে;
যেমনি সমুখে চাওয়া
অমনি সে ভূতে-পাওয়া

লাগিল হাসির হাওয়া
      আর বুঝি নাহি রক্ষে'!
প্রথমে প্রাণের কূলে
শিহরি শিহরি দুলে,
ক্রমে সে মরম-মূলে
      লহরী উঠিল চিত্তে।
তার পরে মহা হাসি
উছসিল রাশি রাশি,
হৃদয় বাহিরে আসি
      মাতিল জগৎ-নৃত্যে!

এস এস বঁধু এস,
আধেক আঁচরে বস,
অবাক্ অধরে হাস
      ভুলাও সকল তত্ত্ব!
তুমি শুধু চাহ ফিরে,—
ডুবে যাক্ ধীরে ধীরে
সুধাসাগরের নীরে
      যত মিছা যত সত্য!
আনগো যৌবনগীতি,
দূরে চলে' যাক্ নীতি,
আন পরাণের প্রীতি,
      থাক্ প্রবীণের ভাষ্য!
এসহে আপনাহারা,
প্রভাত সন্ধ্যার তারা,

বিষাদের আঁখিধারা,
প্রমোদের মধুহাস্য !
আন বাসনার ব্যথা,
অকারণ চঞ্চলতা,
আন কানে-কানে কথা,
চোখে চোখে লাজ-দৃষ্টি ;
অসম্ভব, আশাতীত,
অনাবশ্য, অনাদৃত,
এনে দাও অযাচিত
যত কিছু অনাসৃষ্টি !
হৃদয়-নিকুঞ্জমাঝ
এস আজি ঋতুরাজ,
ভেঙ্গে দাও সব কাজ
প্রেমের মোহন মন্ত্রে !
হিতাহিত হোক্ দূর,—
গাব গীত সুমধুর,
ধর তুমি ধর সুর
সুধাময়ী বীণাযন্ত্রে !

১৮ আষাঢ়,
১৩০২।

ব্যাকরণ তুলনা।

ইংরাজগণের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে আমাদের দেশে জাতীয় সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা ছিল না। এই কারণে জাতীয় ভাষায় ব্যাকরণ রচনা পূর্ব্বক ভাষাকে নিয়মিত ও তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া নব নব গ্রন্থ রচনার পথ পরিষ্কার করিবার চেষ্টাও তখন ছিল না। ইংরাজগণের আগমনের পর হইতেই ইংরাজীর অনুকরণে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের ব্যাকরণ রচিত হইতে লাগিল। এই কারণে, প্রথম প্রথম যে সকল ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল, সে সকলের সংজ্ঞা, সূত্র ও ব্যাখ্যাদির অধিকাংশই ইংরাজী ব্যাকরণ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। এখনও মারাঠী ব্যাকরণ সমূহে অধিকাংশ স্থলে ইংরাজী ব্যাকরণের প্রভাব ও ছায়া সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ব্যাকরণেরও কোনও কোনও অংশ ইংরাজীর ছায়াবলম্বনে রচিত। কিন্তু মারাঠী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি সংস্কৃতপ্রধান ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃতানুসারী হইলে যেরূপ বিশুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবার সম্ভাবনা, ইংরাজী ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হইলে কখনই সেরূপ হয় না, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। মহারাষ্ট্র দেশের কৃতবিদ্যগণ এই কারণে, জাতীয় ভাষায় ব্যাকরণের সম্পূর্ণতা সম্পাদনার্থে ইংরাজী ব্যাকরণের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য, ইংরাজী ব্যাকরণের কোনও অংশই যে গ্রহণীয় বা অনুকরণীয় নহে, এরূপ কথা তাঁহারা বলেন না। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, যেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের লক্ষণ ও ব্যাখ্যাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও ভাষার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, সেখানে অকারণে ইংরাজীর

অনুকরণ প্রশস্ত নহে। তাঁহাদের এই চেষ্টার কিঞ্চিৎ পরিচয় এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

ব্যাকরণ কাহাকে বলে? ইংরাজী ব্যাকরণে আছে, Grammar is the art of speaking and writing [English] language correctly. কেহ কেহ বলিয়াছেন, Grammar teaches us how educated people speak and write. প্রায় সকল মারাঠী ব্যাকরণেই এই ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণও এ বিষয়ে মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারে নাই। এমন কি, হেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন কৃত "সংস্কৃত ব্যাকরণ সংগ্রহ" গ্রন্থেও এইরূপ ভাবের ব্যাখ্যাই পরিগৃহীত হইয়াছে। ব্যাকরণের সংস্কারেচ্ছুগণ বলিতেছেন যে, এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তাঁহারা বলেন, কোনও পারিভাষিক শব্দের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সময় উহার যৌগিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। গ্রামার ও ব্যাকরণ শব্দের যৌগিক অর্থ এক নহে। এই হেতু, ব্যাকরণের লক্ষণ নির্দ্দেশ কালে গ্রামারের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা সুসঙ্গত নহে। গ্রামা শব্দের অর্থ লিখন বা অক্ষর; সুতরাং গ্রামার অর্থে "লেখন কলা ও তৎসম্পর্কীয় বাক্য কথন কৌশল।" কিন্তু ব্যাকরণ শব্দের যৌগিক অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যথা—ব্যাক্রীয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিভিঃ প্রদর্শ্যন্তে শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্। অর্থাৎ যে শাস্ত্র অধ্যয়নে ভাষার অন্তর্গত শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি (অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়-আদেশ-আগম-বিকারাদি) [ও প্রয়োগ] সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে ব্যাকরণ বলে। ব্যাকরণ শব্দের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত।

"ব্যাকরণের অধ্যয়নের দ্বারা সাধুভাষা বা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে ও বলিতে পারা যায়"—যাঁহারা এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহাদের জানা উচিত যে, ব্যাকরণের

সহিত ভাষার সাধুত্বের বা জনগণের শিক্ষিতত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। কারণ অশিক্ষিত লোকগণেরও ভাষার ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে। পূর্ব্বকালের বররুচি প্রভৃতি ও বৈয়াকরণগণ "মাগধী" ও "পৈশাচী" প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের কথ্য ও অসাধু ভাষা সমূহেরও ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। ফল কথা, ভাষা—শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কথ্যই হউক, অথবা অশিক্ষিতগণের কথ্য হউক, সাধু হউক, অথবা অসাধু হউক, উহার অন্তর্গত শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি কথন ও ভাষার সম্পূর্ণ স্বরূপ আবিষ্কার করাই ব্যাকরণের কার্য্য।

ইংরাজীতে Syntax, Prosody ও Punctuation গ্রামারের অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতে এ সব বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। কোনও কোনও বাঙ্গালা ব্যাকরণে আজ কাল রচনা প্রকরণ (Syntax and Essay writing) ছন্দ ও অলঙ্কার প্রকরণাদি প্রদত্ত হইয়াছে। এ সকল বিষয় ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কি না? মহারাষ্ট্রীয় ব্যাকরণে এ সব বিষয় গৃহীত হয় নাই।

দ্বিতীয় কথা,—বর্ণ কাহাকে বলে? বঙ্গীয় ব্যাকরণকারগণের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী letter এর লক্ষণ বর্ণে আরোপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মারাঠী বৈয়াকরণগণ স্বতন্ত্র মতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যগণ পরস্পরের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য যে সকল পরিস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাদের মূল ধ্বনিকে "বর্ণ" বলে: "আগুন" শব্দটি আ + গ্ + উ + ন্ + অ এই কয়টি মূলধ্বনির যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ভাষার আধারস্বরূপ এই মূলধ্বনি গুলিই "বর্ণ" পদবাচ্য।

বর্ণ শব্দের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলে সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫০টি বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই সংখ্যার মধ্যে ং ও ঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ, আমরা অনুস্বরের উচ্চারণ হসন্ত

ঙ ও ম্ এর ন্যায় করি। বিসর্গের উচ্চারণ অর্দ্ধ সকার ও অর্দ্ধ হ-কারের ন্যায়। সুতরাং ইহারা পৃথক্ বর্ণরূপে গণনীয় নহে। "ড়" "ঢ়" ও "ং" ইহাদিগের উচ্চারণের বিশেষত্ব চিন্তা করিলে ইহাদিগকে বর্ণ মধ্যে পরিগণিত করা যায়। বৈদিক ভাষায় "ল" কারের দ্বিবিধ উচ্চারণ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে দুইটি "ল" স্বীকার করিলে সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫১টি বর্ণ হয়।

ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বর্ণসংখ্যা সংস্কৃত অপেক্ষা কম। ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, ঃ, ষ, শ—এই সাতটি বর্ণ হিন্দীতে উচ্চারিত হয় না। বিশুদ্ধ মারাঠী ভাষায়ই, ঋ, ৠ, ঌ, ঌ, ঞ—এই কয় বর্ণের প্রয়োগ নাই। তবে ইকার, ৠকার ঌকার মূলক ও ঞ যুক্ত সংস্কৃত শব্দের অভাব মারাঠীতে নাই।

মারাঠী বর্ণমালার উচ্চারণ অনেকাংশে বাঙ্গালা হইতে বিভিন্ন। অকারের উচ্চারণ বাঙ্গালায় কিছু ওকার ঘেঁসা,—কিন্তু মারাঠীতে হ্রস্ব আকারের ন্যায়। মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বদেশীয় ভাষাকে "মরাঠী" বলেন। কিন্তু এই "মরাঠী" শব্দের মকারের তাঁহারা যেরূপ উচ্চারণ করেন, তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে হইলে 'ম'য়ে আকার যোগ না করিলে চলে না। এই কারণে আমাদিগকে মহারাষ্ট্রীয় "মরাঠী"র পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় "মারাঠী" লিখিতে হয়। ঐকার ও ঔকারের মারাঠী উচ্চারণ অনেকটা "আই" ও "আউ"র মত।

ঋ, ৠ, ঌ, ৡ—ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ কি তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় উহারা রি, রী, লি, লী, রূপে উচ্চারিত। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ এইরূপ হইলে, ইহারা কখনও বর্ণ বা মূলধ্বনি মধ্যে—অন্ততঃ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইত না। মারাঠীতে ইহাদের উচ্চারণ অনেকটা "রু, রূ, লু

ও ল্"—এর মত। এই উচ্চারণ ভেদের জন্য ঋকারান্ত সংস্কৃত শব্দগুলি অপভ্রংশ হইয়া মারাঠীতে প্রবেশ কালে উকারান্ত ও বাঙ্গালাতে ইকারান্ত হইয়াছে। উদাহরণ,—সংস্কৃত নপ্তৃ শব্দ। ইহার মারাঠী অপভ্রংশ "নাতু"। বাঙ্গালা অপভ্রংশ "নাতি"। সেইরূপ—ভ্রাতৃ—ভাউ—ভাই। মাতৃ—মাউ—মাই (হিন্দী)। যাতৃ—জাউ (মারাঠী)। ধাতৃ—ধাই (বাঙ্গালা)। বৃক্ষ—রুখ (মারাঠী)।

মারাঠীতে "ঙ"-র উচ্চারণ কিছু স্বতন্ত্র। বাঙ্গালায় "ঢঙ্" এই শব্দে "ঙ" এর উচ্চারণ যেরূপ, মহারাষ্ট্রীয় বালকেরা বাল্যকাল হইতে "ঙ" র সেইরূপ উচ্চারণ শিক্ষা করে। বাঙ্গালার উচ্চারণ কতকটা "উঁঅঁ"-র মত। "ঞ"-র উচ্চারণেও এইরূপ পার্থক্য আছে। বাঙ্গালায় ণ ও ন, শ, ষ ও স, জ ও য, এবং বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব - ইহাদের উচ্চারণের কোনও পার্থক্য নাই ;—কিন্তু মারাঠীতে ইহাদের উচ্চারণের পার্থক্য বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়। এইরূপ প্রথার এক উপকার এই যে, বালকগণকে শ্রুত লিখন (Dictation) কালে বানানের বিশুদ্ধতার জন্য বিশে. ভাবিতে হয় না! সে যাহা হউক, হিন্দীর অনুকরণে মারাঠী গ্রাম্য ভাষায় 'ষ' ক্বচিৎ খকারের ন্যায় উচ্চারিত ও লিখিত হয়। যথা—বিষ (বিখ), হরিষ (হরিখ)। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যেও এরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বৈদিক ভাষার অনুকরণে মারাঠী, কর্ণাটকা, তেলেগু, গুজরাথী ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি ভাষায় লকারের দ্বিবিধ উচ্চারণ ও লিখন-রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের ভাষাসমূহে লকারের দন্ত্য উচ্চারণই প্রসিদ্ধ। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহে মূর্দ্ধন্য লকারও প্রচলিত আছে। কাল, ছল, মূল, কলা প্রভৃতি শব্দের লকার মূর্দ্ধন্য বৎ উচ্চারিত হয়।

চ, জ, ঝ—এই বর্ণত্রয়ও দ্বিবিধরূপে উচ্চারিত হয়। বিশুদ্ধ

মারাঠীতে ইহারা "দন্ত্যতালব্য” বর্ণ। বঙ্গদেশের কোনও কোনও প্রদেশে এবং কর্ণাটকী ও তেলেঙ্গী ভাষায় এই বর্ণগুলি ও “ছ” বর্ণটি দন্ত্যতালব্য রূপেই উচ্চারিত হয়। এই সকল উচ্চারণের পার্থক্যনির্দ্দেশক কোনও বিশেষ লিপিচিহ্ন ভারতবর্ষের কোনও দেশেই প্রচলিত নাই বলিয়া অনেক সময় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। তথাপি, চকারাদি বর্ণত্রয়ের উচ্চারণ সম্বন্ধে একটী নিয়ম মারাঠীতে আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সে নিয়ম এই,—“সংস্কৃত হইতে অবিকৃত ভাবে গৃহীত শব্দের অন্তর্গত “চ, জ, ঝ” বর্ণের উচ্চারণ নিত্য বিশুদ্ধ তালব্য। বিশুদ্ধ মারাঠী ও অপভ্রষ্ট সংস্কৃত শব্দান্তর্গত চকারাদি বর্ণের উচ্চারণ নিত্য দন্ত্য তালব্য। কিন্তু ঐ সকল বর্ণ যফলা যোগে বিশুদ্ধ তালব্যবৎ উচ্চারিত হয়।” বাঙ্গালায় এ সম্বন্ধে এরূপ কোনও নিয়ম খাটে না বোধ হয়।

মারাঠীতে এক বিন্দুর দ্বারা অনুস্বর, চন্দ্রবিন্দু ও “ঙ, ঞ, ণ, ন, ম” প্রভৃতি অনুনাসিক বর্ণের কাজ চালাইয়া লওয়া হয়। এজন্য বৈদেশিকের পক্ষে সময়ে সময়ে বিন্দুর উচ্চারণ লইয়া বড় গোল বাধিয়া যায়। আনন্দ, কোদণ্ড, কঙ্কণ প্রভৃতি শব্দ ন, দ ও কয়ের মাথায় বিন্দু দিয়া লিখিতে হয়। তা ছাড়া, অনুস্বরের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণে শিক্ষানবীশকে বড়ই বিপদে ফেলে। দু একটা উদাহরণ দিতেছি। “সংরক্ষণ” ও "সংযমন'' শব্দ, 'স'য়ের মাথায় বিন্দু দিয়া লিখিতে হয়। কিন্তু উচ্চারণের সময় সংরক্ষণকে “সঁওরক্ষণ” ও সংযমনকে কতকটা “সাঁইয়মন”বৎ উচ্চারণ করা হয়। মারাঠী ভাষায় সানুনাসিক উচ্চারণের কিছু বেশী বাড়াবাড়ি। ইহার কারণ এই যে, মারাঠীতে চন্দ্রবিন্দু অনেক স্থলেই বহুবচনের ও নপুংসকত্বের চিহ্ন। মারাঠীতে অকারান্ত পদের অন্তস্থিত বিসর্গ অনে-

কটা বিসর্গযুক্ত হ্রস্ব আকারবৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে। সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ বিশুদ্ধ সংস্কৃতের ন্যায়। কেবল "জ্ঞ" এর উচ্চারণ "দ্ন" এর মত। যথা—জ্ঞান - দ্নান। প্রাচীন কাব্যাদিতে দু একস্থলে জ্ঞান (দ্নান) এর পরিবর্ত্তে "গ্যান" লিখিত দেখিয়াছি। হিন্দী হইতে বোধ হয়, ইহা গৃহীত হইয়াছে। এই সকল উচ্চারণের বিশেষত্ব বশতঃ মহারাষ্ট্রীয় ভাষা বাঙ্গালীর কর্ণে কিয়ৎ পরিমাণে শ্রুতিকটু বোধ হয়।

আর এক বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার সহিত মারাঠীর বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দের মধ্যে সন্ধি হয় না। কিন্তু মারাঠীতে কখনও কখনও তাহা হয়। যেমন—ঘর—আঁত (আঁত অর্থে মধ্যে)="ঘরাঁত"। বলা আবশ্যক একথা স্বরসন্ধি সম্বন্ধেই খাটে। বিশুদ্ধ মারাঠীতে ব্যঞ্জনসন্ধি নাই।

মারাঠীতে বিশেষ্য পদকে "নাম" বলে। নামের লক্ষণ এই,— "যাহা অভিধেয় তাহাই পদার্থ। যাহা দ্বারা পদার্থের বোধ জন্মে, তাহাকে "নাম" (বিশেষ্য) বলে। নাম প্রধানতঃ ত্রিবিধ—সামান্য, নাম, বিশেষ নাম (proper noun) ও ভাববাচক নাম। কোনও কোনও ব্যাকরণে গুণবাচক, দ্রব্যবাচক ও সমুদায়বাচক collective noun প্রভৃতি ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে মারাঠী ব্যাকরণে বিশেষ্যের এবম্প্রকার ভেদ কল্পনার কোনও আবশ্যকতা স্বীকার করেন না।

তৎপরে বিভক্তি প্রকরণ। ইহার মধ্যে লিঙ্গবিচার সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। কিছুদিন পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট প্রদেশে "লিঙ্গ" শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে এক অতি অদ্ভুত তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকে বলিলেন যে, "লিঙ্গ" শব্দটি অশ্লীলার্থ বোধক; সুতরাং উহা শিশুপাঠ্য ব্যাকরণগ্রন্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে।

বলা বাহুল্য, এই তর্ক নিতান্ত বালকোচিত। কিন্তু ইহার ফলে গুজরাটী ব্যাকরণ হইতে ঐ শব্দটি বিতাড়িত হইয়াছে, ও তৎ-পরিবর্ত্তে নরজাতি, নারীজাতি ও নান্যেতরজাতি এই সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে।

সকল ভাষার লিঙ্গ ব্যবস্থা একরূপ নহে। মনুষ্যগণের সংস্কার, শিক্ষা ও মানসিক অবস্থাভেদই ইহার প্রধান কারণ। কর্ণাটক প্রদেশবাসিগণের চক্ষে দেবতা ও বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য ভিন্ন অপর সকল জীবই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। এই কারণে, তাহাদের ভাষায় বলদ, গাভী, ও শিশু প্রভৃতি অর্থবোধক শব্দ নপুংসক লিঙ্গ। মহারাষ্ট্রীয়-গণ অনুমান করেন যে, আরবী, হিন্দী ও বাঙ্গালাভাষা-ভাষি-গণের সংস্কার অনুসারে পদার্থমাত্রই হয় স্ত্রীত্ব না হয় পুরুষত্ব গুণ-যুক্ত। এই কারণে তাঁহাদের ভাষায় নপুংসক লিঙ্গের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ইংরাজী ভাষার লিঙ্গব্যবস্থা আবার অন্যরূপ। ইংরাজীতে সাধারণতঃ নির্জীব পদার্থ মাত্রই নপুংসকলিঙ্গ, পুরুষত্ব-বিশিষ্ট প্রাণিগণ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীত্ববিশিষ্ট প্রাণিগণ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু বিড়াল, শশক, প্রভৃতি শান্ত শিষ্ট ও আদরণীয় পশুগণ স্ত্রীলিঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। আর স্বদেশ, নৌ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ মাতৃ-বাৎসল্য-সূচক বলিয়া কল্পিত, তৎসমূহও স্ত্রীলিঙ্গ। সূর্য্য পুংলিঙ্গ, চন্দ্র স্ত্রীলিঙ্গ।

ইংরাজী ভাষায় এই প্রকার লিঙ্গ ব্যবস্থা হইতে তাহাদিগের মানসিক অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ও মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক ভাষা সমূহে মানবের মানসিক বৃত্তির সূক্ষ্মতা বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ এরূপও অনুমান করেন যে, ঐ সকল ভাষার লিঙ্গ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা করিতে পারিলে,

ঐ সকল ভাষাভাষিগণের প্রাচীনকালের সামাজিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব পরিস্ফুট হইতে পারে।

লিঙ্গ ব্যবস্থা বিষয়ে মারাঠী ভাষা বহুপরিমাণে সংস্কৃতের অনুগামী (ক)। সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় সাধারণতঃ পুরুষবাচক পদার্থ, ও উগ্রতা, পরাক্রম, কাঠিন্য ও ভয়ানকতা প্রভৃতি পুরুষোচিত লক্ষণযুক্ত ও কঠোর নামযুক্ত পদার্থসমূহ পুংলিঙ্গমধ্যে পরিগণিত। এই কারণে সমুদ্র, পর্ব্বত, শর, দন্ত প্রভৃতি পদার্থ নির্জীব হইলেও পুংলিঙ্গ। মারাঠীতে "ঢেকুণ" শব্দের অর্থ "ছারপোকা"। এই ঢেকুণ শব্দটি যেমন শ্রুতিকঠোর, ঢেকুণের প্রকৃতিও তেমনই ভয়ানক। এই কারণে, উহা ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও এবং উহার প্রকৃত লিঙ্গ নির্ণয় অসম্ভব হইলেও, পুংলিঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত। আর একটি শব্দ "বোকা"—অর্থ পুংবিড়াল। অর্থানুসারে ও শ্রুতিকর্কশতা হেতু শব্দটি পুংলিঙ্গ। পক্ষান্তরে, মাঁজর (সংস্কৃত মার্জ্জার শব্দের অপভ্রংশ) শব্দ অনেকটা নির্ব্বলত্ব ও সৌম্যভাব প্রকাশক বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত (খ)। স্ত্রীবোধক পদার্থ এবং যে সকল পদার্থে ও নামে সৌন্দর্য্য, চপলতা, মৃদুতা ও

(ক) সংস্কৃতের ন্যায় মারাঠী শব্দের লিঙ্গনির্ণয় অনেক স্থলে প্রত্যয় অনুসারে করিতে হয়।

(খ) লিঙ্গের প্রতি বক্তার মনোযোগ না থাকিলে, বা লিঙ্গ জানা না থাকিলে পুং ও স্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দও নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কুত্রা—অর্থে কুক্কুর—পুংলিঙ্গ। কিন্তু লিঙ্গের প্রতি বক্তার মনোযোগ দিবার অবকাশ বা আবশ্যক না থাকিলে "কুত্রেঁ" এই নপুংসক পদ ব্যবহৃত হয়। "কে একজন আসিয়া আপনায় ডাকিতেছিল।" এই কথার উত্তরে মারাঠীতে "কে সে?" এইরূপ প্রশ্ন করিতে হইলে, "কোণ্ তেঁ?" এই বাক্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে হয়। আগন্তুক স্ত্রী কি পুরুষ জানা না থাকায়, 'তো" (পুং) ও "তী" (স্ত্রী) এর পরিবর্ত্তে "তেঁ" (অর্থ—সে) এই নপুংসক লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

কোমলত্বাদি স্ত্রীজনোচিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সেগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। সামগ্রী-বাচক ও স্বাতন্ত্র্যাদি গুণশূন্য পদার্থ সমূহ নপুংসক লিঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। এই লক্ষণানুসারে মারাঠীতে অপত্য, কুটুম্ব ও অরণ্যাদি শব্দ নপুংসক লিঙ্গ। সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় লিঙ্গভেদ যেরূপ শব্দ ও পদার্থসমূহের কঠোর-কোমলতাদি ভেদে সংঘটিত হইয়াছে, প্রত্যয় সম্বন্ধেও সেইরূপ ভেদ লক্ষিত হয়। সংস্কৃতে "রামঃ" এই বিসর্গময় কঠোর শব্দ পুংলিঙ্গ। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে কোমলতা সম্পাদক "আ" প্রত্যয় করিয়া "রামা" পদ সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ আবার নপুংসক শব্দে নির্ব্বলত্বসূচক "অম্" প্রত্যয় হয়। এই "অম্" প্রত্যয় মারাঠীতে শব্দের অন্তে চন্দ্রবিন্দুরূপে বিদ্যমান। যাহা হউক, প্রত্যয় সংক্রান্ত এই প্রভেদ হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, প্রথমাবস্থায় সংস্কৃত শব্দ সমূহের অন্ত্যস্বর বা প্রত্যয় অনুসারে লিঙ্গব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় নাই, পরন্তু অগ্রে লিঙ্গাদি নির্ণীত হইয়া পরে অন্ত্যস্বর সম্বন্ধীয় নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাষার অভিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় যে, কালসহকারে বহুবিধ নূতন শব্দের লিঙ্গাদি প্রাচীন নিয়মানুসারে নির্ণীত না হইয়া, প্রাচীন শব্দের অনুকরণে অর্থাৎ তাহাদের উচ্চারণ বা অন্ত্য বর্ণের সাদৃশ্যানুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক্। সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীবোধক নামগুলি অধিকাংশ স্থলেই আকারান্ত বা ঈকারান্ত। প্রথমাবস্থায় হয় ত শ্রুতিমাধুর্য্য বা কোমলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্ত্রীবাচক শব্দসমূহে আকার ও ঈকার যুক্ত হইয়াছিল। বোধ হয়, পরবর্ত্তী কালে এই নিয়মের প্রতি আর দৃষ্টি না থাকায়, ঐ সকল শব্দের অনুকরণে নবরচিত বিবিধ আকারান্ত ও ঈকারান্ত অপ্রাণিবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। লঙ্কা, লাক্ষা, আজ্ঞা, ইচ্ছা,

রথ্যা (রাস্তা) কবরী, পল্লী প্রভৃতি শব্দ এ কথার উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে। (১)

লিঙ্গ ব্যবস্থার সহিত মনোবৃত্তির সূক্ষ্ম সম্বন্ধ বিষয়ে স্থূলতঃ যাহা কথিত হইল, তাহার অপবাদক বহুবিধ শব্দ হয়ত আমাদের বর্ত্তমান কালের সমালোচকগণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও ভিন্ন ভিন্ন কারণে যে সকল শব্দ রচিত হইয়া ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই সকল শব্দ সেই সেই অবস্থায় প্রাচীন আর্য্যগণের হৃদয়ে কঠোর-কোমলত্বাদি গুণের কিরূপ ভাব মুদ্রিত করিয়াছিল তাহা জানিবার যদি কোনও বিশিষ্ট উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে, আমাদের বিশ্বাস, তাহা দ্বারা সমস্ত শব্দের লিঙ্গ ব্যবস্থার সুসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মীবাই।

(৩)

ইংরাজ-সৈন্য ঝাঁশি-অভিমুখে কুচ করিয়া আসিতেছে এই সংবাদ ঝাঁশিতে আসিয়া পৌঁছিল, তথাপি ঝাঁশির প্রধান-বর্গ সে বিষয়ে বড় মনোযোগ দিলেন না। লালাভাউ বক্‌শি, মানা-ভোপট্‌কর প্রভৃতি, ঝাঁশি-দরবারের পুরাতন মুচ্ছুদিগণ (ষ্টেট্‌সমেন) লক্ষ্মণ-রাও-

---

১ যে সকল অপ্রাণিবাচক সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশ হইয়া মারাঠীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের লিঙ্গ নির্ণয় সংস্কৃত মূলানুসারেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। জিহ্বা, বুভুক্ষা, হরিদ্রা, খট্টা, মুদ্রা, ইষ্টিক প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ জীভ ভুক, হলদ, খাট, মোহর, ইট প্রভৃতি মারাঠী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। অধিকাংশ পুং, ও ক্লীবলিঙ্গান্ত শব্দ এই নিয়মের অনুবর্ত্তী।

বাণ্ডে নামক ঝাঁশির নবীন দেওয়ানকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি গর্ব্বভরে তাঁহাদের কথায় ধিক্কার করিলেন; শুদ্ধ তাহা নহে, রাণী ঠাকুরাণীর সহিত যাহাতে তাঁহাদের সাক্ষাৎ না হয় তাহারও উপায় অবলম্বন করিলেন। তথাপি, নানা-ভোপটকর রাণীঠাকুরাণীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া অবশেষে এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন। "আমি ঝাঁশি-সংস্থানের সেবায় বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছি; অতএব, আমার প্রার্থনা এই, ইংরাজ সরকারের নিকট যেন একজন উকীল অবশ্য-অবশ্য পাঠানো হয়। বিদ্রোহীদিগের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নাই, ইংরাজের হুকুম অনুসারেই আপনি সংস্থানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং ইংরাজের হিতোদ্দেশেই আপনি বোরছার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন—এই সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য একজন সুচতুর উকীলকে পাঠানো আবশ্যক। আপনি ইংরাজ সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে পত্র নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিবে কি না, পৌঁছিলেও সমস্ত বিষয়ের স্পষ্ট বোঝাপড়া হইবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।" নানার ন্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচারক্ষম ব্যক্তির এই কথা শুনিয়া, রাণী ঠাকুরাণী, গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ একজন সুচতুর ব্যক্তিকে দূতস্বরূপ পাঠাইবার জন্য দেওয়ানজিকে হুকুম করিলেন। দেওয়ান, নবীন কর্ম্মচারিদিগের মধ্য হইতে, অকৃতকর্ম্মা, রাষ্ট্রব্যবহারানভিজ্ঞ এক ব্যক্তিকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন, সে ব্যক্তি এজেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, অন্যস্থানে বসিয়া কতকগুলা জাল-পত্র লিখিয়া পাঠাইল এবং ঝাঁশি দরবারের

লোকেরাও সেই সকল পত্রের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল! কথায় বলে, "দুর্মন্ত্রী রাজ্যনাশায়;"—এ কথার যাথার্থ্য এইস্থলে বিলক্ষণ প্রতিপাদিত হইল।

এদিকে, ইংরাজদিগের প্রতিশোধ-তৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে,—ঝাঁশির হত্যাকাণ্ডে রাণীর বিলক্ষণ যোগ ছিল এইরূপ তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে। মধ্য-হিন্দুস্থান মধ্যে ঝাঁশি-সংস্থানই বিদ্রোহী-দিগের প্রধান সংকেত-স্থল ও ঝাঁশির কেল্লাই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও দুর্জ্জয়; অতএব ঝাঁশি জয় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য—এই বিবেচনা করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা য়ুরোপ-প্রসিদ্ধ, নবাগত সেনানী সর্-হিউরোজকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সর-হিউ-রোজ পথিমধ্যে একে একে কতিপয় কেল্লা দখল করিয়া ও তত্রস্থ বিদ্রোহী দিগকে পরাভূত করিয়া অবশেষে ২০ মার্চ্চ তারিখে, প্রাতঃকাল ৭ টার সময় ঝাঁশিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র লক্ষ্মণরাও দেওয়ান প্রভৃতি মুচ্ছুদ্দি-মণ্ডলী মধ্যে ভারী গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। তাহাদিগের মধ্যে তেমন সুবিজ্ঞ ও সুচতুর লোক না থাকায়, যে যাহা খুষি বলিতে লাগিল। নানা-ভোপটকর প্রভৃতি পুরাতন মুচ্ছুদ্দি-মণ্ডলী, গোয়ালিয়ারের প্রবীন সুবিজ্ঞলোকদিগের নিকট পত্র লিখিয়া, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, পূর্ব্ব হইতেই এ সম্বন্ধে পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই পরা-মর্শ-অনুসারে, তাঁহারা দরবারে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে, ইংরাজ সৈন্যের আগমনে কোন প্রকার বাধা না দিয়া, ইংরাজ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহারা যে ভুল বুঝিয়াছেন, সেই ভুল ঘুচাইয়া দেওয়া হউক এবং পূর্ব্বের ন্যায় ইংরাজ সরকারের সহিত সখ্য স্থাপন করা হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব কাহারও মনোনীত হইল না। নথেখাঁর সহিত যুদ্ধ ও ঝাঁশি প্রদেশের

বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে সমস্ত লোক সৈন্যমধ্যে রাখা হইয়াছিল, তাহারা ঝাঁশি সংস্থানের পুরাতন ভৃত্য—ঝাঁশি খাস করিবার সময় ইংরাজেরা তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে রহিত করে। এই কারণে, ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদিগের দ্বেষবুদ্ধি জাগৃত ছিল। ইংরাজসৈন্য ঝাঁশি আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছে, এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাহারা যুদ্ধের জন্য লালায়িত হইল।

রাণীঠাকুরাণী কেল্লার মধ্যে থাকায়, প্রধান মণ্ডলী ব্যতীত আর কাহারও তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি ছিল না—সুতরাং, ইংরাজ পক্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত তিনি জানিতে পারিতেন না, ইংরাজেরাও তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিত না। কেহ বলেন,—ইংরাজ-সৈন্যশিবির হইতে এই ভাবে পত্র আইসে, "আপনি, লক্ষ্মণরাও দেওয়ানজী, লালা-ভাউ বক্‌শি প্রভৃতি আট ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া, নিঃশস্ত্র হইয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" কিন্তু এই কথা নাকি স্বাভিমানিনী রাণী ঠাকুরাণীর ভাল লাগে নাই, তাই যুদ্ধের আরম্ভ হইল। কেহ বলেন—রাণী ও তাঁহার সর্দ্দার-মণ্ডলী বিদ্রোহীদিগের দলভুক্ত হইয়াছে ইংরাজদিগের বিশ্বাস হওয়ায়, ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে কয়েদ করিবার মৎলব করিয়াছিলেন। এবং এই কথা রাণী জানিতে পারিয়াই "মরণ রুচে বীরেরে—না রুচে অপযশ কলঙ্কে" মহারাষ্ট্রীয় কবি মোরোপন্তের এই উক্তি অনুসারে, ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কেহ বলেন, ইংরাজ সৈন্য ঝাঁশির অভিমুখে আসিতেছে, এই সংবাদ ঝাঁশিতে পৌঁছিলে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয় যে, উহা নথে খাঁর সৈন্য—উহারা মুখে রং লাগাইয়া পুনর্ব্বার ঝাঁশি আক্রমণ করিবার জন্য আসিয়াছে। এই বিশ্বাসে, রাণী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার হুকুম দেন। সেই সময়ে নাকি অধীনস্থ

ঠাকুর-মণ্ডলী রাণীকে এইরূপ বলেন যে, ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠা যাইবে না—তাহাদের সহিত রণস্পর্দ্ধা করিয়া কোন ইষ্ট নাই—বাণপুরের রাজাও মাল্‌থোনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কথায় কোন ফল হইল না। কেহ বলিল—রাণীঠাকুরাণী, মিত্রতা স্থাপন করিবার জন্য ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার একজন সর্দ্দারকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হইয়া, উল্টা সেই সর্দ্দারের ফাঁশি হয় এবং এই কারণেই রাণী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। আসল কথা, প্রকৃত কারণ ঠিক জানা যায় না—জানিবার কোন উপায়ও নাই। এই পর্য্যন্ত জানা যায়, রাণী ইংরাজের সহিত সদ্ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিলেন, কোন ফল হইল না,—ইংরাজেরা ঝাঁশি আক্রমণ করিল; তখন সেই স্বাভিমানিনী তেজস্বিনী রাণী, ঝাঁশি সংরক্ষণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সৈন্যমধ্যে লড়াকা ও সাহসী কয়েকজন আফ্‌গান ও বুণ্ডেলনিবাসী লোক ছিল বটে কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৈন্যমধ্যে তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। এক্ষণে রাণী স্বীয় সৈন্যমধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি সমস্ত সৈন্য-মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত করিলেন। তিনি স্বয়ং পরিদর্শনাদি করিয়া দুর্গবপ্রের জীর্ণসংস্কার করাইলেন, কেল্লার বুরুজের উপর তোপ বসাইলেন এবং তোপ চালাইবার জন্য সুদক্ষ গোলন্দাজ নিযুক্ত করিলেন। সহরস্থ বপ্র-প্রাকারের রন্ধ্রমধ্যে "কারামাইন" বন্দুক প্রবিষ্ট করাইয়া সিপাহী পাহারা বসাইলেন। ঝাঁশির অভিজাত, বিশ্বাসী ও দক্ষ ঠাকুর-মণ্ডলী ও বুণ্ডেল-বাসী সর্দ্দারদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগের উপর সৈন্যের কোন কোন অংশের নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করিলেন।

এইরূপে, অল্পকালের মধ্যেই কেল্লা ও সহর সংরক্ষণের সুন্দর বন্দোবস্ত হইল।

এদিকে, ইংরাজ-সেনাপতি, সর্-হিউ-রোজ, ২১ মার্চ তারিখে, সমস্ত দিন ধরিয়া ঝাঁশির কেল্লা ও সহরের স্থিতি-প্রণালী সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং সুবিধার জায়গা নির্ব্বাচন করিয়া, সেই সেই স্থানে বাছা বাছা তোপ ও ফৌজ স্থাপন করিলেন। বাহির হইতে যাহাতে কোনরূপ সাহায্য না আসিতে পারে, এই উদ্দেশে সমস্ত পথ ঘাট রুদ্ধ করিয়া স্থানে স্থানে ঘোড়-সওয়ার ও তোপ-খানা (আর্টিলরি) রাখাইয়া দিলেন। আবার স্থানে স্থানে পৃথক ভাবে তোপ ও পদাতিক সৈন্য স্থাপন করিলেন। প্রত্যেক সৈন্য-বিভাগের সেনানায়কদিগের মধ্যে যাহাতে শত্রুসম্বন্ধীয় বার্ত্তাদির চালাচালি হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগের মধ্যে তার-যন্ত্রের যোজনা করিলেন। একটা উচ্চ ভূমির উপর স্তম্ভ উঠাইয়া, তথা হইতে দূরবীনের সাহায্যে, যাহাতে কেল্লার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত প্রদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এইরূপ বেধশালার (অব্‌জরভেটরি) ন্যায় একটা স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তার-আফিশ স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে আর একটি সুবিধা ঘটিল;—ব্রিগেডিয়ারষ্টুয়ার্টের অধীনস্থ সৈন্য চন্দেরী হইতে আসিয়া পৌছিল। ২৩ তারিখে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের আরম্ভ হইল। ইংরাজ-সৈন্য, ঝাঁশির নিকটস্থ সকল ময়দান ও উচ্চভূমি অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; এক্ষণে তাহারা কেল্লা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের তোপের ভাল বন্দোবস্ত থাকায়, তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইংরাজের ফৌজ ও ঘোড়সওয়ার অগ্রসর হইবা মাত্র, ঝাঁশির গোলন্দাজেরা তাহাদের উপর প্রচণ্ড-

রূপে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে ইংরাজদিগের টিঁকিয়া থাকা দায় হইল। যাহা হোক্ সেই দিবসের রাত্রিতেই অবসর বুঝিয়া তৃতীয় য়ুরোপীয় পল্টনের মোহরা অগ্রসর হইল। সমস্ত রাত্রি সহরমধ্যে রণ-বাদ্যের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল; কেল্লার মধ্য হইতে মশালের আলোক, মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল; প্রহরীরা বন্দুকের আওয়াজ করিতে লাগিল। তাহাতে বুঝা গেল, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া, ঝাঁশির সৈন্যমধ্যে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। ইংরাজসৈন্যও সহর-প্রাকারের ৩০০ গজ দূরে তোপ পাতিয়াছিল এবং একটা দেবালয়ের মধ্যে তোপের মঞ্চ (ব্যাটারি) বাঁধিয়াছিল। প্রভাত হইবা মাত্র, ঝাঁশি-কেল্লার সুচতুর ও দক্ষ গোলন্দাজেরা আপন আপন তোপে অগ্নি সংযোগ করিল এবং সহরের বপ্রস্থিত দুই তিন তোপমঞ্চ হইতে গোলা বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম, সেই সকল গোলা ইংরাজ-সৈন্যের মাথার উপর দিয়া যাইতেছিল—তাহাতে কোন ফল হইতেছিল না। কিন্তু পরে, যখন কেল্লাস্থিত "ঘন-গর্জ" নামক তোপের বর্ষণ আরম্ভ হইল, তখন ইংরাজদিগের মধ্যে একেবারে হাহাকার পড়িয়া গেল। এই তোপের এই একটি আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে, উহার ধূম-রাশি পূর্ব্ব হইতে দেখা যাইত না।* সেই জন্য বিরুদ্ধ পক্ষ সতর্ক হইবার অবকাশ পাইত না। "ঘন-গর্জ" হইতে প্রচণ্ড গোলা-সকল ছুটিয়া সোঁ-সোঁ শব্দে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে আসিয়া পড়িত; এই জন্য ইংরাজেরা, এই তোপের নাম দিয়াছিল—"হুইস্‌লিং ডিক্"।

সে যাহা হউক, ২৪ তারিখে, ইংরাজ-সৈন্য, চারিটা তোপ-মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া, দক্ষিণ দিকের কেল্লার উপর গোলা বর্ষণের উদ্যোগ করিল। ২৫ তারিখে তোপের রঞ্জুকে আগুণ লাগাইল। কতকগুলি তোপ হইতে "কুলুপী-গোলা" (Shell) একসঙ্গে

বর্ষিত হইয়া সহরের মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং সহর-বপ্রের উপর লক্ষ্য করিয়া, "পৌণ্ডর্স"-তোপ হইতে গোলা-বর্ষণ হইতে লাগিল। ইহাতে করিয়া, ঝাঁশির তোপ-খানার (অর্টিলারি) কতকগুলি গোলন্দাজ নিহত হওয়ায় ঝাঁশির তোপ বন্ধ হইয়া গেল এবং বপ্র-প্রাকারও কতকটা ভগ্ন হইল ইংরাজ-দিগের কুলুপী-গোলা সহরের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, সহর-বাসী লোকদিগের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এই ভয়ঙ্কর গোলা, রাস্তা কিম্বা ঘরের উপর পড়িবামাত্র ফাটিয়া চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, অনেক লোক জখম ও নিহত হইল। সহরের দোকান-হাট বন্ধ হইয়া গেল—অনেক ঘরে আগুণ লাগায়, তাহার প্রজ্জলিত শিখায় গগণমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। এই দারুণ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া রাণী ঠাকুরাণী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু ইহাতে হতবুদ্ধি না হইয়া, যাহাতে লোকের কষ্ট নিবারণ হয়, তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যে সকল প্রজার গৃহ-দাহ হইয়াছিল, সেই অনাথ লোকদিগের জন্য অন্নদানের ব্যবস্থা করিলেন—দক্ষিণী ব্রাহ্মণদিগের জন্য গণপতির মন্দিরে অন্ন-সত্র খুলিলেন, এবং অপর সাধারণের জন্য সদাব্রতের উদ্যোগ করিয়া কাঙ্গাল গরিবদিগকে ছোলা-ভাজা বিতরণ করিতে লাগি-লেন। রাণী-ঠাকুরাণীর নিকট হইতে সৈন্যগণ উত্তেজনা ও উৎ-সাহবাক্য প্রাপ্ত হইয়া, ইংরাজের ভীষণ কুলুপী-গোলাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, বন্দুক হইতে এক সঙ্গে অজস্র গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বিস্তর লোক জখম ও নিহত হয়। চতুর্থ দিবসে, অর্থাৎ ২৫ মার্চ তারিখে, ইংরাজেরা কেল্লার দক্ষিণভাগ হল্লা করিয়া আক্রমণ করিল; উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; অবশেষে, দ্বিপ্রহরের সময়, কেল্লার দক্ষিণ

বুরুজের তোপ বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে কেল্লার লোকেরা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে, পশ্চিমস্থ বুরুজের গোলন্দাজ, তোপ-মঞ্চ হইতে তোপ উঠাইয়া লইয়া দূর্বীণের দ্বারা উত্তম লক্ষ্য সন্ধান করিয়া, কেল্লার দক্ষিণ বুরুজে আবার তোপ-মঞ্চ বসাইল। এবং তথা হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া, ইংরাজের গোলন্দাজদিগকে নিহত করিয়া, তাহাদিগের তোপ বন্ধ করিয়া দিল। ইহাতে রাণী ঠাকুরাণী পরিতুষ্ট হইয়া এক-তোড়া টাকা গোলন্দাজকে বক্‌শিস্ করিলেন। এই গোলন্দাজের নাম গুলাম-গোষথান।

যদিও ঝাঁশির সৈন্য, ইংরাজ সৈন্যের ন্যায় রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত ছিল না, তথাপি তাহারা এই যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে ইংরাজ-সেনানী বিস্ময়োচ্ছ্বাস প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ডাক্তার লো-সাহেব, তাঁহার "মধ্য হিন্দুস্থান" নামক গ্রন্থে ঝাঁশি-যুদ্ধের যে সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ঝাঁশির সৈন্য ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত, রণ-শিক্ষিত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত, সমান ও সমকক্ষভাবে, যুদ্ধ করিয়াছিল। একজন দেশীয় ভদ্রলোক, যিনি সেই যুদ্ধের সময়, ঝাঁশিতে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ডাক্তার সাহেবের বর্ণনার সহিত তাহার বিলক্ষণ ঐক্য দেখা যায়। দেশীয় ভদ্রলোকটি এইরূপ বলেন ঃ—

"রাত্রিকালে সহর ও কেল্লার উপর গোলা আসিয়া পড়িতে লাগিল; সেই গোলাগুলা দেখিতে ভয়ঙ্কর! (মর্টার) "গহ্বর-নলী" তোপনিঃসৃত গোলাগুলা পঞ্চাশ ষাঠ শের ওজনের হইলেও, তোপ হইতে যখন সবেগে ছুটিয়া আসিত, তখন যেন ক্রীড়া-কণ্ডুকের ন্যায় ক্ষুদ্র ও খদিরের ন্যায় লাল দেখাইত। দিবসের প্রখর

সূর্য্যালোকে গোলাগুলা স্পষ্ট দেখা যাইত না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহারা যেন কণ্ডুকের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিতেছে, এইরূপ মনে হইত। প্রত্যেক লোকের মনে হইত, বুঝি এই গোলা আমার উপর আসিয়াই পড়িবে। কিন্তু প্রায়ই সেই সব গোলা সাত আট শো পদ তফাতে আসিয়া পড়িত। এই প্রকার, দিবারাত্রি যুদ্ধ হইয়া সমস্ত সহর একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও এইরূপ যুদ্ধ হইল। দেড় প্রহর পর্য্যন্ত, রাণী ঠাকুরাণীর জয় হইয়া, ইংরাজের সৈন্য নাশ হইতে লাগিল এবং তাহাদিগের তোপও কিয়ৎকালের জন্য বন্ধ হইল। কিছু পরে, ইংরাজের আবার জয় হইতে লাগিল এবং বিরুদ্ধ পক্ষের তোপ বন্ধ হইয়া গেল; বিশেষতঃ সূর্য্যাস্তকালে কেল্লার দক্ষিণদিকের তোপ-চালক গোলন্দাজেরা আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিল না। ইংরাজের গোলাবর্ষণে, দক্ষিণদিকের তোপ-মঞ্চ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, রাত্রিকালে সুদক্ষ রাজমিস্ত্রি মজুর আনানো হইল। তাহারা অতীব কৌশল-সহকারে, কম্বলে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া ধীরে ধীরে বুরুজের উপর উঠিল, এবং নিম্নভূমি হইতে, লোকের স্কন্ধে লোক উঠাইয়া, ইষ্টক প্রভৃতি উপকরণ, বুরুজের উপর আনিয়া তুলিল এবং শুইয়া শুইয়া তোপ-মঞ্চ বাঁধিতে লাগিল।

এইরূপে, ইংরাজের অলক্ষিতে, তোপ-মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া ঝাঁশির সৈন্য আবার তোপ চালাইতে আরম্ভ করিল। সেই সময় ইংরাজ-দিগের একটু শৈথিল্য হওয়ায়, তাহাদিগের অনেক লোক মারা পড়িল এবং দুইটি তোপ বন্ধ হইয়া গেল। অষ্টম দিবসের প্রভাতে, ইংরাজ ফৌজ "শঙ্কর" কেল্লার উপর আবার গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের নিকট দুর্গ অবরোধের উপযোগী অতি মূল্যবান দূরবীণ ছিল। ...... সেই দূরবীণের সাহায্যে

কেল্লার অভ্যন্তরস্থ জলের চৌবাচ্চার উপর লক্ষ্য করিয়া তাহারা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। জলের ভারীরা জল তুলিতে-তাহাদের মধ্যে ৫।৭ জন নিহত হওয়ায়, বাঁক্ ফেলিয়া তাহারা পলায়ন করিল। ইহাতে, জলের অভাব হওয়ায়, স্নানাদির অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিল। এই সময়ে, কেল্লার গোলন্দাজেরা ইংরাজ-গোলন্দাজের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদিগের তোপ বন্ধ করিয়াছিল। এখন আবার, চৌবাচ্চা হইতে জল তুলিবার সুবিধা হওয়ায়, স্নান ভোজনাদির সুব্যবস্থা হইল। আহারাদির কিছুকাল পরে, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া যত্র-তত্র ধূম ও ধুলায় ভরিয়া গেল। তাহাতে, দশদিক আচ্ছন্ন হইয়া আর কিছুই দেখা যায় না, এইরূপ হইল। না জানি কি হইয়াছে, এই ভয়ে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে, অনুসন্ধানে, জানা গেল, রাজবাটীর সম্মুখস্থ ময়দানের বারুদ-কারখানায়, ৩০ জন পুরুষ ও আট জন স্ত্রীলোক মারা গিয়াছে এবং ৪০।৫০ জন জখম হইয়াছে। তেঁতুল গাছের ময়দানে, বারুদ কারখানার গোজ আরম্ভ হইয়াছিল। দুই মণ বারুদ প্রস্তুত হইবামাত্র, বুরুজের নীচের তল-ঘরে লইয়া রাখা হইতেছিল। সেই কারখানায় ইংরা-জের গোলা পড়িবামাত্র, বারুদে আগুন লাগে এবং তাহার সূক্ষ্ম-কণা সকল ধূলির মধ্যে প্রসারিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, তদোদ্গত ধূম চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অষ্টম দিবসে তুমুল যুদ্ধ আবার আরম্ভ হইল। কামান ও বন্দুকের মুহুর্মুহু ধ্বনি, শিঙ্গা, কর্ণে, ও ব্যুগেলের বাদ্য যেখানে সেখানে শুনা যাইতে লাগিল। ধোঁয়াতে, ধূলাতে ও নানাপ্রকার শব্দে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইংরাজ সৈন্যের গোলাবর্ষণে ঝাঁশির অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। রাত্রিতেও সহরের উপর গোলা আসিয়া পড়িতে লাগিল—

তাহাতেও অনেক লোক মারা গেল, অনেকে প্রাণভয়ে গৃহ মধ্য স্থিত উৎকট*স্থানে গিয়া লুকাইয়া রহিল। বপ্রস্থ গোলন্দাজ ও শিপাহী বিস্তর নিহত হইল। এই দিন রাণী ঠাকুরাণীর অত্যন্ত শ্রম হইয়াছিল। চারিদিকে নজর রাখিয়া, যেখানে কিছু অভাব হই-তেছিল, অমনি তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা পূরণ করিয়া দিবার হুকুম দিতেছিলেন। তাহাতে, সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া প্রবল ইংরাজ সৈন্যের বিরুদ্ধে সমানভাবে লড়িতেছিল। ইংরাজদিগেরও পরা-ক্রম প্রকাশে ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু ঝাঁশি সৈন্যের অপ্রতিম দৃঢ় নিশ্চয় নিবন্ধন, ইংরাজেরা ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত কেল্লার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।"

এই ৩১ তারিখের রাত্রিতে রাণী ঠাকুরাণী একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেন। যেন একটি সুবেশিনী মধ্যমবয়স্কা নারী, গৌরবর্ণ, সরল নাসিকা, প্রশস্ত-ললাট, বিশাল কৃষ্ণ নেত্র, অতীব রূপবতী, সর্ব্বাঙ্গে মুক্তার অলঙ্কার, পরিধানে চওড়া পাড়ের লাল সাড়ি, অঙ্গে রেশমী পাড়ের চোলি, মাল-কোচা দেওয়া, কোমর-বাঁধা,—এইরূপ বেশে কেল্লার বুরুজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, অতীব উগ্র ভাবভঙ্গী-সহকারে রক্তবর্ণ গোলা লুফিয়া ধরিতেছেন এবং গোলা ধরিতে ধরিতে হাতে কালিমা পড়ায়, রাণী ঠাকুরাণীকে তাহা দেখাইয়া যেন এইরূপ বলিলেন, আমি বলিয়াই এইরূপ গোলা লুফিয়া ধরিতে পারিতেছি।

যাহা হউক, উভয় পক্ষের মধ্যে এইরূপ ঘনঘোর যুদ্ধ চলি-তেছে, এমন সময়ে আর একটি গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইল। ঝাঁশির রাণীকে সাহায্য করিবার জন্য, নানাসাহেবের আদে-শানুসারে, তাঁহার সেনাপতি তাত্যা-টোপে, কাল্পী হইতে বিশ সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া কুচ করিতে করিতে ঝাঁশির নিকট

আসিয়া পৌঁছিলেন। ঝাঁশির নিকটস্থ কোন উচ্চ ভুমির উপর, ইংরাজদিগের টেলিগ্রাফ-আফিস স্থাপিত ছিল। আফিসের অধ্যক্ষ দূরবীণ-সহযোগে উত্তরদিক হইতে এক বিপুল সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া, ভয়সূচক নিশান খাড়া করিল। তদ্দ্বারা, শত্রুর আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া ইংরাজ সেনাপতি চিন্তিত হইলেন। কেন না বিরুদ্ধ পক্ষের তুলনায়, ইংরাজ-সৈন্য কম থাকায়, ঝাঁশির অবরোধের জন্য, তাহারা স্থানে স্থানে পথ-ঘাট বন্ধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। সেই সকল স্থানে হইতে তাহাদিগকে সরাইয়া আনিলে, কেল্লার লোকেরা পথ মুক্ত পাইয়া, হল্লা করিয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবে—এইরূপ ইংরাজ সেনাপতির আশঙ্কা হইল।

এদিকে, বেটোয়া নদীতীরস্থ সমভূমি ময়দানে, তাত্যা-টোপের প্রবল সৈন্য, মহা উৎসাহে, আড্ডা গাড়িয়া অবস্থিতি করিতেছিল। তন্মধ্যে, গোয়ালিয়ার কণ্টিঞ্জেণ্ট ফৌজের যে বিদ্রোহী দল, কানপুরে, সেনাপতি উইন্‌ঢ্যামের সৈন্যকে পরাভূত করে, তাহারাও সেই সঙ্গে ছিল। তাহারা বিজয়ানন্দে বিস্ফুরিত হইয়া মনে করিতেছিল, পেশোয়ার সৈন্যের নিকট ইংরাজ সৈন্যের কিসের যোগ্যতা? যাহা হউক, এই সাহায্য যথাসময়ে আসিয়া পড়ায়, ঝাঁশি-রক্ষণের বল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইল এবং ইংরাজদিগের বিজয়পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

এদিকে, সর্-হিউ-রোজ্ তাত্যা-টোপের আগমন-বার্ত্তা অবগত হইবামাত্র, কোনপ্রকার গোলযোগ না করিয়া, অতি শান্তভাবে, ৩১ তারিখের রাত্রে, প্রথম ব্রিগেডের সৈন্যদল হইতে কতকগুলা হাতি আনাইয়া, ২৪ পৌণ্ডের দুই তোপ, বোর্চ্ছার রাস্তার উপর স্থাপন করিলেন, এবং সেখান হইতে সহরে যাইবার রাস্তা একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

তাত্যাটোপে একজন সুচতুর বীরপুরুষ ছিলেন। বিদ্রোহ-সময়কার বিলাতী "ডেলিনিউস"-পত্রে, তাঁহার এইরূপ বর্ণনা প্রকাশিত হয় :—

"তাত্যা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—উচ্চ বংশের নহে। তাঁহাতে দস্যুবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহার চাতুর্য্যবুদ্ধি বিলক্ষণ আছে, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি কিছুমাত্র নাই। তিনি লেখা-পড়া জানেন না, কিন্তু সিপাহীগিরি কাজে খুব মজবুৎ। ইহার জন্য, তাঁহার উপর, তাঁহার অনুচরবর্গের অচলা নিষ্ঠা। তাঁহার দেহের গঠন সুদৃঢ়, হৃষ্ট-পুষ্ট ও সতেজ। নৈতিক প্রভাব অপেক্ষা বাহুবলের প্রতাপে তিনি অন্যের মনে উৎসাহ ও বল সঞ্চার করেন। ইংরাজেরা যে সমর-বিদ্যায় কুশল, ইহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই জন্য, সমরক্ষেত্রে ইংরাজদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ না করিয়া, তাহাদিগকে অনুধাবন করিয়া ক্লান্ত করিতে তাঁহার ভাল লাগে। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। তিনি অত্যন্ত দুর্দান্ত বেগশালী তেজীয়ান ও সাহসী। তাঁহার সৌর্য্যযুক্ত সতেজ সুন্দর মুখশ্রী। তাঁহার দৃষ্টি চপল ও উগ্র। ভ্রূ-যুগল ধনুকাকার, কপাল উচ্চ ও সরল, নাসিকা গরুড় পক্ষীর ন্যায়, মুখ ছোট, ঠোঁট চাপা, দাঁত ধপ্‌ধপে সাদা, গোঁফ কালো ও দেহ-বর্ণ ঘন-শ্যামল। কেতাদুরস্ত অপেক্ষা দেহরক্ষণোপযোগী কাপড় পরিতে তিনি ভাল বাসেন। তিনি সর্ব্বদা পা-পর্য্যন্ত লম্বা একটা জোব্বা পরেন ও কাঁধের উপর একটা কাশ্মিরী শাল ফেলিয়া রাখেন। তাঁহার সহিত বারো মাস, প্রায় ২৫।৩০ জন লোক প্রহরী থাকে। ইহাদের সাহায্যে, যুদ্ধের মধ্যে তিনি আপনাকে কোন প্রকারে উদ্ধার করেন। "নানা সাহেবের প্রতিনিধি" এই উপাধিটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।"

শ্রীমন্ত বাজীরাও সাহেব পেশোয়াকে যে পেন্‌শন দেওয়া

হইত, সেই পেনশনের টাকা তাঁহার মৃত্যুর পর, ইংরাজেরা বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, তাঁহার উত্তরাধিকারী, প্রসিদ্ধ নানা সাহেব শিপাহীবিদ্রোহে যোগ দেন; এবং তাঁহার তরফে, তাঁহার স্বামিনিষ্ঠ সেবক তাত্যা-টোপে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া, স্বীয় প্রভুর আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়েন। এই তাত্যা-টোপের পরাক্রমে, বিদ্রোহীদল প্রবল হইয়া কিছুকালের জন্য যেন অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাত্যার ষড়যন্ত্রবলেই, সিন্ধিয়া-সরকারের কণ্টিঞ্জেণ্ট ফৌজ বিদ্রোহীদলভুক্ত হয় এবং তাঁহারই যুদ্ধকৌশলে কানপুরের নিকটস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে জেনেরাল উইন্ড্যামের অধীনস্থ ইংরাজ সৈন্য পরাভূত হয়। "এম্পায়ার ইন্ ইণ্ডিয়া" এই গ্রন্থের লেখক বলেন—"যদি আরও কিছু সাহস প্রকাশ করিতেন এবং কেবল অভাবপক্ষের রণ-কৌশল না দেখাইয়া, কতকগুলি ভাবপক্ষের রণকীর্ত্তি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই "হিন্দু গ্যারিবল্ডি" নামে খ্যাত হইতেন সন্দেহ নাই"।

যাহা হউক, তাত্যা-টোপে, কাল্পী হইতে বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝাঁশির সাহায্যে আসিয়াছেন দেখিয়া, কেল্লার লোকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহার স্বাগত সম্ভাষণার্থ তাহারা মুহুর্মুহু তোপের সেলামি দিতে লাগিল এবং তাঁহার জয়ঘোষণায় রণবাদ্য আরম্ভ করিয়া দিল। সেই বাদ্যরবে গগনমণ্ডল বিকম্পিত হইল এবং সকলের হৃদয় আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। এই উৎসাহের দৃশ্য, রাণী ঠাকুরাণী ও তাঁহার সর্দ্দার-মণ্ডলী কেল্লার বপ্র হইতে দেখিতে লাগিলেন এবং রাণী ঠাকুরাণী বপ্রের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি, কেল্লার বপ্রের উপর এবং ইংরাজের ছাউনীমধ্যে মশাল জ্বলিতেছিল– এবং তাহারই আলোকে যুদ্ধ চলিতেছিল।

১ এপ্রিল তারিখে, প্রাতঃকালে, রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব দিবসে, সর্-হিউ-রোজ্, ঝাঁশির অবরোধের জন্য যত লোক আবশ্যক, তাহা স্থানে স্থানে রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য, অতীব দক্ষতা সহকারে, শত্রুদিগকে বিন্দুমাত্র জানিতে না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এদিকে, তাত্যা-টোপে ইংরাজের সৈন্য নিতান্ত অল্প বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র, তিনি ঝাঁশির অবরোধ ভঙ্গ করিবার জন্য, একদল সৈন্য রণস্থলে প্রেরণ করিলেন; তাহারা ইংরাজদিগের আয়ত্ত-সীমার মধ্যে আসিবামাত্র, সর্-হিউ রোজ্, শত্রুর দক্ষিণদিক্ আক্রমণ করিবার জন্য, কতক দল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যকে নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার অব্যবহিত তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বাধীনে তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্য গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে, শত্রুদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল এবং তাহাদিগের মধ্যে বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইতিমধ্যে, তাত্যা-টোপের পক্ষ হইতেও তোপের মার সুরু হইল, তাহাতে ইংরাজ-অশ্বারোহী সৈন্য অনেক নিহত হইল। সেই সময়ে, তাত্যাটোপের অধীনস্থ আফগান-সিপাহীরা উচ্চ উচ্চ ভূমির উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু, কাপ্তেন লীড্ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। এইক্ষণে, ইংরাজ পক্ষ হইতে গোলাবর্ষণ, ঘোড়সওয়ারের অনুধাবন ও পদাতিকদিগের আক্রমণ একেবারে এক সঙ্গে আরম্ভ হওয়ায়, পেশোয়ার সৈন্য নিরুপায় হইয়া পড়িল। এই পরাজিত সৈন্যদলের পশ্চাতে, এক ক্রোশ অন্তরে, তাত্যাটোপের অধীনস্থ মুখ্য সৈন্যদল, বেটোয়া নদীর তীরে, জঙ্গল-প্রদেশমধ্যে অবস্থিত ছিল। অগ্রগামী সৈন্যদল পলাইয়া আসিতেছে দেখিয়া, তাহারা একেবারে হতাশ

হইয়া পড়িল। এদিকে সর্-হিউরোজ, তোপের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া, পদাতিকদিগের পৃষ্ঠানুসরণ করিলেন। তাত্যার সৈন্য, জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিয়া, যাহাতে ইংরাজেরা আর অগ্রসর হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। তথাপি সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ইংরাজ সৈন্য বেটোয়া নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তাত্যাটোপের গোলন্দাজেরা তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল কিন্তু তাহারা উচ্চ ভূমির উপর থাকায়, তাহাদিগের কোন ক্ষতি হইল না। পক্ষান্তরে, ইংরাজেরা যে গোলাবর্ষণ করিতেছিল, তাহাতে বিরুদ্ধ পক্ষের গোলন্দাজেরা নিহত হইতে লাগিল। তাহার পর, ইংরাজ অশ্বারোহী সৈন্য সজোরে হল্লা করিয়া আক্রমণ করায়, তাহারা বড় বড় ২৪।৩৬ পৌণ্ডের তোপ রণভূমির উপর ফেলিয়া পলায়ন করিল। এই সকল কামান অত্যন্ত ভারী বলিয়া, নদীতীরের বালুকার মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল; সুতরাং গোলা বারুদ প্রভৃতি উপকরণের সহিত এই সকল তোপ অনায়াসে ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। শুধু তাহা নহে, ১৬ মাইল পর্য্যন্ত পলাতক শত্রুদিগকে অনুধাবন করিয়া তাহাদের সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী ইংরাজেরা আপনার করিয়া লইল। এই বিজয়লাভে ইংরাজ সৈন্যমধ্যে মহা উল্লাস পড়িয়া গেল এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে, সেই পরিমাণে, দুঃখ, ভীতি ও নিরাশা এই তাপত্রয় আসিয়া উপস্থিত হইল। সংসারের গতিই এইরূপ!

"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।"

অথবা এ কথাও বলা যাইতে পারে;

"ক্রিয়াসিদ্ধি সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে।"

পল্লীগ্রামে রথযাত্রা।

চণ্ডীপুরের মুখুয্যেরা বনিয়াদী বড়লোক কিন্তু এখন তাঁহাদের ভগ্নদশা। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে তাঁহাদের প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত; সেকালে তাঁহাদের সদর দরজার সম্মুখ দিয়া কেহ পাল্কী চড়িয়া যাইতে সাহস করিত না, ওয়াট্সন কোম্পানীর কোন একজন সাহেব একবার পাল্কী হাঁকাইয়া যাইবার সময় বিশেষ অবমানিত হইয়াছিলেন। কোন অশ্বারোহী এই দরজার সম্মুখস্থ রাজপথে আসিয়া পড়িলে তাঁহাকে ঘোড়া হইতে নামিয়া তফাতে গিয়া ঘোড়ায় উঠিতে হইত। মুখুয্যে-বাবুদের পুরাতন ভৃত্যগণ সন্ধ্যার পর গ্রামের মধ্যে দুই একটা জায়গায় আড্ডা জমকাইয়া বসে এবং এই সকল কথা তুলিয়া সে কালের জন্য বিস্তর হা হুতাশ করে ও অনেক করিয়া তামাক পোড়ায়। পূর্ব্বকালের সেইসকল প্রতাপশালী মুখুয্যে-বাবুদের হীনপ্রভ, পূর্ব্বসম্পদ-গৌরবচ্যুত বংশধরগণ এখনও পুরাতন চাল একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই, গ্রামের মধ্যে কোন একটা দলাদলি বাধিলে তাঁহারা এক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক অপর দলকে অপদস্থ করিবার জন্য যথাযোগ্য আয়োজনে যৎপরোনাস্তি উৎসাহ প্রকাশ করেন; জোর কবিয়া গ্রামস্থ সাধারণ লোকের ভয় ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলে অনেকেই আপনাকে তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অপেক্ষা খাটো মনে করেন না।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে মুখুয্যে-বাড়ীতে বার মাসে তেরো পার্ব্বন হইত; পূজা পার্ব্বন উপলক্ষে গ্রামের কোন লোককে উনন জ্বালিতে হইত না, মুখুয্যে-বাড়ীতেই সকলে মহাসমারোহে লুচি মণ্ডার শ্রাদ্ধ করিত, ধুমধামের অবধি ছিল না—দুর্গোৎসবের সময় তাঁহাদের বাড়িতে

যে জাঁক হইত তাহা দেখিয়া একজন কবির দলের ওস্তাদ গাহিয়াছিল ঃ—

"সত্য যুগে সুরথ রাজা
করেছিলেন দেবীর পূজা
ত্রেতা যুগে রাম,
কলিযুগে বিশ্বনাথে
সদয় হলেন ভবানী,
হায় কি পুজোর ঘটা
চণ্ডীপুরে মহিষমর্দ্দিনী !"

মাতা কমলার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীপুরের মুখুয্যেবাড়ী হইতে এই সকল পূজাও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দোল ও রথের ঘটা আজও খুব বেশী। এই উৎসব মুখুয্যে পরিবারের একার সম্পত্তি নহে, ইহা গ্রামবাসীগণের সাধারণ সম্পত্তি। বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত গ্রামস্থ সকলেই এই উৎসব উপলক্ষে আনন্দে মগ্ন হয়।

অনেকদিন আগে মুখুয্যে-বাবুদের কাঠের রথ ছিল। একবার গ্রামে আগুণ লাগিয়া বহুসংখ্যক গ্রামবাসীর গৃহাদি দগ্ধ হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই কাষ্ঠরথখানিও ব্রহ্মার কুক্ষিগত হইয়াছিল। অর্থ এবং উৎসাহ, বোধ করি এ উভয়েরই অভাব বশতঃ আর কাঠের রথ নির্ম্মিত হয় নাই, তদবধি বৎসর বৎসর বাঁশের রথ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহবিগ্রহ গোবিন্দদেবের রথযাত্রার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হইতেছে।

দগ্ধাবশিষ্ট কাঠের রথের চক্রগুলি, দুইটি কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্ব, একটি সারথী এবং কয়েকটি কাষ্ঠপুত্তলিকা অগ্নিমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। প্রতিবৎসর তাহারা মুখুয্যে-বাবুদের চণ্ডীমণ্ড-

পের প্রান্তবর্ত্তী একটি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম করে; রথের সময় সেগুলিকে সেখান হইতে বাহির করা হইয়া থাকে, চক্রগুলি বংশরথে যুক্ত হয়, ঝুল ও ধুলায় আচ্ছন্ন অশ্বদ্বয়ের দেহ রঞ্জিত হয় এবং বর্ষব্যাপী তত্ত্বাবধানের অভাবে কিম্বা ছোট ছোট ছেলেদের উৎপাতে সারথী অথবা কোন পুত্তলিকার হস্ত পদ স্বস্থানচ্যুত হইলে সেগুলি মেরামত করিয়া, তাহাদের দাড়ি গোঁফ এবং মাথার চুল কালি দিয়া আঁকিয়া তাহাদিগকে রথে তুলিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

রথের দিন অতি সকাল হইতেই মুখুয্যে বাবুদের দেউড়ীর নীচে গোটাকত ঢাকঢোল এবং কয়েকখানি কাঁশি অতি উচ্চরবে আপনাদিগের আগমনবার্ত্তা এবং রথের উৎসবকাহিনী সমস্ত পল্লীর মধ্যে ঘোষণা করিতে থাকে।

মুখুয্যেদের ফাটা দেওয়ালবিশিষ্ট প্রকাণ্ড দেউড়ীটার সম্মুখে আজ কি সমারোহ! বহুদিনের রৌদ্রদগ্ধ, প্রাচীন, ক্লান্ত ধূসর দেওয়াল আষাঢ়ের নবীন জলধারায় শৈবালে আবৃত হইয়াছে; সম্মুখে প্রকাণ্ড আঙ্গিনা, সকাল হইতেই সেখানে ছোট ছেলেদের হাট বসিয়াছে। এবার সকালে সকালেই গোবিন্দদেব রথে উঠিতেছেন।

চারিজন ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সিংহাসন "পূজার দালান" হইতে রথতলায় বহিয়া আনিলেন, চারিজন বাহকের বয়স যেমন বিভিন্ন, তাঁহাদের আকার প্রকার এবং পরিচ্ছদের ভিন্নতা তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। গোবিন্দদেবের সিংহাসন তাঁহারা কাঁধে তুলিয়া বহিয়া আনিতেছেন, আর একদল লোক খোল করতাল বাজাইয়া "জয় গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন দয়াকর হে" বলিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছে, চারিধারে ছেলের দল মধ্যে মধ্যে 'হরিবোল' বলিয়া উঠিতেছে!

ঠাকুরকে রথে চড়ান হইল। পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সর্ব্বোচ্চ থাকে উপবিষ্ট হইয়া গোবিন্দের ক্ষুদ্র সিংহাসন ধরিয়া বসিলেন। রথের পাঁচটা চূড়া, প্রত্যেক চূড়ার উপর এক একটা শ্বেত চামর, চূড়াগুলি লোহিত বস্ত্র-মণ্ডিত, প্রধান চূড়ার নীচে একটা ছোট তালপাতার ছাতা গুপ্ত ভাবে অবস্থিত, পাছে রথ-চূড়া ভেদ করিয়া বর্ষার জলধারা গোবিন্দের মস্তকে পড়ে এই আশঙ্কায় এই প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

পাড়ার ছেলেরা কামিনী ফুলের গাছ, দেবদারুর পাতা, প্রস্ফুটিত কদম্বে পরিপূর্ণ কদম্বশাখা ভাঙ্গিয়া আনিয়া রথের আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং চারিদিকে পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমাল্য ঝুলি-তেছে। একটু বেলা হইলে ঠাকুরের বাল্যভোগ আসিয়া উপস্থিত হইল; লুচি, মোহনভোগ, সন্দেশ, ক্ষীর, ছানা, আম কাঁঠাল প্রভৃতি দ্রব্য এক একটা পাত্রে রাখিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া রথের সম্মুখে দাঁড়াইল। ভোগ আসিতে দেখিয়া চারিদিকে ভারি একটা কলরব উঠিল; "ভোগ আন্‌চে, বাজে লোক সব তফাৎ" বলিয়া দুই চারি জন লোক হুহুঙ্কার ছাড়িল, অনেকেই সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল।

ভোগের জন্য যে সকল জিনিষ আনীত হইল, বাদকগণ দুই হাত শূন্যে তুলিয়া তাহা উঁচু করিয়া ধরিল। পুরোহিত ঠাকুর গোবিন্দদেবের কাছে বসিয়াই ঊর্দ্ধ হইতে সেগুলি ঠাকুরকে নিবে-দন করিয়া দিলেন, নিবেদনকালে পুরোহিতহস্তনিক্ষিপ্ত দুই চারিটা তুলসীপত্র রেকাবে আসিয়া পড়িল, দুই একটা ফুল পথ ভুলিয়া রেকাবধারী একজনের মাথার উপর পড়িয়া তাহার দীর্ঘ টিকির পাশ দিয়া গড়াইয়া গেল। ঢাক ঢোল ও কাঁশি জোরে জোরে বাজিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে নীলাম্বরী পরা তাহার উপর

লাল চাদর বা রুমাল জড়ানো ছোট ছোট ছেলেরা আনন্দভরে নাচিতে লাগিল।

দুপুরের সময় রথতলায় বেশী লোক থাকে না। কেবল দুই চারিজন দোকানদার সহচরবর্গের সাহায্যে অস্থায়ী দোকান বাঁধিবার উদ্যোগ করে। এবং পাড়ার দুই একটা দুষ্টছেলে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে আসিয়া মধ্যাহ্ননিদ্রাকাতর ঢাকিদিগের ঢাকে সজোরে দুই চারিটা বাড়ি মারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালায়।

কিন্তু বেলা যত শেষ হইয়া আসে রথতলায় জনকোলাহল ক্রমেই তত বাড়িতে থাকে। বেলা চারিটা বাজিতে না বাজিতে রাজ-পথের দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ পল্লীবাসী—বালকবালিকা হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই রথতলার দিকে অগ্রসর হয়। ছোট ছোট ছেলেদের ট্যাঁকে—মেয়েদের আঁচলে দুই চারিটি পয়সা বাঁধা, মা বাপের কাছে পার্ব্বনি আদায় করিয়া তাহার রথ দেখিতে যাই-তেছে। কাহারো পরনে সদ্য-ধৌত কাপড়, গায়ে চককাটা পিরাণ, তাহার উপর কোঁচানি চাদর। কেহ নূতন বস্ত্র ও চাদর মণ্ডিত হইয়া চলিয়াছে; পল্লীরমণীগণ নদীতীরস্থ বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী নিভৃত পথ দিয়া রথ দেখিতে যাইতেছে, পথপ্রান্তে কচিৎ কোন পুরুষ সম্মুখে পড়িলেই তাহারা অবগুণ্ঠন টানিয়া সলজ্জ অবস্থায় ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে, পথিক দূরে চলিয়া গেলেই অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া স্বাধীন আলাপে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং এই সংকীর্ণ বনপথ তাহাদের চঞ্চল পদবিক্ষেপে ও তরল কৌতুকহাস্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

ক্রমে রথতলা হইতে আরম্ভ করিয়া অদূরবর্ত্তী বাজারে পর্য্যন্ত লোক পরিপূর্ণ হইয়া গেল,—পথের দুইপাশে সদ্যনির্ম্মিত দোকান-শ্রেণী। ময়রার দোকানে পিতলের থালে মণ্ডা, গোল্লা, মেঠাই,

তেলেভাজা ছোটছোট জিলিপী এবং ধামীতে স্তুপাকারে মুড়কী সজ্জিত। চাষার ছেলেরা দোকানের চারিধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেহ এক পয়সার চারিখানি ছোট ছোট জিলিপী কেহ আধপয়সার মুড়কী কিনিয়া কোঁচড়ে পুরিয়া লইয়া যাইতেছে। পথের যেখানে সেখানে কুমারেরা চিত্রি করা ছোট ছোট ঘট, মাটির ছোবা, পুতুল এবং হাঁড়ি বিক্রয় করিতেছে; অনেক স্ত্রীলোক একত্র হইয়া কেহ ছেলেদের জন্য পুতুল কিনিতেছে, কেহ ছোবা পছন্দ করিতেছে, কেহ হাঁড়ি দর করিয়া তাহা ভাঙ্গা কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য বাজাইয়া দেখিতেছে। একটা বড় বটতলার ছায়ায় তিন চারিখানা ছোট ছোট মনোহারীর দোকান বসিয়াছে সেখানেও ক্রেতার সংখ্যা কম নহে, কেহ দেশলাইএর বাকস কিনিতেছে, কেহ কাঠের চিরুণীর দর করিতেছে, কাহারো ছেলে একটা টিনের বাঁশি লইবার জন্য আবদার আরম্ভ করিয়াছে। একটি বারো তেরো বৎসরের মেয়ে একটা দোকানে বসিয়া বেলোয়ারী চুড়ি পরিতেছে, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত, কেবল ক্ষুদ্র হাতখানি বাহির করিয়া দিয়াছে আর দোকানদার কালো বেলোয়ারি কাচের চুড়ি বাহির করিয়া সেই কোমল করপল্লব নিপীড়ন পূর্ব্বক তাহাতে পরাইয়া দিতেছে, হাতে চুড়ি উঠিতেছে না, তথাপি ক্রমাগত ঠেলিয়া দিতেছে, যন্ত্রণায় এক একবার সে অধীর হইয়া উঠিতেছে, দোকানদারের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই; বালিকার পার্শ্ববর্ত্তী বর্ষীয়সী রমণীর হৃদয় আরো কঠিন, সে বলিতেছে "কিরকম চুড়ি দিচ্ছ গো, হাত কেটে কেটে চুড়ি উঠবে তবে ত হাতে মানাবে।"

রথতলার আর একদিকে পিয়ারা, কাঁঠাল, কলা, আনারস প্রভৃতি ফলের এবং পটোল, ঝিঙে, উচ্ছে, কাঁচকলা প্রভৃতি তর-

কারীর দোকান। মেছুনীরা সারি দিয়া বসিয়া ঝুড়ির উপর ডালা সাজাইয়া তিনগুণ লাভে পচা ইলিশ মাছ বিক্রয় করিতেছে; মাছগুলি একেবারে পচিয়া গিয়াছে, দুর্গন্ধে সেদিকে যাওয়া কঠিন কিন্তু ক্রেতার অভাব নাই, ইতর লোকের কথাদূরে থাক, দূরবর্ত্তী পদ্মাতীর হইতে আনীত এই সকল পচা ইলিশ অধিকদামে কিনিতে গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগেরও আপত্তি নাই, পটোল এবং কাঁঠালের বীচি সংযুক্ত পচা ইলিশের 'ঝুরি' তাঁহাদেব নিকট রসনেন্দ্রিয়ের পরম-তৃপ্তিকর সুস্বাদু ব্যঞ্জন, তবে তাহা পাকযন্ত্রের কতদূর অনুকূল বলা যায় না।

মালীরা শোলার পাখী, পুতুল, পালকী প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, কামারের দোকানে ছোট ছোট ছুরী, কাস্তে, কাটারী ও বঁটি প্রভৃতি অস্ত্র বিক্রয় হইতেছে ইস্পাতের সঙ্গে সেই সকল অস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যে মূল্যে তাহা বিক্রীত হইতেছে তাহাতে অধিক গঠনপারিপাট্যের আশা করা যায় না।

রথতলার একপাশে 'মালামো' করিবার 'আড্ডা' হইয়াছে। অনেকখানি সমতল জায়গা বাঁশ দিয়া ঘেরা। চণ্ডীপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যে সকল চাষার শারীরিক বল অধিক এবং যাহাদের কুস্তি করিবার অভ্যাস আছে, তাহারা আজ পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে 'কুস্তি' লড়িতে আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট চারি পাঁচজন করিয়া পৃষ্ঠচর। গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা "কুস্তি" দেখিবার জন্য ঘেরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চারিদিকে অসংখ্য চাষা। দুইজন বলিষ্ঠ যুবক কুস্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘেরের ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মসলা চিবাইতে চিবাইতে এবং ধুলোপড়া দিয়া বাহুদ্বয় ডলিতে ডলিতে সমগ্র দর্শক-বৃন্দের উপর তাহারা এমন সগর্ব্বদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ঘুরিয়া বেড়া-

ইতে লাগিল যেন আজ তাহারা বিশ্বসংসারের কিছুমাত্র 'তোয়াক্কা' রাখে না।

যুবকদ্বয় তাল ঠুকিয়া উরুদেশে দুই চারিবার চপেটাঘাত পূর্ব্বক ঘাড় ঈষৎ নোয়াইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিবার চেষ্টায় 'মাল-খানার' মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া হঠাৎ একজন অপরের বামহস্তখানি চাপিয়া ধরিতেই সে তাহার দক্ষিণ-হস্তে প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া তাহার পায়ের মধ্যে পা বাধাইয়া দিল। তখন উভয়ের মধ্যে হস্তে হস্তে, পদে পদে, বক্ষে বক্ষে প্রবল যুদ্ধ চলিতে লাগিল, দর্শকগণ নিশ্বাস রোধ করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে শেষফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পরে একজন অন্যকে শূন্যে তুলিয়া কাত করিয়া ফেলিয়া দিল! আর চারিদিক হইতে অমনি চটাপট্ হাততালি পড়িয়া গেল, একসঙ্গে অনেকে বলিয়া উঠিল "বাহা তুষ্টু বেশ, বলিহারী ওস্তাদি!" দর্শকবৃন্দের মধ্যে তুষ্টুর বল ও কৌশলের সমালোচনা আরম্ভ হইল; কেহ বলিল "আরে আমি—বরাবরই জানি তুষ্টুর সঙ্গে ঝড়ু পারবে না, তুষ্টু জওয়ানটা কি কম?"—আর একজন বলিল "ঝড়ু থামকা পারবে? তুষ্টুর কত গুণ জ্ঞান জানা আছে তার কিছু খবর রাখিস্?"—তুষ্টুর চাচাতো ভাই সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল "এ বাঙ্গলা মুল্লুকে ভায়ের ওস্তাদের মত ওস্তাদ কটা আছে! এমনি ওসুদ ওর ঠাঁই আছে যে মালামোর সময় হেঁসো দিয়ে কোপ মাল্লেও তা ওর গায়ে বিঁধবে না।" যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তুষ্টু একজন দর্শকের কাছ হইতে একখানি চাদর শিরোপা পাইল, সে তৎক্ষণাৎ তাহা মাথায় বাঁধিয়া নত মস্তকে শিরোপাদাতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া উঠিল। দ্বন্দযুদ্ধে ঝড়ু

পরাস্থ হওয়ার পর তাহার গ্রামস্থ চাষার দল বলিয়া উঠিল, তুষ্টু অন্যায় করিয়া ঝড়ুকে ফেলিয়া দিয়াছে; তাহারা সকলে একত্র হইয়া তুষ্টুর উপর রুখিয়া আসিল, কি হয় দেখিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন তুষ্টু সেই প্রমথ্যমান সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল জনস্রোতকে লক্ষ্য করিয়া তাল ঠুকিয়া বলিল—বীরের পুত্র বীর কে আছে—আসুক—সে তাহারই সঙ্গে লড়িবে। মাথার ঝাঁকড়া চুল নাড়া দিয়া, বুক ফুলাইয়া, রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় কপালে তুলিয়া তুষ্টু যখন বীরমদে রঙ্গভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল তখন তাহাকে একটা দুর্ম্মদ দৈত্যের ন্যায় বোধ হইল। ঝড়ু আবার তাহার সঙ্গে কুস্তী আরম্ভ করিল, এবারও তুষ্টু তাহাকে মাথার উপর তুলিয়া তিন হাত দূরে ফেলিয়া দিল। তুষ্টুর দলস্থ লোকেরা আসিয়া তাহার বক্ষস্থলে করাঘাতপূর্ব্বক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, চারিদিকে ঘোর কলরব উত্থিত হইল।

কিন্তু আজ চাঁদপুরের (ঝড়ুর গ্রামবাসী) চাষারা জোট বাঁধিয়া আসিয়াছে; তাহারা তুষ্টু ও তাহার দলের সঙ্গে বিবাদ বাধাইবেই। সামান্য কথা লইয়া দুই পক্ষে বচসা আরম্ভ হইল, তাহার পর লাঠি চলিতে লাগিল। কয়েকজন ভদ্রলোক মধ্যে পড়িয়া গোল মিটাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু লাঠির সঘন আস্ফালন দেখিয়া তাঁহাদিগকে হটিয়া আসিতে হইল। অবশেষে দুই জন কনেষ্টবল মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধিয়া হস্তস্থিত অনতিদীর্ঘ রুল ঘুরাইতে ঘুরাইতে যখন হাঙ্গামার মধ্যে প্রবেশ করিল তখন বিবাদ থামিয়া গেল, যাহারা লাঠি চালাইয়াছিল তাহারা সরিয়া পড়িল। নিরপরাধ কয়েকজন চাষাকে লইয়া কনেষ্টবল সাহেবেরা টানাটানি করিতে লাগিল।

এদিকে রথ টানিবার সময় হইয়াছে। ঢাকে ও ঢোলে কাঠি

পড়িবামাত্র, সমস্ত লোক চারিদিক হইতে রথের কাছে ছুটিয়া আসিল। দুই গাছি খুব মোটা কাছি রথের কাছে পড়িয়া ছিল, ষাট সত্তর জন লোক তাহা ধরিয়া টানিতে লাগিল; রথ হেলিতে দুলিতে রাজপথের দিকে অগ্রসর হইল। রাজপথে উঠিলে সকলে তাহাকে বাজারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল, মুহুর্মুহু 'হরিবোল' শব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া গেল। রথ চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে থামিলে চারিদিক হইতে গোবিন্দদেবের উদ্দেশে পানের বিড়া, সুপারী, বাতাশা, পাকা কলা, রথের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সেগুলি নীচে ছড়াইয়া পড়িলে চাষার ছেলে মেয়ের মধ্যে মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়, জনসঙ্কুল রাজপথের ভীড় ঠেলিয়া সেগুলি তাহারা কুড়াইয়া অঞ্চলপূর্ণ করে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রথের নিম্নতম থাকে বসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আমোদ ভোগ করিতেছে; যতই জোরে জোরে ঢাক বাজে--রথ দ্রুত চলিতে চলিতে যত বেশী দোলে, ততই তাহারা বাঁশের খুঁটা দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া হাসে এবং হর্ষভরে পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে; প্রতি মুহূর্ত্তে পড়িয়া যাইবার একটা প্রবল ভয়, তাহার উপর এমন একটা গভীর আমোদ, এই সকল চপলচিত্ত বালক বালিকা ইহা কিছুতেই ত্যাগ করিতে সম্মত নহে; একটা উন্মাদকর উদ্দীপনায় তাহাদের কোমলবক্ষ স্পন্দিত হইতেছে এবং যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ে তাহাদের কচি মুখ লাল হইয়া উঠিতেছে।

রাজপথের উপর দিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ ঘুরিয়া রথ আবার স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। ময়রার দোকান কতক কতক উঠিয়া গিয়াছে, দর্শকগণ ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিতেছে এবং জনস্রোত ক্রমে বিরল হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু এখনো পান-

বিক্রেতার দোকানে খদ্দেরের অভাব নাই, পানবিক্রেতাগণ সাদা বোতলে লাল, নীল নানা রঙ্গের জল পুরিয়া ছোট ছোট শিশি, কাচের ডিস্, কাঁশার রেকাবী প্রভৃতিতে মসলা রাখিয়া দোকানখানি বেশ সাজাইয়াছে, উৎসব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তথাপি তাহারা ঘন ঘন হাঁকিতেছে "চার চার খিলি এক পয়সায়,চাই বাবু, মসলাদার গোলাপী খিলি!" চাষার দল পয়সা ফেলিয়া মুঠা করিয়া পান কিনিতেছে, আর তাহা চিবাইতে চিবাইতে পানের পিকে শ্বেতদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া অদূরবর্ত্তী নাগরদোলার উপরে চড়িয়া বন্ বন্ করিয়া 'পাক' খাইতেছে। এক এক পয়সায় কুড়ি পাক - অনেকের এক পয়সার 'পাক' খাইয়াও তৃপ্তি হইতেছে না, কুড়ি পাক ঘুরাইয়া আসে, 'নাগরদোলার' গতি মন্দ হয়, আবার চাৎকার করিয়া বলে 'আর এক পয়সা'। নাগরদোলা আবার সবেগে ঘুরিতে থাকে।

রথতলায় রথ আসিয়া থামিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঠাকুরের বৈকালি ভোগের ব্যবস্থা আছে। সকালের ন্যায় সন্ধ্যাকালেও ব্রাহ্মণগণ ভোগ লইয়া রথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুরোহিত ঠাকুর পূর্ব্ববৎ তাহা দেবতাকে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

রথের দিন প্রতিবৎসরই বৃষ্টি হয়, আজ এতক্ষণও বৃষ্টি হয় নাই, ভয়ানক গরম, 'গুমট' যাহাকে বলে তাহাই হইয়াছে, আকাশে যথেষ্ট মেঘেরও অভাব নাই। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে অল্প বাতাস ও মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাহাদের ছাতা ছিল, তাহারা ছাতা মাথায় দিয়া চলিল, অনেকে চাদর মুড়ি দিয়া ছুটিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা ছোট ছেলেদের লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল; ছেলে কোলে করিয়া দৌড়িতেও পারে না, দাঁড়াইয়া ভিজাও কষ্টকর; কয়েক পদ দ্রুতবেগে যায়, আবার

শ্রমভরে গতি মন্থর হইয়া আসে। গোবিন্দকে যথারীতি ভোগ নিবেদন করিবারও অবসর হইল না, সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে রথ হইতে নামাইয়া গৃহে লইয়া গেল।

দশমিনিটের মধ্যে রথতলা জনহীন হইয়া পড়িল—চারিদিক অন্ধকার—বায়ুর সন্ সন্ শব্দ, মেঘের গর্জ্জন আর অশ্রান্ত বারি বর্ষণ। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যেখানে বহুসংখ্যক নরনারী মহোৎসবে সমবেত হইয়াছিল এবং হর্ষকলরবের বিরাম ছিল না, এখন সেস্থান নির্জ্জন, গম্ভীর, বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত মেঘমন্দ্রমুখরিত নববর্ষার অবিরল ধারায় সিক্ত। শুধু দেবপরিত্যক্ত গৌরববিচ্যুত বংশরথ মেঘমণ্ডিত আকাশতলে নিঃশব্দে ভিজিতেছে আর দেউড়ীর নীচে ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর বসিয়া ঢাকিরা ঢাক বাজাইতেছে, বায়ু ও বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশিয়া এই ঢক্কাধ্বনি এক অব্যক্ত সুন্দর রহস্যপূর্ণ শব্দ-সমস্বর সৃজন করিতেছে এবং সেই শব্দে গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র কুটীরের ম্লানদীপালোকে মাতার নিবিড় স্নেহময় ক্রোড়বিন্যস্ত নববস্ত্রপরিহিত উৎসবপ্রত্যাবৃত্ত শিশুর কজ্জলরাগরঞ্জিত কোমল নয়নপল্লবে নিদ্রা ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহার দুষ্টু দিদির চক্ষে ঘুম নাই, সে তাহার নবক্রীত দোলার ডুলীখানি, টিয়ে পাখীটা এবং ছোবা দুটি লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, সে তাহার বিছানা হইতে মিনিটে মিনিটে উঠিতেছে, নিজের অভিলষিত স্থানে সেগুলি সযত্নে সাজাইয়া রাখিতেছে, আবার যখনই আশঙ্কা হইতেছে খোকার ঘুম ভাঙ্গিলেই সে তাহার ক্ষুদ্র হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহার সাধের খেলানাগুলি অধিকার করিয়া বসিবে, তখনই উঠিয়া আর একটা জায়গায় সেগুলি রাখিয়া আসিতেছে।

নূতন শব্দ সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় সমালোচনা।

জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য, জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মস্থান। দুই বিভিন্ন জাতির মধ্যে যখন ভাষা ও সাহিত্যের যোগ নিবদ্ধ হয়, তখনই তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত সহৃদয়তা ও সখ্যতার সূত্রপাত হয়। বিশেষতঃ, যে দুই ভাষা একই জননী হইতে প্রসূত, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যখন এইরূপ সম্মিলন সংঘটিত হয়, তখন হৃদয়ের আনন্দ যেন আরও প্রবলবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠে;—শুধু সখ্যতা নহে, সহৃদয়তা নহে—তখন অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবে পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। এই জন্যই আমরা বলি, আমাদের পরস্পরের দেশ-ভাষা অনুশীলন করাই আমাদিগের রাষ্ট্রীয় একতা সম্পাদনের একটি মুখ্য উপায়। সৌভাগ্যের বিষয়, এইরূপ অনুশীলন আজকাল অল্পস্বল্প আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি, "জ্ঞানপ্রকাশ" নামক মহারাষ্ট্রীয় সপ্তাহ-দ্বিবারিক সংবাদপত্রে "সাধনা"-প্রকাশিত "মারাঠি ও বাঙ্গলা" এই প্রবন্ধোল্লিখিত নূতন-শব্দ রচনা সম্বন্ধে একজন মহারাষ্ট্রীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করিবেন। মহারাষ্ট্রীয় লেখকমহাশয় বলেন—

"......কোন বাঙ্গালী লেখক, সাধনা নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্রের বৈশাখ মাসের সংখ্যায় "মারাঠী ও বাঙ্গলা" এই দুই ভাষায় সাম্য ও বৈষম্য তুলনা করিয়া কতকগুলি শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। আমাদের ন্যায়, বাঙ্গলা ভাষাতেও শব্দ সম্বন্ধে অভাব ও প্রতিবন্ধকতা লক্ষিত হয়। ইংরাজদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য উদ্যোগ ও পাশ্চাত্য চিন্তার যে বন্যা আসিয়াছে, তাহাতে করিয়া, সেই

সকল উদ্যোগ সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দ ও সেই সকল চিন্তা-প্রকাশক বিশেষ শব্দের প্রতিশব্দ সকল রচনা করা সকলেরই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কি বাঙ্গালী, কি গুজরাটী, কি মারাঠী সকল জাতিরই কথন ও লিখনে, শব্দের অভাব বড়ই অনুভূত হয়। এক্ষণে, বাঙ্গলা ভাষায়,নূতন শব্দ রচনা সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে এবং বঙ্গদেশে "সাহিত্য পরিষদ" নামক সভা স্থাপিত হওয়ায় ভাষা-সংশোধন ও গ্রন্থসংবর্দ্ধনার্থ প্রযত্ন আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা, গুজরাটী কিম্বা মারাঠী, যে কোন ভাষাই হউক না, নূতন শব্দ রচনা করিতে হইলে সকলেরই সংস্কৃত-ভাণ্ডারের উপর বরাত পাঠাইতে হয় এবং তিন ভাষার মধ্যেই যে নূতন শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে শতকরা নিরেনব্বুই অংশ কেবল সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন এরূপ বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বাঙ্গলা ভাষার তো কথাই নাই। বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে (ইংরাজি শব্দ বজায় রাখা ছাড়া) যে নূতন শব্দ পাওয়া যায়, তাহার শতকরা একশত অংশ সংস্কৃত বলিলেও চলে। এই ভাষা অত্যন্ত সহজ হওয়ায়, ঐরূপ সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ ভিন্ন উহার গত্যন্তর নাই, ইহা তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এক্ষণে কেবল বিচার্য্য এই—সংস্কৃত হইতে আমরা যে শব্দ গ্রহণ করি, তাহা সংস্কৃতের প্রচলিত অর্থে যথাযথরূপে গ্রহণ করা হইবে, কি, তাহাতে আমাদের ইচ্ছা-মত অর্থ যোজনা করা যাইবে? বাঙ্গালীরা, কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ, বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ অর্থে ব্যবহার করেন, যাহা সংস্কৃতের প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য অধিক দূর যাই-বার প্রয়োজন নাই। উপরে আমি বলিয়াছি, বঙ্গদেশে "সাহিত্য পরিষদ্" নামক এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই নামের প্রথম "সাহিত্য" শব্দটি বাঙ্গলা ভাষায় "লিটরেচর"এর অর্থে প্রয়োগ হইয়া

থাকে। সাহিত্য শব্দের মূল অর্থ দেখিতে গেলে, উহা "লিটরেচর" অর্থে কখনই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। "সাহিত্য-পদ্যাত্মক কাব্য" এইরূপ বাচস্পতি লিখিয়াছেন। সংস্কৃত-ইংরাজি শব্দকোষে দেখা যায়, "সাহিত্য" অর্থে "রেটরিক্"। এই অর্থই ঠিক্। সাহিত্য শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় আজকাল "লিটরেচার" অর্থাৎ সর্ব্বগ্রন্থ-সংগ্রহ, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "সাহিত্য সঙ্গীত কলা বিহীন"—এই স্থলে সাহিত্যের অর্থ কাব্য; যদি বেশি দূর লইয়া যাওয়া যায়, তবে, ইংরাজি ও ফরাসীতে যাকে "বেল্ লেটর্স্" ও ও "আর্টিষ্টীক্ লিটরেচর" বলে, শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। মারাঠী ভাষায় এই অর্থে "সাহিত্য" শব্দের প্রয়োগ হইলে ভাল হয়। কেবল ঐ শব্দ, "লিটরেচর'এর সাধারণ ও বিস্তৃত অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে না। লিটরেচরের কেবল আংশিক অর্থের মধ্যেই যদি সাহিত্য শব্দকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সাধারণ লিটরেচরের প্রতিশব্দে মারাঠী ভাষায় কি হইতে পারে? এক্ষণে এই প্রশ্নটি মীমাংসা করা আবশ্যক। এই ইংরাজি শব্দের তিনটি প্রতিশব্দ আজকাল, মারাঠী ভাষায় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, (১) গ্রন্থসংগ্রহ (২) সারস্বত (৩) বাঙ্ময়। "নিবন্ধমালা" গ্রন্থে অনেকবার "গ্রন্থ সংগ্রহ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু "লিটরেচর" শব্দের সকল অর্থ ঐ শব্দের মধ্যে আইসে না। "ন্যাশা-ন্যাল লিটরেচর্"এর ভাষান্তর—"রাষ্ট্রীয় গ্রন্থসংগ্রহ" কথাটি সুন্দর; কিন্তু, "কংগ্রেস্-লিটরেচর"এর ভাষান্তর "রাষ্ট্রীয় সভায় গ্রন্থসংগ্রহ" কি বুঝায়? "গ্রন্থ" শব্দে একটু বড় রকমের ব্যাখ্যা মনে হয় এবং "সংগ্রহ" শব্দেরও আর এক অর্থ মনে আইসে। আর এক শব্দ "সারস্বত", এই শব্দটি রাজারাম শাস্ত্রীর রচনা; এই শব্দটি বেশ, কিন্তু প্রচলিত হইবার পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক আছে। একতো,

সারস্বতের আজকাল একটি বিশেষ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই শব্দে ত্বরিত অর্থ বোধ হয় না। আমার মতে "বাঙ্ময়" শব্দটি বেশ সুন্দর। উহার মধ্যে, কি কথিত কি লিখিত, দুই প্রকার লিটরেচরেরই সমাবেশ হয়। এই শব্দ প্রচলিত হইবার পক্ষে একটিমাত্র প্রতিবন্ধক আছে মনে হয় সেটি উচ্চারণের অসুবিধা।

সাধনা-লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এডিশন" শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ "সংস্করণ" ইহা ভাল-না, মারাঠী প্রতিশব্দ "আবৃত্তি" ইহা ভাল? আমার মতে, বাঙ্গালী-রচিত প্রতিশব্দটিই বিশেষরূপে ভাল। কারণ, কোন লেখা হইতে অল্প-স্বল্প দোষ সংশোধন করিয়া, দুর্ব্বোধস্থলে টিপ্পনীর দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সুবোধ করিয়া, লেখাটি প্রস্তুত করাকেই "এডিট্" করা বলে; সুতরাং ইহাকে "সংস্কার করা" বলা যাইতে পারে। ...... আমাদের "আবৃত্তি" শব্দ "রিপ্রিণ্ট্" শব্দের সুন্দর প্রতিশব্দ। এই শব্দের দ্বারা সংশোধনের কোন কল্পনা মনে আইসে না। এইরূপ, "এডিটর" এই শব্দের প্রতিশব্দ বাঙ্গলা ভাষার "সম্পাদক"; এই শব্দটি অল্পে অল্পে, মারাঠী ভাষার মধ্যেও প্রয়োগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমার মতে, "সংস্কারক" শব্দটি "এডিটর" অর্থে এবং "সম্পাদক" শব্দটি "কম্পাইলার" অর্থে প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। "সম্পাদক" শব্দের অর্থ—"একস্থানে একত্র করিয়া রাখা"। ইহার মধ্যে "এডিটর" শব্দের সর্ব্বার্থ আইসে না; কেবল "কম্পাইলর" শব্দের অর্থ উহার মধ্যে উৎকৃষ্টরূপে আইসে। "এডিটরের কাজ লেখা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা—শুধু লেখা সংগ্রহ নহে—ঐ সকল লেখা সংশোধন করিয়া স্বীয় পত্রের উদ্দেশ্যানুযায়ী তাহাতে একটা স্বতন্ত্র স্বরূপ বিধান করা;—এই অর্থ,

"সম্পাদক" শব্দের মধ্যে আইসে না। এই অর্থে, "সম্পাদক" শব্দ অপেক্ষা "সংস্কারক" শব্দ উৎকৃষ্ট। কিন্তু এই "সংস্কারক" শব্দ বাঙ্গালীরা, এবং "সুধারক" শব্দ মারাঠীরা "রিফরমর" অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

"প্রোগ্রাম"-অর্থে "অনুক্রম-পত্র", এ শব্দটি ভাল নহে, ইহা অপেক্ষা "কার্য্যানুক্রম" কিম্বা "কার্য্যপত্র" উৎকৃষ্ট। সাধনার লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "অনুক্রমণিকা" কি এই অর্থে চলিতে পারে না?—না পারার পক্ষে বিলক্ষণ কারণ দেখা যায়। "অনুক্রমণিকা" এই শব্দটি "টেবল্ অফ্ কণ্টেণ্ট্স্" এই অর্থে কাত্যায়ন হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহার অর্থবিপর্য্যয় করিবার কোন কারণ নাই।

সাধনা-লেখক বলেন, "ভিজিটর"-অর্থে মরাঠী ভাষায় "প্রেক্ষক" শব্দ ব্যবহৃত হয়—কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে; "স্পেক্‌টেটর"-অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।......

"কর্ম্মনুক" নামক মরাঠী পত্রে, কতকগুলি ইংরাজি শব্দের প্রতিশব্দ কি হইতে পারে, জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তন্মধ্য হইতে দুই একটি শব্দের আলোচনা করা যাইতেছে। উহার প্রথম শব্দ "পলিটিক্স্"। আমাদের ভাষায় এই শব্দের সর্ব্বথা-যোগ্য প্রতিশব্দ দেখা যায় না। পুরাকালে "দণ্ডনীতি" এই শব্দটি ছিল, পরে, "রাজনীতি"—"রাজধর্ম্ম" এই সকল শব্দ ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু "পলিটিক্স্"-এর ঠিক্ প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন। "পলিস্" এই গ্রীক শব্দ হইতে "পলিটিকস্" শব্দের ব্যুৎপত্তি। "পলিস্"-শব্দের অর্থ নগর। কিন্তু নগর-শব্দে যে অর্থ প্রকাশ হয়, তাহা অপেক্ষা "পলিস" শব্দের অর্থ বিস্তৃত। "নগর' শব্দে, ল্যাটিন অর্বস্ শব্দের ন্যায়, গ্রাম্য শব্দের উল্টা বুঝায়; কিন্তু "পলিস্"

এই শব্দে "পলিস"-অধিবাসীদিগের স্বত্তাধিকারের কল্পনা আইসে। সর্ব্বপ্রকার সার্ব্বজনিক কার্য্যে, "পলিস"-অধিবাসীদিগের মত প্রভৃতি দিবার অধিকার ছিল বলিয়া, "পলিস"-অভ্যন্তরস্থ ব্যবস্থার নাম, পরে "পলিটি" হয়। ল্যাটিন "অর্ব্‌স্" কিম্বা সংস্কৃত "নগর"-এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে সেরূপ কোন অধিকারের ভাব দেখা যায় না। এই জন্য, "অর্ব্‌স্" হইতে উৎপন্ন "অর্ব্যানিটি" এবং "নগর" হইতে উৎপন্ন "নাগরিকতা" এই উভয় শব্দেই, "ভদ্রতার নিয়মাভিজ্ঞতা" —"লোকব্যবহারজ্ঞতা" এই অর্থ প্রকাশ পায়। "পলিস"-শব্দে রাজ্যব্যবস্থা সম্বন্ধীয় বিশেষ অর্থ থাকায়, তাহা হইতে "পলিটিক্‌স্" এই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, ইহাতে "দণ্ডনীতি" কিম্বা "রাজনীতি" এই অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরাজি ভাষার মজা এই, তাহাতে শব্দের কোন অভাব পড়িলেই, ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ এই দুই ভাণ্ডার-গৃহের উপর বরাত পাঠাইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। তার সাক্ষী দেখ না কেন; "অর্ব্‌স্" ও "পলিস্" এই উভয় শব্দেরই অর্থ নগর, কিন্তু উভয়েতেই দুই বিভিন্ন বিশেষ অর্থ থাকায়, উভয় হইতে দুইটি স্বতন্ত্র বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ রচনা করিতে পারা গিয়াছে। "অর্ব্‌স্" "অর্ব্যানিটি"। "পলিস"—"পলিটি"—"পলিটিক্‌স্"। দুই শব্দের মধ্যে কতটা তফাৎ দেখ। যাহা হউক, এই সমস্ত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, "পলিটিক্‌স্" শব্দের সমগ্র অর্থ ভাবিয়া দেখিলে, আমাদিগের "দণ্ডনীতি" কিম্বা "রাজনীতি" ইহার মধ্যে কোন শব্দই উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। "নীতি" এই শব্দের মধ্যে, আজকাল, মারাঠী ভাষায় একটি বিশেষ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। এবং "রাজ" শব্দেও "পলিটিক্‌স্ এর অর্থ নাই। আজ কাল আমরা "রাষ্ট্র" শব্দ "নেশন্"-অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ইহার সহিত কোন

শব্দ যোগ করিয়া, "পলিটিক্‌স্‌"-এর অর্থে, কোন নূতন শব্দ রচনা করিলে মন্দ হয় না।"

মহারাষ্ট্রীয় লেখক মহাশয়ের সমালোচনা সম্বন্ধে মোটামুটি বক্তব্য এই, আমাদের মতে, যে কোন শব্দ, কোন ভাষার মধ্যে, একবার বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা পরিবর্তন করিয়া নূতন শব্দ রচনা করা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। এই জন্য, সাহিত্য-শব্দের মূল অর্থ যাহাই হউক না, আমরা "লিটরেচর"—অর্থেই উহার প্রয়োগ করিতেছি এবং বরাবর তাহাই করিব। কিন্তু এই বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র; কেন না, লিটরেচর অর্থে এখনও কোন শব্দ তাঁহাদের ভাষায় বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই। এখনও দুই তিনটি শব্দের মধ্যে যুঝাযুঝি চলিতেছে। লেখক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক্; "লিটরেচর"—অর্থে যে তিনটি শব্দ মারাঠী ভাষায়, আজকাল চলিতেছে, তন্মধ্যে, উচ্চারণের অসুবিধা না থাকিলে, "বাঙ্ময়" শব্দটিই উৎকৃষ্ট। মারাঠীভাষায় আজকাল "গ্রন্থসংগ্রহ" এই শব্দটিরই অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "সংগ্রহ" বলিলে সঙ্কলন করা বুঝায়—অন্ততঃ বাঙ্গলা ভাষায় তো আমরা এইরূপ বুঝি, মহারাষ্ট্রীয়েরা "সংগ্রহ" শব্দে ঠিক্ কি বুঝেন, আমরা বলিতে পারি না। কেন না, একই সংস্কৃত শব্দ দুই ভাষায় বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "গ্রন্থ" শব্দ যদি নিতান্তই রাখিতে হয় তবে, "গ্রন্থ-সংগ্রহ" অপেক্ষা বরং "গ্রন্থ-ভাণ্ডার" এই শব্দ অধিক উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সকল শব্দের দোষ এই, উহা হইতে "লিটরারি" এই শব্দ সূচক বিশেষণ-পদ সহজে রচনা করা যায় না।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার আদর্শস্থানীয় প্রসিদ্ধ "নিবন্ধমালা" গ্রন্থে "পলিটিক্স" অর্থে "রাজ্য প্রকরণ" অথবা "রাজ্য প্রকরণী" এই-

রূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। মরাঠী "প্রকরণ" শব্দে বাঙ্গলা ভাষায় যাহাকে "ব্যাপার" বলে, তাহাই কতকটা বুঝায়। মরাঠী ভাষায়, "ব্যাপার" শব্দে সচরাচর বাণিজ্য-ব্যাপারই বুঝায়। বাঙ্গলা ভাষায় "পলিটিক্‌সের" প্রতিশব্দ "রাষ্ট্রীয় ব্যাপার" বোধ হয় চলিতে পারে। তবে, কথা হইতেছে, "রাজনীতি" ও "রাজনৈতিক" এই দুটা শব্দ যদি আমাদের ভাষায় বদ্ধমূল হইয়া গিয়া থাকে, তবে আর পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা আছে কি না, সে বিষয়ও বিবেচ্য।

"রাষ্ট্র" শব্দে যদিও ঠিক্ "নেশন্" বুঝায় না—তবে, আমাদের দেশের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, তাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষের লোককে "এক জাতীয় না বলিয়া "এক রাষ্ট্রীয়" বলাই অধিকতর সঙ্গত। এই জন্য "ন্যাশানাল কংগ্রেস্" অর্থে "জাতীয় মহাসভা" এই নাম অপেক্ষা "রাষ্ট্রীয় মহাসভা" এই মরাঠী নামটি অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

উপসংহারে বক্তব্য, মহারাষ্ট্রীয় লেখক মহাশয় নূতন শব্দ রচনা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে যদি তাঁহারা মতামত প্রকাশ করেন, তবে আমাদের উভয় ভাষারই কতকটা উপকার হয়। একই সংস্কৃত শব্দগুলি সকল সময়ে এক অর্থে ব্যবহার করি না—এই হেতু, নূতন শব্দের রচনা সম্বন্ধেও আমরা পরস্পরকে তেমন সম্যক্‌রূপে সাহায্য করিতে সমর্থ হই না—ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

আলোচনা।

ভ্রম স্বীকার।

গত জ্যৈষ্ঠমাসের "সাহিত্য" পত্রে "বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ সমালোচনায় উক্ত প্রবন্ধের নামকরণ লইয়া একটি বিদ্রূপবক্র নোট ছিল। ভ্রমক্রমে উক্ত নোট "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত মনে করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং সবিস্তারে তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া জানিলাম যে সেই নোটটুকুও প্রবন্ধলেখক শ্রীমান্ যোগিনী-মোহনের স্বরচিত। এই অনবধান ও ভ্রমের জন্য আমরা সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আষাঢ় মাসের সাহিত্যেও শ্রীমান্ লেখক পুনশ্চ তর্ক তুলিয়াছেন; তাহা পড়িয়া এইটুকু স্পষ্ট বুঝা গেল, যে, এই আলোচনায় তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছে। কিন্তু আর কিছুই স্পষ্ট বুঝিবার যো নাই।

চিত্রল অধিকার।

চিত্রলের লড়াই ত শেষ হইল। এক্ষণে তাহার দখল রাখা লইয়া কাগজের লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। উভয় পক্ষেই বিস্তর ইংরাজ সেনানায়ক এবং ভূতপূর্ব্ব ভারতশাসনকর্ত্তা সমবেত হইয়াছেন। চিত্রলের দখল ত্যাগ করার পক্ষে অনেক বড় বড় যোদ্ধা লড়িতেছেন, কিন্তু কোন্ পক্ষে আমাদের ভারতরথের সারথী জনার্দ্দন আছেন এখনও তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ভারত-রক্ষার পক্ষে চিত্রল অধিকারের উপযোগিতা যে নাই এবং যদি থাকে তবে অপব্যয়ের তুলনায় তাহা অতি যৎসামান্য একথা অনেক

প্রামাণ্য সাক্ষীর মুখে শুনিয়াছি। তাঁহারা ইহাও বলেন, ইংরাজ অধিকারে রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ হইয়া চিত্রলের স্বাভাবিক দুর্গমতা দূর হইয়া যাইবে সেটা শত্রুর পক্ষে অসুবিধাজনক নহে।

কিন্তু ইহাঁরা একটা কথা কেহই বলিতেছেন না। বন্ধুত্ব করিবার ক্ষমতা ইংরাজের নাই। অনর্থক অনাবশ্যক স্থানে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া অযথা ঔদ্ধত্যের দ্বারা শান্তির জায়গায় অশান্তি আনয়ন করিবার অসাধারণ প্রতিভা ইংরাজ জাতির আছে। চিত্রলের পথ সুগম হইল, এখন মাঝে মাঝে এক এক ইংরাজ শিকারী কাঁধে এক বন্দুক তুলিয়া পার্ব্বত্য ছাগ শিকারে বাহির হইবেন, এবং অপরিমেয় দম্ভের দ্বারা দেশবাসীদিগকে ত্যক্তবিরক্ত করিয়া তুলিবেন। অতএব, চিত্রলের পথঘাট বাঁধিয়া দিয়া শত্রু আগমনের পথ সুগম করা হইতেছে বলিয়া ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধনীতিজ্ঞেরা যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা সমীচিন হইতে পারে কিন্তু পথ সুগম হইলে ইংরাজের সমাগম বাড়িবে, ইংরাজরাজ্যের এবং পার্ব্বত্য জাতির শান্তির পক্ষে সেও একটা কম আশঙ্কার বিষয় নহে।

ইংরাজের লোকপ্রিয়তা।

কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোকের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইংরাজ এক দৃঢ় বিশ্বাস মনে পোষণ করিয়া থাকেন, যে, তাঁহারা বড় লোকপ্রিয়। যেখানে পদার্পণ করেন সেখানকার লোকেই তাঁহাদিগকে মা-বাপ বলিয়া জানে। তাঁহারা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন, যে, ইজিপ্টের প্রজাবর্গ তাঁহাদিগকে পরম সুহৃদ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাসপ্রিয়তা, যে, সেই দেশের লোকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা আইনবন্ধনহীন সরাসরি বিচারের ভার নিজের হস্তে লইতে উদ্যত। সেখান-

কার লোকে তাঁহাদের প্রতি যে সকল গুরুতর উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে তাঁহাদের বিশ্বাস সেখানকার বিচারক তাহাব উপযুক্ত শাসন করে না—তাঁহাদের প্রতি সাধারণের এতই প্রবল ভালবাসা!

কর্তৃপক্ষেরা হয় ত ক্ষাপা হইবেন (কারণ, এখানে তাঁহারা কর্তৃপক্ষ) কিন্তু আমরা যদি ইজিপ্টে তাঁহাদেব নিজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বলি যে, ইংরাজকতৃক দেশীয় উৎপীড়নের বিচারভার সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের হস্তে না দিলে ইংরাজ জুরীর নিকট দেশীয় হতভাগ্যের সুবিচার প্রাপ্তির আশা অত্যল্প তবে সেটা কি অসঙ্গত শুনিতে হয়?

কিন্তু ইংরাজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস, যে, ঈজিপ্টে তিনি লোকপ্রিয় পরমসুহৃদ্, এবং ভারতবর্ষে তিনি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত সুবিচারক।

ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য।

নিজেদেব জাতিগত দোষগুলির প্রতি ইংরাজদের এমন একটি স্নেহদৃষ্টি আছে, যে, এক এক সময় তাহা দেখিলে আঘাতও লাগে এবং হাসিও পায়। ইংলণ্ডের স্পেক্টেটর পরম খৃষ্টান কাগজ। কিন্তু সেই কাগজে "With Wilson in Matabeleland" নামক গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনার মধ্যে একস্থলে লিখিত হইয়াছে "We have never seen the delight in killing, which is perhaps a normal trait in healthy human male animals, so frankly expressed as in these pages." অর্থাৎ বধস্পৃহা সুস্থপ্রকৃতি পুরুষজাতীয় মানবপ্রাণীর একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম একথা সমালোচক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য, ইহাতে বধস্পৃহার প্রশংসা বুঝাইতেছে না,

কিন্তু ঐ "সুস্থপ্রকৃতি" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া এই বধস্পৃহার প্রতি বিশেষ একটু স্নেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্পাদক স্বজাতিসুলভ দোষের প্রতি মমতানুভব করিবার কালে এ কথা ভুলিয়াছেন, যে, তাঁহার স্বাস্থ্যের আদর্শ অনুসারে যিশু খৃষ্টের মত রোগজীর্ণ প্রকৃতির দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। এই স্বজাতিসুলভ দোষগুলির প্রতি ইংরাজের বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টি আছে বলিয়াই ভারতবর্ষে এতগুলি ইংরাজ উপর্য্যুপরি এতদ্দেশীয়কে হত্যা করিতেছে এবং উপর্য্যুপরি নিষ্কৃতিও পাইতেছে। এতগুলি ইংরাজকে যদি দেশীয়রা হত্যা করিত তবে তাঁহারা যে পরিমাণে রাগ করিতেন ও প্রতিহিংসা ও প্রতিকারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিতেন দেশীয় হত্যায় তাঁহাদের সে পরিমাণ ক্রোধের সঞ্চার হয় না। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন একজন "টমি অ্যাট্‌কিন্‌স্" সামান্য রাগ হইলেই কেন এক জন দেশীয় কালো লোককে হত্যা করিয়া ফেলে। তাঁহারা সেটাকে অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু মনের এক কোণে এই কথা উদয় হয় যে ওটা সুস্থপ্রকৃতি টমি অ্যাট্‌কিন্সের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ইংরাজের লোকলজ্জা।

দেখিলাম, টাইম্‌স্ পত্রে একজন ইংরাজ লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, যে, চিত্রল অধিকার করিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে ইংরাজের এই অনিশ্চিত আগুপিছু পলিসি লইয়া ভারতবর্ষের দেশীয় রাজসভায় এবং প্রজাবর্গের মধ্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা উত্থাপিত হইবে। আমরা দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম, যে, ভারতবাসীদের নিকটেও সময়ে সময়ে ইংরাজ লোকলজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু এ স্থলে লজ্জার কোন কারণ দেখি

না। একটা দেশ জয় করিয়া অপরাধীদিগকে শাসন করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া আসিলে ইংরাজের সেই নির্লোভ উদারতা ভারতবর্ষের নিকট প্রশংসার বিষয় বলিয়াই গণ্য হইবে।

কিন্তু যথার্থ যদি ইংরাজের তিলমাত্র লোকলজ্জা থাকে তবে গরীব ভারতবাসীর নিকট হইতে টাকা লইয়া মহারাণীর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের আতিথ্য করিতে ক্ষান্ত থাকা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের নিকট মহারাণীর নামে এই হীনতা-কলঙ্ক প্রচার না করিলেই ভাল হয়। গরীবের অর্থে রাজার আতিথ্য রাজোচিত দেখিতে হয় না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলেও উলুখড়ের প্রাণ যায় আবার রাজায় রাজায় বন্ধুত্বের বেলাও উলুখড় বেচারার পরিত্রাণ নাই।

তাহা ছাড়া, স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া, কাবুলের মন পাইবার জন্য নসেরুল্লাকে লইয়া এমন অতিমাত্রায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে দেশীয় রাজা ও প্রজার নিকটে মহারাণীর সম্মান যে কতখানি খর্ব্ব হইতেছে তাহা ইংরাজ অন্ধভাবে বিস্মৃত হইতেছেন। নসেরুল্লাকে যদি মহারাণী নিজের অতিথিভাবেই অভ্যর্থনা করিতেন তবে তাহাতে লজ্জার বিষয় কিছুই ছিল না, কিন্তু এই আতিথ্যকে ভারত-রাজকীয় পলিসির অঙ্গ করিয়া লইয়া ভারত ভাণ্ডার হইতে অর্থ লইবার উপক্রম করাতে ইংরাজের মর্য্যাদা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইতেছে। যে ইংরাজের ঔদ্ধত্য ও অভিমান জগদ্বিখ্যাত, কাজ উদ্ধারের সময় সেই ইংরাজের মেরুদণ্ড কাবুলের পাঠানের নিকটে এমন অনায়াসে অবনত হইতেছে ইহা লইয়া কি হাসিবার লোক কেহই নাই? শুনা যাইতেছে অনেক মুকুটধারী য়ুরোপীয় রাজাও ইংলণ্ডে এরূপ আতিথ্য লাভ করেন নাই। পলিসিও যে খুব পাকা তাহা বলিতে পারি না। পদ্মাতীরে বালু ভিত্তির উপর বহুব্যয়ে

অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা সঙ্গত নহে, সেখানে অল্প খরচে ক্ষণিক বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়। কাবুলের সহিত বহুব্যয়সাধ্য সখ্য নির্ম্মাণও সেইরূপ অবিবেচনার কাজ। কাবুলের সিংহাসন ইংরাজের বহুমূল্য সখ্যসমেত আজ বাদে কাল ধসিয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে; অতএব কাবুলের মত রাজ্যের সহিত স্বল্পব্যয়ে ক্ষণিক সখ্যের আয়োজন রাখাই সঙ্গত। ভারতবর্ষের বহুকষ্টসঞ্চিত রাজভাণ্ডার তাহার পদমূলে উজাড় করিয়া দিলেও কাবুলের সিংহাসন এক বংশে স্থায়ী হইবে না।

প্রাচী ও প্রতীচী।

নসেরুল্লার একটি আচরণে আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য প্রথার প্রতি সর্ব্বদাই নাসা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। এবারে নসেরুল্লা প্রাচ্য সভ্যতার তরফ হইতে পাশ্চাত্য বর্ব্বর প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। রাজপুত্র লেডি টুইড্‌মাউথের নৃত্যোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া অভ্যাগত মহিলাদের উত্তরাঙ্গের বিবস্ত্রতা দর্শনে এতই লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন, যে, ঘরে প্রবেশ না করিয়া বহিঃকক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নসেরুল্লা লেডি ল্যান্‌স্‌ডাউনের হস্ত ধরিয়া ভোজনাগারে লইয়া যাইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু লেডির অনাবৃত হস্ত দেখিয়া তিনি ভদ্রোচিত সঙ্কোচ প্রকাশ পূর্ব্বক করগ্রহণ না করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে মহিলাদের প্রতি রূঢ়তা প্রকাশ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচ্য রাজপুত্রের মনে যে সভ্যতার আদর্শ বিরাজ করিতেছে তাহাকে উপেক্ষা করাও তাঁহার কর্ত্তব্য হইত না।

সাধনা।

বিদ্যাসাগর চরিত।

আমাদের সমাজে যশস্বী লোকদের মহত্ত্বের পরিমাণবিচার হইয়া উঠে না। স্থানসঙ্কীর্ণতাবশতঃ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগকে আমাদের স্থানীয় ক্ষুদ্র বড়লোকগুলির সহিত প্রায় এক কোঠায় ভুক্ত করিতে হয়। যে সমাজ মহৎ, এবং যে সমাজ উদারবিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, সে সমাজে ছোট বড় এবং মাঝারি মহাজনগণ অতি সহজেই এবং সত্বরেই আপন উপযুক্তস্তরে গিয়া উত্তীর্ণ হন।

ছোট কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে বাস করি বলিয়া আমাদের দেশে কাজকর্ম্ম এবং মানুষের মাপকাঠি ছোট হইয়া গেছে। আমরা বড় বড় পরিমাণের নামগুলি বড় বড় সমাজের নিকট ধার করিয়া লইয়াছি কিন্তু তাহার মাত্রা খাটো করিয়া লইতে হইয়াছে। কথিত আছে কোন অমিতভাষী বক্তা, একটা মশকবিশেষের উল্লেখ করিয়া গল্প করিতেছিল, যে, তাহাকে মারিতেই এক ঘড়া রক্ত বাহির হইল,—বিচক্ষণ শ্রোতা আপন নখকোণ প্রদর্শন করিয়া উত্তর করিল, ঘড়াটা বোধ করি ইহা অপেক্ষা বড় হইবে না। আমরাও রসনাসংযম না করিয়া অনেক সময়েই আমাদের

* ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্নে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থসভার সাম্বৎসরিক অধিশনে এমারেল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত।

যাদব বাবুকে বলি বাঙ্গলার মাট্‌সীনি, মাধব বাবুকে বলি বাঙ্গলার ডিমস্থিনীস্‌। হায়, সে কি অণুপরিমাণ মাট্‌সীনি, কি কণা পরিমাণ ডিমস্থিনীস্‌!

এইরূপে আমরা যেমন ছোটকে বড় করি, তেমনি বড়কেও ছোট করিয়া দিই। শিশুকে যখন জিজ্ঞাসা করা যায়, ওরে, পর্ব্বতটা কত বড় দেখিলি ? সে তাহার দুই অতি ক্ষুদ্র বাহু বিস্তার করিয়া বলে এত বড়টা! আমরাও তাহাই করি; এবং আমাদের সেই অতি ক্ষুদ্র বাহুপ্রসারের মধ্যেই আমাদের সমাজের সাধারণ বড়লোকেরা সম্পূর্ণরূপে পরিমিত হইতে পারেন,—এমন কি, অনেক সময়েই অপরিমিত হইয়া উঠেন—কিন্তু অদ্য আমরা যাঁহার পূজার্থে এই সভায় আসিয়া সমবেত হইয়াছি সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টায় যত বড় বলিয়া থাকি তিনি তাহা অপেক্ষাও বড় ছিলেন।

আমাদের সমাজটা ছোট বলিয়া এখানে আমাদের অনেককে অযথা বড় দেখিতে হয়, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই বিদ্যাসাগর যত বড় ছিলেন তাঁহাকে তদপেক্ষা অনেক সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছিল। যদি মহত্তর সমাজে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে সেই প্রবল বলিষ্ঠ-চেতা অসামান্য মনস্বী পুরুষ আপনার যথাযোগ্য কীর্ত্তি যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারিতেন—কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে আমরা অস্ফুটবাক্‌ শিশু, সেই জন্য তিনি কেবল আমাদের শিশুর অভাব পূরণ করিয়া ভাষা শিক্ষা দিলেন, এবং আমরা লোকাচারের মোহপিঞ্জরে আবদ্ধ অচেতনবন্দী, সেই জন্য তিনি আমাদের অসাড় হৃদয়ে অনাথিনী বালবিধবাদের প্রতি করুণা-আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিলেন। পৃথিবীর প্রান্তবর্ত্তী বঙ্গসমাজের এই দুটি মাত্র ঘটনা, নিখিল মানবজগতের ইতিহাসে দুটিমাত্র ছত্র অধিকার

করিবে কিনা সন্দেহ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র দুটি ছত্র রচনা করিতে যে উদার হৃদয়, যে প্রখর বুদ্ধি, যে অসামান্য চরিত্রবল ও অধ্যবসায় আবশ্যক হইয়াছিল তাহাতে অন্যত্র অভূতপূর্ব্ব নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইতে পারিত।

আমি সমস্ত মানবসাধারণের ইতিহাসের কথা বলিলাম, নতুবা, বাঙ্গালীর ইতিহাসে, এই বাঙ্গলা শিক্ষার প্রথম সোপান নির্ম্মাণ, এই পাষাণ লোকাচারের দুর্গে যুক্তির শতঘ্নীবর্ষণ—বড় সামান্য ঘটনা নহে। অন্য কোন সাধারণ বড়লোক বাঙ্গালী হইলে তৎ-প্রসঙ্গে সমগ্র মানবসমাজের উল্লেখ নিতান্ত হাস্যকর হইত, অপর-পক্ষে বিদ্যাসাগরের মত বিরাটচরিত্র মহাত্মার বৃহৎ চিত্র এই বঙ্গ-সমাজের ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ছিন্নপ্রবণ পটের উপর অসঙ্গত দেখিতে হয়। কিন্তু জানি না, কি অভিপ্রায়ে বিধাতা তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীদের প্রতি অনেক সময় অসঙ্গত আদেশ করিয়া থাকেন—তিনি অনেক সময় তাঁহার রাজধানীর সেনাপতিকে দূর গণ্ডগ্রামের তত্ত্বাবধানে পাঠাইয়া দেন,—নির্ব্বাসিত সেনাপতিও আপনার সমগ্র শৌর্য্য-প্রয়োগ করিয়া বিনা আক্ষেপে আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করেন। বিদ্যা-সাগর বিশ্ববিধাতার রাজধানীর যোগ্য বীর ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার বিপুল মনুষ্যত্ব লইয়া এই অবজ্ঞাত বঙ্গদেশের স্বল্পসম্মানিত অথচ কঠিন কার্য্যে, এই ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রের অখ্যাত অথচ কঠোর সংগ্রামে জীবন সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রভুর সমীপে ফিরিয়া গিয়া-ছেন। এক্ষণে আমরা বঙ্গবাসীরা তাঁহাকে কি সম্মান দিব! তিনি যে খ্যাতির যোগ্য ছিলেন আমাদের জাতীয়দৈন্যবশতঃ সেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাঁহাকে আমরা দিতে পারি না। তিনি বাঙ্গ-লার যে উপকার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী তাহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে কিন্তু তিনি যে অসামান্য গৌরবাঃ

ন্বিত মনুষ্যত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিষ্ঠার যোগ্য মন্দির বঙ্গদেশে নাই; কারণ, বঙ্গসমাজ এখনও সর্ব্বজাতি-সমাগমসঙ্কুল বিশ্বসমাজের বহির্দ্দেশে পড়িয়া আছে।

কিন্তু অল্পদিন হইতে কি এক দৈবদুর্গ্রহবশতঃ আমাদের বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত সাধারণেও অকস্মাৎ মনুষ্যত্বের প্রতি বিমুখভাব ধারণ করিয়াছেন। যাহা-কিছু আদরের এবং সম্মানের সামগ্রী সমস্তকেই তাঁহারা বিশেষরূপে "হিন্দু" নামের ছাপ দিয়া সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন; এমন স্থলে আমি যদি সাম্প্রদায়িকতার বাহিরে উদার মনুষ্যত্বের মধ্যে বিদ্যাসাগরের স্বাভাবিক অধিষ্ঠান নির্দ্দেশ করিতে যাই তবে সম্ভবতঃ অনেকের অসন্তোষ-ভাজন হইব। অদ্য তাঁহার মৃত্যুদিনের সাম্বৎসরিক স্মরণোৎসবসভায় কাহারও সহিত কোনোরূপ সংঘর্ষ প্রার্থনীয় নহে—কিন্তু বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্ব্বপ্রধান গুণ—যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙ্গালী জীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া, একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রু-জলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্ত্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্ত্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙ্গালী বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। আমাদের দেশে বড়লোক অনেক উঠিতেছে, প্রকৃত হিন্দুও বিস্তর

থাকিতে পারে, কিন্তু যথার্থ মানুষ অল্পই আছে বলিলেও অত্যুক্তি হইয়া পড়ে। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য্যই সর্ব্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্ব্বতপ্রমাণ চরিত্র-মাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃতকীর্ত্তিকেও খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননী-রূপে মানবসভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল—সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শ লোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন সৃজন করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাঙ্গলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিয়াছে এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাঙ্গলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎ-পূর্ব্বে বাঙ্গলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্ব্ব-প্রথমে বাঙ্গলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা ঝুলিমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেনতেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পূরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমা-পন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া, এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজি-কার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে

সে ভাষা হইতে কদাচ প্রাকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে;— জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

গতবৎসর এই সভায় আমার আত্মীয় শ্রীমান্ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্ব্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন্ প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন। লিখিত প্রবন্ধে এই ছেদচিহ্নের আবশ্যকতা যে কত অধিক তাহাও বক্তা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গলা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন। এতদ্দ্বারা, যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা পুটবদ্ধ কলিকারূপে ছিল তাহা পরিস্ফুট চতুরস্রশোভী হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ছেদবিভাগব্যতীত লিখিত ভাষার দ্বারা কখন কোন বৃহৎকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। নিপুণা গৃহিণী গৃহকার্য্যে সুব্যবস্থা আনিতে হইলে প্রথমেই গৃহসামগ্রীগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে গুছাইয়া লন্, সে জন্য তাঁহার বাক্স সিন্ধুক আলনা মঞ্চ প্রভৃতি নানাপ্রকার আধারের প্রয়োজন হয়; এইরূপে গৃহোপকরণগুলি যথাস্থানে বিভক্ত হইয়া গেলে গৃহের বিচিত্র কার্য্য সহজে অগ্রসর

হইতে থাকে ; কমা, সেমি-কোলন্ দাঁড়িও রচনা-গার্হস্থ্যের আল্-মারি সিন্ধুক আল্না ; জটিল পদের অংশগুলি যথাবিধানে এই সকল আধার অবলম্বন করিয়া সুবিভক্ত হইয়া গেলে ভাবপ্রকাশের কার্য্য অতি সহজে নিষ্পন্ন হইতে থাকে।

বাঙ্গলা ভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গলা-গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দ-গুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্যপাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্য ভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশে-ষতঃ বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রবহমান, পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মত—তাহার উপরে কাহারও নাম খোদিয়া রাখা যায় না। মনে হয় যেন সে চিরকাল এবং সর্ব্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসি-তেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝর ধারায় গঠিত ও পরি-পুষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজানমুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম

গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্ত্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন রচনা-কর্ত্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটবড় অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবন লাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারও নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সে জন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্ব্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ—আর, মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্ত্তেই সকল কার্য্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা, অনেক সময়ে, বিদ্যুতের ন্যায়, আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে—এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা, প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য্য সন্দেহ নাই, তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

অনতিকাল পূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্য কেবল বাঙ্গালীর প্রতিদিনের তুচ্ছ প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত ছিল, তাহা কখনো কোন মহৎভাব বা বৃহৎ সত্য প্রকাশের কাজে লাগে নাই; এই জন্য এই ভাষার সঙ্কীর্ণ এবং অপরিণত প্রাদেশিকতা মোচন করিয়া যিনি ইহার দ্বারা কোন সর্ব্বকালযোগ্য এবং বিশ্বজনভোগ্য সাহিত্যসুধার সৃষ্টি করিতে পারেন আমরা তাঁহাকে বিশেষরূপে সাধুবাদের পাত্র জ্ঞান করি। তেমনি বাঙ্গালীর জীবন বাঙ্গালীর সংসারও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ;—আমরা অজ্ঞতাসুলভ অভিমানে অন্ধ, এবং লোকাচারের জড়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া চিরকাল একই ক্ষুদ্র পরিধিরেখা পর্য্যটন করিতেছি; এই তুচ্ছতা, নির্জ্জীবতা, সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া যে ব্যক্তি আপন চরিত্রের মধ্যে বিশ্বগ্রাহী মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে পারেন তিনি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোন সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলেনা। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলঙ্কারশাস্ত্রের অতীত অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলঙ্কার শাস্ত্রের কোন নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোন বিরোধ হয় না, তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন "ওরিজিন্যালিটি" অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহৎ চরিত্র বিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়। অনেকে, বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন অনন্যতন্ত্রীত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্ত্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্র

প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে অতিশয় বিরল। এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; মনে হইতে পারে তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুতঃ আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি, যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মত হইয়া যাই; অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি; নিজত্ব কাহাকে বলে জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় সুপ্ত ভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্র-পুরীর মধ্যে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র একক, অন্যদিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন তাঁহারা ভারত-বর্ষীয়, তেমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনু-করণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায় আচারে ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছিলেন; স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ

ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোক-হিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙ্গালীর অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্ম্মা যেখানে সাতকোটি বাঙ্গালী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন তাহা বলা কঠিন। কি নিয়মে বড়লোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়- আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্ম্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃজনও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায় সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভাল। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

মেদিনীপুর জিলায় বনমালিপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার

স্ত্রী দুর্গাদেবী ভ্রাতৃশ্বশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে, পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়ার লাঞ্ছনায় বৃদ্ধ পিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটীরে বাস করিয়া চরকা কাটিয়া দুই পুত্র ও চারি কন্যা সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্কভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজস্বত্ব ও তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্নগ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোন অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোন প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।" (১)

ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ বুঝিতে পারিবেন একান্নবর্ত্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মত আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।

"তাঁহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া

---

১ স্বরচিত বিদ্যাসগরচরিত। ৩১ পৃষ্ঠা।

পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানা-প্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখা-ইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানা প্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।" (১)

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহ গ্রামের নূতন বাস্তবাটি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন তখন রামজয় দান গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটি নাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্র্যও মহৈশ্বর্য্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ জাজ্বল্যমান করিয়া তোলে। (২)

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন "তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার

১ স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত। ৩২ পৃষ্ঠা।

২ সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত। ৫ পৃঃ

করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্টকথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্র বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্র লোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।"(১)

এদিকে তর্কভূষণ মহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য্য ছিল। সর্ব্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত। তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ড হস্তে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন; এমন কি, দুই চারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। "ভালুক নখর প্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণ সংহার করিলেন।" (২) অবশেষে শোণিতস্রুত বিক্ষত দেহে চারিক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন;— দুই মাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন।

---

১ স্বরচিত বিদ্যাসাগর চরিত। ৩৪ পৃঃ

২ স্বরচিত বিদ্যাসাগর চরিত।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।" শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন "ওদিকে নয় এদিকে এস"—বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নত চরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক্ ঋজুস্বভাব পুরুষের মত আদর্শ বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙ্গালীর মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্র বর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স ১৪। ১৫ বৎসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দুর্গা দেবী চরকায় সূতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের বাড়িতে উঠিলেন। ইংরাজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্‌সরকারের বাড়ি ইংরাজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ি ফিরিতেন তখন তর্কালঙ্কারের বাড়িতে উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত। অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিদ্র্য নিবন্ধন এক একদিন তাঁহাকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচশিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল, অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড় ফেসাদে পড়িতে হয়। ১

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। "বড়বাজার হইতে ঠন্‌ঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া এত অভিভূত হইলেন, যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহবাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং

১ [illegible]হাদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত।

ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত কিছু খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপা-ঠাকুর, জল খাইয়ো না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকট-বর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেটভরিয়া ফলার করা-ইলেন; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ্ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।" (১)

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দুই টাকা, ও তাহার দুই তিন বৎসর পরে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুর-দাসের সেই তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়রচিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থে লিথোগ্রাফপটে এই দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার আবশ্যক করে না,

১ স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত। ১৪ পৃঃ।

তাহা যেন মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্য্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসারতা, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমাময় সুসংযত সৌন্দর্য্য দর্শকের হৃদয়কে বহুদূরে এবং বহু উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোন পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্ত্তের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহ গ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন "যে সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিলে তাহারা কি খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?" (১)

দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায় কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোন প্রকার

১ সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত। ২০০ পৃঃ।

সঙ্কীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই শলাকার মত কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। (কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্য্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধিউজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথাসংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না।) বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবন চরিতে লিখিয়াছেন, যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ৬। ৭ শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভাল, কি, গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐটাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভাল? ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খেতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" এ কথাটি সহজ কথা নহে, – তাঁহার নির্ম্মলবুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া, প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জ্জন করিতে পারে ইহা আমার নিকট বড় বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ় এমন আর কার কাছে? অথচ, কি আশ্চর্য্যস্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ম্ময় অনন্ত বিশ্বধর্ম্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। একথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কি করিয়া, যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা? তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান্ হ্যারিসন্ সাহেব যখন কার্য্যোপলক্ষ্যে মেদিনীপুর জেলায় গমন করেন তখন ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাঁহার

তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন;—"জননী-দেবী সাহেবের ভোজন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক সাহেবের ভোজন সময়ে চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ... ... সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল। জননী দেবী প্রবীন হিন্দু স্ত্রীলোক তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী কি অন্যধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।" (১)

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন "১২৬৬ শাল হইতে ৭২ শাল পর্য্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজ মহাশয় বিশেষরূপ যত্নবান ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে এ কারণ জননী দেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র একপাত্রে ভোজন করিতেন।" (২)

অথচ তখন বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যা-সাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন; আর, এই রমণীকে কোন শাস্ত্রের কোন শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই; বিধা-

---

১ সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নপ্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত। ১৯৯ পৃঃ
২ সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নপ্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত। ১৬৪ পৃঃ

তার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননী জঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশঙ্কা করিতেছি, সমালোচক মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন, যে, বিদ্যাসাগরসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণবহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু একথা তাঁহারা স্থির জানিবেন, এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া,মহৎপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানাকার্য্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর, মহৎনারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে, তাঁহার স্বামীর কার্য্যে, রচিত হইতে থাকে, এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে তাহা ভালরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর, আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমা পূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, যদি তিনি কোনরূপ সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্য ভক্তকর্ত্তৃক তাঁহার চরিতকীর্ত্তন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনার যে অংশে তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর মাহাত্ম্য মহীয়ান্ হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রু বর্ষণ হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী

ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোন কোন অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্ পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিতেছেন; "পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদাবস্ত্র না থাকিত, সেদিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে, তিনি হঠাৎ বলিতেন, না আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন, যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়া স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড়চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।" (১)

পাঁচছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী মথুরমণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্য-বিগর্হিত উপদ্রব করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্ব্বজন-নিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনো করে নাই।

নিরীহ বাঙ্গলা দেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মত দুর্দ্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙ্গালী জাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস্ করিয়া ভাল চাক্‌রিবাক্‌রি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

১ সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নপ্রণীত বিদ্যাসাগর জীবন চরিত। ২৫ পৃঃ

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিতলেখকের সাদৃশ্য ছিল না। "রাখাল, পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।" কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দ্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ্ রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়বাজারের বাসা হইতে পটলডাঙ্গায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জ্জয় বালকের শরীরটি খর্ব্ব শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড,—স্কুলের ছেলেরা সেই জন্য তাঁহাকে যশুরে কৈ ও তাহার অপভ্রংশে কস্থুরে জৈ বলিয়া ক্ষ্যাপাইত, তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা কহিতে পারিতেন না। (১)

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্ম্মানি গির্জ্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ্! শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্ম্মের কাজও ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। দাস দাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা

(১) মহোদয় শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নপ্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

সকলের রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথ বাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু পটল তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাট্না বাটিয়া উনান্ ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই ত অবস্থা। এদিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া "দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।" (১)

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মত অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব্বদেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য্য অল্প-

(১) সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নপ্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত। ৩৭ পৃঃ।

কালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মত দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা দয়া করা বড় কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোন প্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্য্যশালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধিলাভ করিতে পারে নাই এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই দয়ার সাগর নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কালেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যোপলক্ষ্যে তিনি যে সকল ইংরাজ প্রধান কর্ম্মচারীদের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্ব্বিত সাহেবানুজীবীদের মত আত্মাবমাননার মূল্যে বিকৃত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।—একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষ্যে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপল্ কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট্-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে ঊর্দ্ধগামী করিয়া দিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতা রক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে ঐ কার্ সাহেব কার্য্যবশতঃ সংস্কৃতকালেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতাসমেত তাঁহার সর্ব্বজন-বন্দনীয় চরণযুগল

টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহঙ্কৃত ইংরাজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ ময়েট্ সাহেব অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয় বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার চলিবে কি করিয়া? তিনি বলিলেন আলুপটল বেচিয়া মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব। তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্ন বস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন—তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্ব্বে চাকরি করিতেন—বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্য্য ত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসার খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট্ সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন ব্যাঙ্ক নামক একজন ইংরাজকে কয়েকমাস বাঙ্গলা ও হিন্দী শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন তিনি বলিলেন আপনি ময়েট্ সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট্ সাহেব আমার বন্ধু আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল পদে নিযুক্ত হন। আট বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্ত্তা

এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন; অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন; উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। কর্ম্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন; অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্ম্মচারী বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট আছে,—বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলেন তখন কালেজের কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহ বাটির চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহ স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডিমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোন উপায় নাই? (১) মাতার পুত্র উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষা-বিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ-

(১) সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত। [illegible] পৃ।

স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভ বাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণি সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই, যে, স্নেহ ও যত্ন-বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ দয়া সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

স্ত্রীজাতির স্নেহ দয়া সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে আমাদের

মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে? কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা কিছু সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে, নিজের দিক্ হইতে, যে, কিছুমাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই;—এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকি;—তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন তখন আপন পঙ্ককলঙ্কিত পদযুগল অসঙ্কোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্দ্ধাভরে সত্য সত্যই আপনাদিগকে নরদেবতারূপে নারী সম্প্রদায়ের পূজা গ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই সকল সেবক পূজক অবলাগণের দুঃখ মোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মত মর্ত্ত্যদেবগণের সুমহৎ ঔদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমতঃ বেথুন সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন, তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা গালিমিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালিবর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন, এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরও একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়-

লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারও সংক্ষেপ উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃতকালেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃত কলেজের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্ত্তি মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটূশন্। বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপন করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীন দরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জ্জনা করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহৎ আদর্শ বাঙ্গালী জাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ শালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত।

কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙ্গালী হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙ্গালীজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙ্গালীদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্ব্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমাশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃত-কলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল্ সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন তাঁহার চাক্‌রি লইবার ইচ্ছা আছে কি না অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনেই ত্রিশ-ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসা-পত্রগুলি লইয়া পুনর্ব্বার পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। (১) পরের উপকার কার্য্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ্ প্রকাশ পাইত। সাধারণতঃ আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ্ না থাকাতে তাহা সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্বলাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূর-

১ সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত।

ব্যাপী সুদীর্ঘ কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোন অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ মহকুমায় ইন্‌কম্ ট্যাক্স ধার্য্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতা-প্রযুক্ত যে সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্ ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেণ্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুই তিন জনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার গ্রামে আবেসের বাবুর নিকটে আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বর্দ্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন্ সাহেবকে তদন্তজন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—এইরূপে দুইমাসকাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া তিনি এই অন্যায় নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। (৩)

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাঙ্গলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি কিন্তু আমরা কোনও ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায়

৩ সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত।

অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজীগোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একটা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্যনৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায় এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্য্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চন অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সঙ্কট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুর-চারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতারক্ষার নিয়ম লঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি কোন এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টি সৎকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয় পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই আহা উহু এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ পুরুষোচিত; এই জন্য তাহা সরল এবং নির্ব্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকা কুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে ঋজুরেখায় নিঃশঙ্কে নিঃসঙ্কোচে আপন কার্য্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখন রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি, (চণ্ডিচরণ বাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) খর্ম্মাটাড়ে এক মেথর জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্দ্ধমানবাসকালে তিনি

তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়নির্ব্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন—"অন্নচ্ছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত, তাহারা, পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম, প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাথাইয়া দিতেন।"

এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই, নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্ম্মবশতঃ ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালমানুষ অমায়িকপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণতঃ তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ, কর্ত্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহাদের বেদান্তঅধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতি-বন্ধন ছিল। বাচস্পতি মহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত

জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিলেন। গুরু বারম্বার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বলিকাকে বিবাহ পূর্ব্বক তাহাকে আশু-বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিদ্যাসাগর গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করি।

"বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও'। এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয় 'অকল্যাণ করিস্ নারে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটিতে আসিলেন এবং নানা প্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে সান্ত্ব করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্ব করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্য কঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন "এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না'।"

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায় তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙ্গালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায় কিন্তু

বড় বড় গ্রন্থিচ্ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরীতে ছোটে ভাল কিন্তু কর্ম্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠ শিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছল সচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। (আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরি ভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্ত্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের ঋজুরেখা হইতে কোন মন্ত্রণায় কোন প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। (গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া,প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরিক কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরসশাখাপল্লবসম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্য্যাপ্ত বল-বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্ব্বসম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।)

মেট্রপলিটান্ বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের

সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন—ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোক-হিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি,—এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে সমগ্রভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জ্জন দিয়া. মুহূর্ত্তের মধ্যে, উপস্থিত বাধার মর্ম্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মত কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্ম্মবুদ্ধি বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল।

যেমন কর্ম্মবুদ্ধি তেমনি ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে, তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ"। ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে,কিন্তু ধর্ম্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের। তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংশ্রবের সকল জিনিষকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্যসাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্ম্মূল্য দুর্গম করিয়া দেয়। সেই জন্য, সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ; তাহার মধ্যে কোনও নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা

করিয়া এক অমূলক কল্পনা-লোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার বিধবাবিবাহ গ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিস্কার হইবে।

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ!......অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে, সংসার তরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছ!"

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্য্যমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃজন করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সেই চায় যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্পটুতার আবশ্যক হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন, যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না, এবং আমরাও তাহার চতুর্দ্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সেও দুঃখ পায় সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ সেই অকল্যাণ নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না; আমরা সে স্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা প্রয়োগ পূর্ব্বক একটা স্বকপোল-কল্পিত জগতের আদর্শ বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্ম্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। সেই জন্য এ সম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাবদৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই সেইজন্য তৎ-

ক্ষণাৎ অকপট চিত্তে উত্তর দিলেন "এখানে আছেন বলিয়া আপন দিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান করি তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই। ... ... ইহ শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, তবে আপনি বি মানেন?". বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন "আমার বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।" (১)

যে বিদ্যাসাগর হীনতমশ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখাইয় কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলি সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশন বসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ়বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই দৃষ্টান্ত দেখান গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মান-রক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণতঃ প্রবল সাহেবী অথবা প্রচুর নবাবী দেখাইয়া সম্মান লাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যা-সাগরের উন্নত কঠোর আত্মসম্মানকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বর-চন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিদ্রা "জননী দেবী চরখাসুতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।" (২) সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃ-স্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার বান্ধব তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্ণর হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে রাজসাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে

১ ২ সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নপ্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত।

অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই একদিন চোগা চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না। হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্ত বেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতাবোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি ও শাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণ চর্ম্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়,—মানব ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেই জন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগী অভাবে আমৃত্যুকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন, চারি-

দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্য্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই;—তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না; আড়ম্বর করি কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি;—পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্য্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্ব্বল ক্ষুদ্র হৃদয়হীন কর্ম্মহীন দাম্ভিক তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ব্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বন-জঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শত সহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহান্ চরিত্রের যে অক্ষয়বট বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা

সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যা-সাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংশ্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত, দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্যবীর্য্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, যে, দয়া নহে বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

তুকারামের অভঙ্গ।

পুণা হইতে ৯ ক্রোশ দূরে দেহু নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে তুকা-রামের বসতি ছিল। ইহার পিতা জাতিতে শূদ্র; বেণিয়ার ব্যবসা অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তুকারামের চিত্ত, অল্প বয়স হইতেই সংসারে বীত-রাগ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী, জিজাবাই, অত্যন্ত উগ্রচণ্ডা ছিলেন এবং তাঁহার কঠোর ব্যবহারে তুকারাম বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন; ইহাও তাঁহার বৈরাগ্যের অন্যতর কারণ।

তুকারাম কথকতা করিতেন। তাঁহার কথকতায় সঙ্গীতাদি চিত্তরঞ্জনের কোন সাধন ছিল না। অভঙ্গ-নামক ছন্দে বিরচিত স্বীয় পদাবলী আবৃত্তি করিয়া লোকের নিকট তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। কথিত আছে, কথকতার প্রথা, বোম্বাই-অঞ্চলে, তুকারামই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

তুকারাম শিবাজীর আমলের লোক। তাঁহার অভঙ্গ, বোম্বাই অঞ্চলে অতীব লোকপ্রিয়। তাহাতে ভগবদ্‌ভক্তি, সংসার-বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা, সত্যনিষ্ঠা, অকপটতা ও নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সুশিক্ষিত লোক ছিলেন না; তিনি কেবল তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা-বলেই কবিতা-সকল রচনা করিতেন। তাই, তাঁর কবিতাতে তেমন পদ-লালিত্য না থাকিলেও, একটি অকৃত্রিম সরল সৌন্দর্য্য বেশ অনুভব করা যায়। অরণ্যের অযত্নলালিত তরু-রাজির ন্যায়, তাহার কবিতায়, না-আছে শৃঙ্খলা—না-আছে পারিপাট্য। হয় তো কোন স্থলে ডাল-পালার এত ঘেঁসাঘেঁষি ও জটিলতা যে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। হয় তো, কোন স্থলে শাখা-পল্লবের একেবারেই বিরলতা। উদ্যানে, যেমন স্থানবিশেষে বাছা বাছা সুরভি-পুষ্পতরুর কেয়ারি থাকে—কোথায় গেলে কোন্ ফুলের আঘ্রাণ পাওয়া যাইবে তাহা যেমন পূর্ব্ব হইতেই জানা যায়, তুকারামের কবিতা-কানন সেরূপ নহে;—অলক্ষিত ও অনপেক্ষিত-ভাবে কোথা হইতে যে কোন্ ফুলের আঘ্রাণ পাওয়া যাইবে তাহা কিছুই বলা যায় না। কোথাও বা হয় তো কোন সৌন্দর্য্যই উপলব্ধি হইবে না। কোথাও, সামান্য-জাতীয় তরুর সন্নিবেশ;—কোথাও বা হয় তো স্বর্গীয় পারিজাত, স্বীয় কুসুম-বিভব বিকাশ করিয়া, তাহার দিব্য বিমল সৌরভে দিগ্‌বিদিক্ আমোদিত করিয়া রহিয়াছে।

কবি অপেক্ষা সাধুপুরুষ বলিয়াই তুকারাম বেশি বিখ্যাত। সাধারণতঃ দেখা যায়, উন্নত মহান ভাব-সমূহ, কোন শুভ মুহূর্ত্তে কবির হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া তাহাই তাঁহার লেখনী হইতে প্রসূত হয়—সেই ক্ষণিক সময়ের জন্যই কবির হৃদয়, সেই সকল মহান্‌ভাবে বিস্ফুরিত হইয়া উঠে—তুকারামের ন্যায় একজন ভক্ত কবির রচনা সেরূপ নহে। তাঁহার জীবনের সহিত তাঁহার কবিতা গ্রথিত। তাঁহার কবিতা জীবন-ময় এবং তাঁহার জীবন কবিতা-ময়। তাঁহার রচনাগুলি শিক্ষিত কবির রচনা-হিসাবে না দেখিয়া, একজন অশিক্ষিত ভক্ত সাধুর অকৃত্রিম হৃদয়ের উচ্ছাস-এই ভাবে দেখিলেই তাঁহার সুবিচার হয় এবং তাঁহার রচনার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়।

নমুনা স্বরূপ, আমরা তুকারামের কতিপয় অভঙ্গ অনুবাদ করিয়া পাঠক বৃন্দের নিকট অর্পণ করিতেছি। মূলের সহিত যতটা ঐক্য রাখা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই অমিত্রাক্ষরে রচিত। তাই, আমরাও অমিত্রাক্ষর ছন্দ অবলম্বন করিলাম।

(১)

নাহি মিলে সাধুপনা, হাটে কি বাজারে ;
না মিলে খুঁজিলে উহা গিরি-গুহা, বনে ;
ধন-রাশি দিয়া উহা কেনা নাহি যায় ;
আকাশে নাহিক উহা অথবা পাতালে,
তুকা ভণে, আছে শুধু আপন অন্তরে।

(২)

সাজে যথা বহুরূপী, পালটিয়া বেশ ;
বক যথা ধ্যানে বসে মাছ ধরিবারে ;

অথবা ধীবর যথা ছিপ্ ফেলি জলে
দেখিতে না দেয় তার বড়শির কাঁটা ;
অথবা, কশাই যথা, কাটিবারে গলা,
মিষ্টভাষে পশু পালে করিয়া যতন ;
সেই মত আমি তুকা সাধু লোক-মাঝে
ভাগ্যে প্রভু আমা পরে তুমি কৃপাবান।

(৩)

সহিতে পারি না আমি বিরোধের বাণী
তাহে মোর চিত্ত হয় বড়ই বিকল ;
লোক-সঙ্গ তাই মোর সহে নাকো প্রাণে,
একান্তে থাকিতে আমি তাই ভাল বাসি।
দেহের ভাবনা, আর বাসনার সঙ্গ
একেবারে নাহি রুচে, উপজে বিরক্তি।
তুকা ভণে, আমা-ছাড়ি আছ প্রভু দূরে
তারি লাগি দুখ পাই আশা-মোহ-জালে।

(৪)

মায়েরে ডাকেনা শিশু সান্ত্বনার তরে,
মাতা ধায় শিশু-পাশে আপনারি টানে,
যার ভার সেই দায়ী—আমি ভাবি কেন ?
শিশুর ভাবনা-ভার মাতারি উপরে।
আপনি না খেয়ে মাতা, শিশুটির তরে
তুলিয়া রাখেন, আহা, চাহিবার আগে,
খেলা-মগ্ন যবে শিশু—জননী তাহার
জোর করি ধরি আনি স্তন দেন তাঁরে,

জননীর হিয়া দহে সন্তানের দুখে
কটাহের তাপে যথা খই ওঠে ফুটি ;
তুকা ভণে, বিসরিয়া আপনার দেহ
ঘা লাগিতে নাহি দেন শিশুটির গায়।

(৫)

স্বর্ণ-থালে ক্ষীর দাও কুকুরে খাইতে,
মুক্তাহার গর্দ্দভেরে—শূকরে কস্তুরী ;
বধিরে শুনাও বেদ—মর্ম্ম সে কি জানে ?
তুকা ভণে, সেই জানে—সাধু যেই জনা,
ভক্তির-মহিমা-মর্ম্ম—সেই জানে একা।

(৬)

সাধুর নগরে রাজে প্রেমের সুকাল,
নাহিক তথায় কোন দুখের উদ্বেগ,
তথায় থাকিব আমি হইয়া ভিখারী,
ভিক্ষা মোরে দিবে তথা যত সাধুজনে।
সাধুর নগরে পূর্ণ অর্থের ভাণ্ডার,
তার মাঝে ভগবান একমাত্র ধন।
সাধুর ভোজন পান কেবলি অমৃত
ঈশ্বরের নাম সদা করেন কীর্ত্তন।
উপদেশ-হাটে সদা সাধুর ব্যাপার,
কেনা-বেচা চলে সেথা প্রেম-সুধা-লাগি।
তুকা ভণে, আর কিছু নাহি মিলে তথা,
তাই আমি হইয়াছি সাধুর ভিখারী।

(৭)

ব্রহ্মজ্ঞান ঘরে ঘরে ; কিন্তু যে তাহায়
মিশাল অনেক ; যদি থাকে কারো কাজে

খাঁটি এক রতি, দেরে দুর্ব্বল এজনে।
আশা, তৃষা, দম্ভ, আর কাম ক্রোধ লোভ—
মিশিয়া হয়েছে উহা কালকূট-ভরা;
কাজ নাহি তাহে মোর—চাহি না সে জ্ঞানে,
ব্যর্থ তাহে হয় মাত্র সমস্ত জীবন।

(৮)

লুচি মণ্ডা-কথা বলি' করিছে বড়াই;
মুখে লালা—খালি হাত ঘসিরে এদিকে।
ওইরূপ বাজে কথা অপদার্থ অতি,
লুন বিনা অন্ন যথা আস্বাদনহীন।
দেহে নাহি শূর-পনা কথায় কেবলি
রাজা মন্ত্রি মারি—ধিক্ অমন কথায়!
তুকা ভণে মুখে যেই বড়ই বাচাল
মিথ্যা তার মূলে আছে জানিবে নিশ্চয়।

(৯)

ক্ষুদ্র হওয়া বড় ভাল, না থাকে কাহারো দ্বেষ,
বানে গাছ ভেসে যায়, খাগ্‌ড়া শুধু থাকে।
শু'লে, ঢেউ চলে যায় মাথার উপর দিয়া;
তুকা ভণে, প'লে পায়ে, বলে কিবা করে।

(১০)

প্রাণ(ই) এক দেব তার—ভোজন(ই) ভজন;
মরণ মুকতি তার—পাষণ্ড যে জনা;
জনম কাটায় শুধু দেহেরি পোষণে,
বেদ কি পুরাণ সব মিথ্যা বলি মানে;
যাহা মনে আসে, তাহা করয়ে বিচার;

বলে, ভবে পুন আর আসিতে না হবে ;
পরলোক, পরজন্ম ভাবে সে অলীক,
বিবাদ করিয়া ভরে নিজের উদর।
তুকা ভণে, পাপ পুণ্য নাহি করে ভেদ,
যমদণ্ড পিঠে তার রয়েছে উদ্যত।

(১১)

কন্যা যায় শ্বশ্রূ-গৃহে ফিরে ফিরে চায় ;
তেমতি আমার প্রাণ ; বল প্রভু কবে
দেখা দিবে ? যথা শিশু, হারাইয়া মায়
তাকায় বিহ্বলপ্রায় ; কিম্বা যথা মীন
হ'লে জলহীন ; তথা, তুকার এ দশা।

(১২)

কুমুদিনী জানে কি সে নিজ পরিমল ?
ভ্রমর শুধুই তাহা করে উপভোগ ;
তব নাম তব কাছে তাই অগোচর,
আমিই করিহে তব প্রেমরসাস্বাদ।
তৃণভোজী মাতা, দুগ্ধ বৎস তার খায়,
যার যাহা তার তাহা নাহি আসে কাযে।
তুকা ভণে, মুক্তা থাকে শুক্তিকা-উদরে,
কিন্তু তাহা শুক্তিকার আসেনাকো ভোগে !

(১৩)

কায়মনোবাক্যে তব লয়েছি শরণ,
আর কোন চিন্তা দেব নাহি মোর মনে ;
দুঃখ-ক্লেশ-ভার যাহা বহিতেছি আমি,
তোমা বিনা আর কেবা করিবে মোচন !

তুমি মম প্রভু, নাথ—আমি তব দাস।
দূর হতে আসিতেছি তোমারি পশ্চাৎ ;
তুকা ভণে, ধন্না দিয়া আছি তব পদে,
মিটাও হিসাব প্রভু দিয়া দরশন।

(১৪)

করহে করুণা, দেব, যাচি সকাতরে,
সংসার-বন্ধন মোর ঘুচাও এখনি।
শুনিয়া আমার এই কাতর বচন
হবে নাকি, প্রভু তুমি, উতলা অধীর ?
শূন্য হেরি চারি দিক্ শূন্য সব ঠাঁই,
ও-পদে ভরসা রাখি,' দেখি মাত্র পথ,
কোরো না বিলম্ব আর—এস হে সত্বর
ও গো পিতা ! ও গো মাতা ! বিঠ্ঠল * আমার।
আমার যা কিছু এবে—তুমিই সকলি ;
আর সব শূন্য, আমি জেনেছি বিচারি।
তুকা ভণে, এবে প্রভু, করি কৃপাদান
দেহ তব চরণের পূণ্য দরশন।

বৈদিক উপাখ্যান।

বোম্বাইয়ের সেণ্টজেভিয়ার কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতবর রাজারাম রামকৃষ্ণ ভাগবত মহোদয় কিছুদিন হইতে স্বতন্ত্রভাবে বেদের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিগত দুই

---

* তুকারামের দেবতার নাম বিঠ্ঠল।

সংখ্যক "বিবিধ জ্ঞান বিস্তার" নামক মহারাষ্ট্রীয় মাসিকপত্রে বেদ সংক্রান্ত তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত কতিপয় সূক্তের আলোচনা করিয়া তিনি যে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রকটিত করাই তাঁহার প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ সংখ্যক সূক্তে পণিগণকর্ত্তৃক দেবগণের গোধন হরণ ও সরমা কর্ত্তৃক তাহাদের উদ্ধারবিষয়ক এক উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুসরণপূর্ব্বক বলেন,—"উষা কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে আলোক উদ্ধারই উপমাচ্ছলে সরমা কর্ত্তৃক গাভী উদ্ধাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।" য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অধিকাংশ বৈদিক উপাখ্যানকেই সূর্য্য ও উষাসংক্রান্ত রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

অধ্যাপক ভাগবত এই পণি ও সরমার উপাখ্যান হইতে যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের গোচর করিবার পূর্ব্বে এই সূক্তের সংস্কৃত অনুবাদ এস্থলে প্রদান করা আবশ্যক। প্রবন্ধবিস্তৃতিভয়ে এস্থলে মূল উদ্ধৃত হইল না।

অনুবাদ।

পণিগণ ও সরমার কথোপকথন।

১। কাহার অনুসন্ধানের জন্য সরমা আসিয়াছ? আমাদের নিকট তোমার কি কার্য্য আছে? কত ভ্রমণ করিলে? পথ সত্য সত্যই দূর। গর্জ্জনকারী বা ভয়োৎপাদক তরঙ্গ সমূহ গমনকারীকে

পশ্চাৎপদ হইতে বাধা করে। (ক) রসা নদীর জল কিরূপে পার হইলে? (খ)

২। হে পণিগণ! আমি ইন্দ্রের দূতী; তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাদিগের "নিধি" (আপণ, কি ধনাগার?) অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি। (গ) ভীতিবশতঃ বেগে গভীর নদী (বা সাগর প্রণালী) উল্লঙ্ঘন করিয়া নিরাপদ হইয়াছি। (ঘ) এইরূপে রসা উত্তীর্ণ হইলাম।

হে সরমে। ইন্দ্র কাহার মত? তাঁহার সৈন্য (দৃশীকা) সংখ্যা কত? তুমি তাঁহার দূতী হইয়া দূর দেশ হইতে আসিয়াছ। যদি ইনি (ইন্দ্র) আসেন, এবং ইহাঁর সহিত আমরা মিত্রতা করি, (ঙ) তাহা হইলে, ইনি ইহাঁর নিজের ও আমাদিগেরও গাভীসমূহের অধিস্বামী হইবেন।

৪। ইন্দ্রকে জয় করা আমি সহজ মনে করি না। আমি যাঁহার দূতী হইয়া দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, তিনি সমস্ত জয় করিয়াছেন। গভীর স্রোতস্বতীসমূহ তাঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে। হে পণিগণ ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়া তোমরা ধরাশায়ী হইবে।"

৫। "হে সুভগে সরমে! "দিব্" প্রদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত যে

(ক) মূলে আছে "পরাচৈঃ"; ভাগবত অর্থ করিয়াছেন,—যাহা পশ্চাদ্‌পদ হইতে বাধ্য করে। দত্তমহাশয়ের অনুবাদ এই,—এপথে আসিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আসা যায় না।"

(খ) মূলে আছে, "কথং রথযোঃ অতপঃ পয়াংসি।" নদী সূক্তের (১০।৭৫।৬ ঋকের) বর্ণনানুসারে "রসা" সিন্ধুনদের কাবুলপ্রদেশীয় শাখাবিশেষ বলিয়া বোধ হয়। রমেশ বাবু এখানে "রসা" অর্থে সামান্যত নদী গ্রহণ করিয়াছেন।

(গ) মূল—ইচ্ছন্তী—অম্বিচ্ছন্তি।

(ঘ) জলে আমাকে রক্ষা করিয়াছে, জলের ভয় হইল, পাছে আমি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক চলিয়া যাই। রমেশবাবুর অনুবাদ।

(ঙ) তিনি আসুন, আমরা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

গাভীগণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তুমি আসিয়াছ, তাহারা এই-খানে রহিয়াছে। তোমার সঙ্গে এমন কে আছে, যে বিনাযুদ্ধে এই গাভীগণকে মুক্ত করিবে? (ক) বিশেষতঃ আমাদিগের অস্ত্র-সমূহ তীক্ষ্ণধার।”

৬। “হে পণিগণ! তোমাদের বাক্য সৈনিকোচিত নহে। তোমাদের পাপময় দেহ যেন (ইন্দ্রের) বাণ সহ্য করিবার উপযুক্ত না হয়; তোমাদের পথ যেন দেবগণের গতিরোধক না হয়। তোমাদের শরীর ও বাক্যের পক্ষে বৃহস্পতি সুখকর হইবেন না।”

৭। “হে সরমে! গো, অশ্ব ও ধনপূর্ণ এই নিধি (আপণ Emporium) পর্ব্বতের আশ্রয়ে রহিয়াছে। রক্ষণকুশল পণি-গণ উহা রক্ষা করিতেছে। এই সুদৃঢ় স্থানে তুমি বৃথাই আসি-য়াছ। (খ)”

৮। “সোমের (সোম নামক ঋষির) দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, অঙ্গিরোবংশীয় নবগ্ব (গ) নামক ঋষিগণ ও অযাস্য (ঋষি বিশেষ, (আমার সঙ্গে) আসিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই এই গাভীগণের বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন (ঘ)।” অনন্তর পণিগণ বলিল; (ঙ)

৯। হে সরমে! তুমি দেবগণের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া

(ক) রমেশ বাবুর অনুবাদ,—‘তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হইতে আসিতেছ, অতএব তোমাকে এই সকল গাভীর মধ্য হইতে যে কয়টি ইচ্ছা কর দিতেছি। বিনাযুদ্ধে এই সকল কেহ বা তোমাকে দিত?”

(খ) “তুমি গাভীর শব্দ শুনিয়া এই স্থানে আসিয়াছ; কিন্তু তোমার আসা বৃথাই হইয়াছে।” রমেশ বাবুর অনুবাদ।

(গ) অধ্যাপক ভাবেক্ত বলেন, অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণ নবগ্ব ও দশগ্ব এই দুই শাখায় বিভক্ত ছিলেন।

(ঘ) “তাঁহারা এই বহু পরিমাণ গাভী ভাগ করিয়া লইবেন।” রমেশ বাবু অনুবাদ।

(ঙ) মূলে আছে,—“অথৈতদ্ পণয়ো বমন্নিৎ।” হে পণিগণ। তোমাদিগকে এই দর্পের উক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে।” রমেশ বাবুর অনুবাদ।

এখানে আসিয়াছ (চ)। আইস, তোমাকে আমরা ভগিনীরূপে গ্রহণ করি। তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। হে সুভগে তোমার গাভীগুলি তোমাকে দিতেছি।

১০। আমি ভ্রাতা জানি না, ভগিনী জানি না; এ কথা ইন্দ্র জানেন, এবং ঘোরদর্শন আঙ্গিরসগণও জানেন। আমি যখন আসিলাম, তখন, যাঁহারা গাভীগণকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আমার রক্ষার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। হে পণিগণ, এখান হইতে দূরতর দেশে প্রস্থান (পলায়ন কর)।

১১। হে পণিগণ, এস্থান হইতে দূরতর প্রদেশে প্রস্থান কর। ধাবনশীল গাভীগণ গৃহমুখে ধাবিত হউক্ (ছ)। এই লুক্কায়িত গাভীগণকে বৃহস্পতি, সোম, এবং বিদ্বান ● প্রস্তরসদৃশ দৃঢ়কায় ঋষিগণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। অর্থাৎ প্রাপ্ত হইলেন। (জ)

বলিয়াছি, এই উপাখ্যানকে রমেশ বাবু উষাকর্ত্তৃক প্রাতঃকালে আলোকউদ্ধারবিষয়ক উপমা বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক ভাগবতের মতে এই সূক্তে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা এই ;—

প্রাচীনকালে পণি নামে এক জাতি ছিল ; এবং আর্য্যজাতির শাখাবিশেষ "দেব" নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং পণি শব্দের

(চ) "দেবতারা তোমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া এইস্থানে পাঠাইয়াছেন ; এই নিমিত্তই তুমি আসিয়াছ।" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

(ছ) মূলে আছে,—'মিনতীঋতেন"। ভাগবত অর্থ করিয়াছেন ;—ধাবন্ত্যঃ পথেন ;' এবং গ্রাবাণো ঋষয়শ্চ বিপ্রাঃ" "পাষাণ সদৃশা বিদ্বংসঃ।"

(জ) মূলে আছে, "অবিন্দন্"। রমেশ বাবুর অনুবাদে এইরূপ ;—গাভীগণ কষ্ট পাইতেছে। তাহারা ধর্ম্মের আশ্রয়ে এই পর্ব্বত হইতে উঠিয়া চলুক। বৃহস্পতি সোমপ্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ এই সকল গুপ্তস্থানস্থিত গাভীগণের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন।"

ন্যায় "দেব" শব্দও জাতিবাচক (৮ম ও ৯ম ঋক্ দ্রষ্টব্য)। (১) পণিগণ ও দেবগণের প্রদেশের মধ্যে সমুদ্র, সাগর-প্রণালী বা নদী (নদী হইলে সম্ভবতঃ কাবুল প্রদেশীয় রসা নামক নদী) ব্যবধান ছিল (১ম ও ২য় ঋক্)। এই দুই প্রদেশের অন্তরও নিতান্ত অল্প ছিল না (৩য় ও ৪র্থ ঋক্)। দেবগণ যে প্রদেশে বাস করিতেন, তাহাকে "দিব্" বলিত (৫৫ম ঋক্)। 'ইন্দ্র' এই দেবউপাধিধারী আর্য্যগণের রাজা ছিলেন। পণিজাতি নিতান্ত দরিদ্র ছিল না। তাহাদিগের গো, অশ্ব, ধন, সৈন্য সামন্ত, অস্ত্র শস্ত্র ও গড় বা নিধি ছিল (৫ম ও ৭ম ঋক্) পণিগণ দেবগণের গাভীসমূহ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল (৫ম ঋক্)। তাহাদের (গাভীগণের) অনুসন্ধানের জন্য দেবগণ সরমা নামক এক দূতী প্রেরণ করিয়াছিলেন (২য় ঋক্) সরমা গর্জ্জনকারী তরঙ্গময় সমুদ্র বা সাগরপ্রণালী বা রসা নদী উত্তীর্ণ হইয়া পণিগণের দেশে উপস্থিত হইয়াছিল (১ম ও ২য় ঋক্) সরমার সঙ্গে বৃহস্পতি, অযাস্য, সোম ও নবগ্ব উপাধিধারী পরাক্রান্ত আঙ্গিরস ঋষিগণ (সৈন্যগণ) পণিগণের দেশে গমন করিয়াছিলেন (৫ম, ৮ম, ৬ষ্ঠ ও ১১শ ঋক্)। (২) অধ্যাপক ভাগবতের মতে ইহাই এই সূক্তের ফলিতার্থ।

অধ্যাপক ভাগবত অনুমান করেন, এই সূক্তে "বৃহস্পতি" অর্থে "সেনাপতি" ও ঋষি অর্থে "সৈনিক পুরুষ" হওয়া সম্ভব।

১ শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহোদয় মধ্য আসিয়াবাসী (উত্তরকুরুবাসী) আর্য্যগণকে Deva-Aryans নামে অভিহিত করিয়াছেন।

২ ৩য়, ৪ম, ১০ম ও ১১শ ঋকের বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয় যে, পণিগণ বোধ হয় ভীত হইয়া প্রথমতঃ ইন্দ্রের ও সরমার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া অপহৃত গাভীর কতকগুলি প্রত্যর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু সরমা এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। পরিশেষে বৃহস্পতি, সোম ও মেধাবী, পাষাণ সদৃশ দৃঢ়কায় ঋষিগণ পণিজাতির হস্ত হইতে আপনাদের গোধন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনুবাদক।

সোম কোনও সেনাপতির নাম বলিয়া অনুমিত হয়। তিনিই ঘোরদর্শন আঙ্গিরস ঋষিগণকে (সৈন্যগণকে) উত্তেজিত করিয়া পণিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। পণ্ ধাতুর অর্থ ক্রয় বিক্রয় করা। সুতরাং পণি শব্দের মূল অর্থ "পণ্যজীবী" হইতে পারে। পণি শব্দের সহিত "বণিক্" শব্দেরও বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ফিনিস্ (Phœnicians) ও "পণিঃ" কি এক? ফিনিস্ জাতি প্রাচীনকালে পণ্যজীবী ও জলদস্যু বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সীরীয়ার দক্ষিণপশ্চিমে ও মিসর দেশের পূর্ব্বোত্তরে প্রাচীন ফিনিস্ জাতির বাস ছিল। অনেকের বিবেচনায় পণিগণের "আদিম নিবাস ভূমি" পারস্যোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে ছিল।

"ঋগ্বেদীয় সর্ব্বানুক্রম" প্রণেতা কাত্যায়ন পণিগণকে এই সূক্তের ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক ভাগবত বলেন, পণিগণ বা সরমা এই সূক্তের ঋষি হইতে পারেন না। কারণ অষ্টম ঋকের—

"অথৈতদ্ বচঃপণয়ো বমন্নিৎ"

"অনন্তর পণিগণ এই বাক্য বলিল,"

এই উল্লেখের দ্বারা অনুমিত হয় যে, পণি ও সরমার কথোপকথনমূলক এই ইতিবৃত্ত সরমার মুখে বা অপর কাহারও মুখে শ্রবণ করিয়া, কোনও ঋষি এই সূক্ত রচনা করিয়াছেন। এই সূক্তের প্রণেতার নাম অবগত হইবার কোনও উপায় নাই। সর্ব্বানুক্রম রচনাকালে কাত্যায়ন যে সকল সূক্তের প্রণেতৃ ঋষির নাম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই, সেই সকল সূক্তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও একটি ব্যক্তিকে সেই সূক্তের প্রণেতৃ ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কতিপয় উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

ঋগ্বেদের সময়ে, গৃহোপরি কপোতের উপবেশন অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। দশম মণ্ডলের ১৬৫ সংখ্যক সূক্তে কোনও ঋষি, নির্ঋতির দূত কপোতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। এই সূক্তের প্রণেতার নাম জানা যায় না। কাত্যায়ন বলেন, "নির্ঋতির পুত্র কপোত" এই সূক্তের ঋষি বা প্রণেতা!

দশম মণ্ডলের ১৩৯ সূক্তের প্রথম ঋক্ এই—

"বিশ্বাবসুং সোম গন্ধর্ব্বমাপো দদৃশুষীস্তদৃতেনা ব্যায়ন্।
তদন্ববৈদিন্দ্রো রারহাণ আসাং, পরিসূর্য্যস্য পরিধীঁরপশ্যৎ।"

এই মন্ত্রে কোনও ঋষি সোমকে সম্বোধন করিয়া বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের কার্য্যকলাপের বিষয় পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সূক্তে প্রণেতার নাম নাই; কাজেই কাত্যায়ন এই সূক্তোক্ত বিশ্বাবসুকে ইহার প্রণেতা কল্পনা করিয়া সূক্তস্রষ্টা ঋষির তালিকা সম্পূর্ণ করিয়াছেন! এইরূপ আরও অনেক সূক্ত ও মন্ত্র উল্লিখিত হইতে পারে। ফল কথা, কাত্যায়ন যেখানে প্রকৃত সূক্তপ্রণেতার নাম প্রাপ্ত হন নাই সেইখানেই সূক্তপ্রোক্ত ব্যক্তিবিশেষকে প্রণেতৃ ঋষি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। আমাদিগের সমালোচ্য সরমা ও পণি সম্বন্ধীয় সূক্ত সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণ প্রযুজ্য।

কাত্যায়নের সর্ব্বানুক্রমে সরমাকে "দেবশুনী" বলা হইয়াছে। কাত্যায়ন কোন্ অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। পৌরাণিক এই "দেবশুনী" শব্দের দ্বারা "দেবগণের কুক্কুরী" বুঝিয়াছেন। বেদে কিন্তু সরমাকে কুক্কুরী বলা হয় নাই—কেবল "ইন্দ্রের দূতী" বলা হইয়াছে। কাত্যায়নের দেবশুনী শব্দের অর্থ "কুক্কুরীর ন্যায় বিশ্বাসিনী" হওয়া অসম্ভব নহে। ফল কথা, কাত্যায়নের ব্যবহৃত শুনী শব্দের অর্থ স্পষ্টতঃই সন্দিগ্ধ।

কিন্তু পৌরাণিককালে লাক্ষণিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাঙ্কেতিক অর্থ গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, "দেবশুনী সরমা" দেবগণের কুক্কুরী রূপে পরিণতা হইলেন।

এই সূক্তটিকে অধ্যাপক ভাগবত "ঐতিহাসিক সূক্ত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার বিবেচনায় আর্য্য জাতির সহিত পণি জাতির বিরোধমূলক ঐতিহাসিক বৃত্তান্তকে ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই সূক্ত রচিত হইয়াছে।

অ্যাংলো-বাৎসল্য।

সকল দেশেই, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, জনসাধারণকে মোটামুটি তিন দলে ফেলা যায়। এক দল পরি-বর্ত্তন-প্রিয়, এক দল পুরাতনাসক্ত, এবং এক দল উভয়ের মধ্য-মতাবলম্বী। বাঙ্গলা দেশেও এই তিন দলের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, তবে প্রথম দুই দল কিছু অসঙ্গত আকার ধারণ করিয়াছে।

আমাদের পুরাতন-প্রিয় দল মুখে পুরাতনের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিলেও, কাজে তাঁহারা প্রচলিত দেশাচারকে সম্পূর্ণ-রূপে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ, ও উহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তনকে দূষ্য ও অবনতিসূচক জ্ঞান করেন।

আমাদের পরিবর্ত্তন-প্রবণ দল পাশ্চাত্য, বিশেষতঃ ইংরাজি, সভ্যতাকে আদর্শ করিয়াছেন এবং ভাবে বোধ হয় যে, উহারই নকল করাকে উন্নতির প্রধান বা একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মধ্যস্থ দল, স্বদেশ ও দেশী জিনিষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা সত্ত্বেও, তাহাদের মধ্যে অনেক সংশোধনের বিষয় দেখিতে পান, অপর পক্ষে, সংস্কারের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও, ইংরাজি আচার, ব্যবহার কতদূর আমাদের দেশের উপযোগী, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা কতদূর আমাদের অভাব মোচনে সক্ষম, সে বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ সন্দিহান।

এই তৃতীয় দলে আমরা স্থান পাইতে অভিলাষী এবং ভরসা করি আমরা যাহা বলিব তাহা এই দলের উক্তিস্বরূপ গৃহীত হইবে।

স্থিতিশীল দলের মতের যে অংশকে আমরা দূষ্য ও ক্ষতিজনক মনে করি, তাহার দূরীকরণের নিমিত্ত আমাদের তত প্রয়াস পাইতে হইবে না। প্রথমতঃ স্বজাতি এবং দেশীয় জিনিষের প্রতি অনুরাগসূত্রে আমাদের মূলে দৃঢ় বন্ধন রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে অনৈক্য আছে তাহার বিনাশনিমিত্ত স্বয়ং কালের গতি আমাদের পক্ষে আছে--উহারই প্রভাবে স্থিতিশীল দল হইতে আমাদের দল ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছে।

কিন্তু যে পরিবর্ত্তন-প্রিয় দলের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঠিক বিপরীত। কাল এবং অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে, যাহার দেশের দৈন্য-দশা দেখিয়া মমতা না জন্মায়, দেশের মহত্ত্ব সাধনের উত্তেজনায় বা সুবিধার প্রলোভনে তাহার দেশানুরাগ উদ্রেক করিবার বড় উপায় নাই। এই নিমিত্ত, মাতৃভূমিবৎসল বঙ্গসন্তান মাত্রেরই এক্ষণে বিশেষ সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে, যাহাতে, অলক্ষিতভাবে দেশের হীনাবস্থার নিমিত্ত লজ্জা বিদ্বেষে না পরিণত হয়, এবং অবনতিজনিত দুঃখ পলায়নে না প্রবৃত্ত করে। আমরা যে দল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি তাঁহাদের এইরূপই ঘটিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের ভ্রম অনু-

সন্ধান করিলে, আমাদের কোন্ বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে তাহা বুঝা যাইবে, উহাঁদেরও দলে ফিরাইয়া আনিবার উপায় প্রকাশ পাইতে পারে।

আলোচ্য দলকে সংক্ষেপে "অ্যাঙ্গ্লোবৎসল" নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহাঁদের মূল মতের পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইংরাজদের অপেক্ষা হাল বিলাতী ধরণ ধারণ সম্বন্ধে বেশী খবর রাখা, উহাদের অপেক্ষা ইংরাজি কথায় সজোরে accent ফেলা ও বঙ্গভাষাকে দ্বিগুণ বিকৃতরূপে উচ্চারণ করা প্রভৃতি দুই চারিটা বাহ্য লক্ষণের দ্বারা উঁহাদের সহজে চেনা যায়। কালাপানি পার হইলেই যে বাঙ্গালীর এইপ্রকার বিলাতী বিকার জন্মে তাহা নহে, আজকাল সমুদ্রের নীলজলে অভিষেক না হইতেই কেবল লাল জলের এমন কি শাদা জলের সিঞ্চনেও ঘোরতর সাহেবিয়ানা বিকশিত হইবার কোন বাধা ঘটে না।

যে বাহ্য লক্ষণ আমরা বর্ণনা করিলাম তাহাই যদি অ্যাঙ্গ্লো-বৎসল সম্প্রদায়ের চরিত্রের প্রধান অঙ্গ হইত তাহা হইলে উহারা আমাদের উপহাসের পাত্র হইত মাত্র; ভীতিরও কোন কারণ থাকিত না, উহাদের দলে টানিবারও কোন প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু উহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, মূলে তাঁহাদের অনেক ভাল গুণ আছে সে গুলি এইরূপ অপ্রীতিকর হানিজনক আবরণে চাপা পড়াটা বড় দুঃখের বিষয়। সত্যের ও মতের প্রতি নিষ্ঠাবশতঃই আমাদের দেশের ত্রুটি সকল ইঁহারা কিছু অধিক পরিমাণে অনুভব করেন, কাজে কথায় অমিল বর্দ্দাস্ত না করিতে পারায় ইঁহারা দেশীয় ভাবের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন এবং দেশের হীনতা ও কপটতা হইতে পলায়নোদ্দেশেই বিলাতি ভাবের আশ্রয় লইয়াছেন।

বিলাতি আচার অবলম্বন করা সম্বন্ধে অ্যাংলোবৎসলেরা অন্ত

কৈফিয়ৎও দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন দেশী বিদেশী লইয়া মারামারী করিবার প্রয়োজন কি? ভাল এবং মন্দের উদার ভিত্তির উপর কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় যুক্তি স্থাপন করা উচিৎ। ইংরাজ জাত আমাদের অপেক্ষা সুসভ্য এবং মহৎ, তাহার আর কোন প্রমাণ না থাক, উহারা যে আমাদের অনায়াসে জয় করিয়া এত সহজে সুশাসনে রাখিতেছে ইহাই তাহার প্রমাণ। অতএব উহাদের চাল চলন আচার ব্যবহার, এক কথায় উহাদের সভ্যতার সমস্ত অঙ্গ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য, উহাই উন্নতির পথ।

কিন্তু উপরিউক্ত যুক্তি কি ইঁহাদের বিপক্ষ পক্ষ সমর্থন করিতেছে না? আমরা ইংরাজদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি তাহা কেহ সন্দেহ করে না, কিন্তু, আমাদের শ্রেষ্ঠ লোকে এরূপ তফাতে সরিয়া গিয়া বিলাপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, ইহাই কি তাহার এক প্রধান কারণ নহে? শ্রেষ্ঠ জাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, ইহারইবা ভূল কি, কিন্তু তাহাই কি ইঁহারা করিতেছেন?

ইংরাজের দেশানুরাগকে উহারা স্বদেশঘৃণাতে তর্জ্জমা করিয়া লইয়াছেন, ইংরাজের দেশীয় আচারের প্রতি ভালবাসাকে অদ্ভুত বিদেশী আচরণের নকলে পরিণত করিয়াছেন, ইংরাজের আত্মসম্মানে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের খোসামোদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং দুর্ব্বল স্বদেশীয়ের প্রতি বুটের অগ্রভাগ প্রয়োগ করিয়া ইংরাজি বীরত্বের সাধ মিটাইতেছেন, ইংরাজ 'Englishman' নাম সগৌরবে আস্ফালন করেন বলিয়া উহাঁরা বাবু নাম লুকাইবার স্থান পান না এবং ইংরাজরা উক্ত গুণ সমুদায়ের নিমিত্ত সর্ব্বত্র সম্মান পান বলিয়া বঙ্গীয় সাহেবেরা উহাঁদের পরিচ্ছদাদি নকল করিয়া ফিরিঙ্গি সাজিয়া সেই সম্মানের উচ্ছিষ্ট অংশ কুড়াইয়া লইবার জন্য পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

ইংরাজের ভাল গুণ সকলের প্রতি আমাদের যথার্থ ভক্তি আছে বলিয়াই, এবং সেগুলি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি বলিয়াই আমরা এরূপ আচরণকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করি।

অনুকরণ-চেষ্টার এরূপ অদ্ভুত পরিণাম হইয়াছে তাহাই আমাদের দুঃখের এক মাত্র কারণ নহে। উক্ত চেষ্টায় মত্ত হইয়া অনুকরণকারীরা যে দেশী ভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন ও স্বজাতি হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন, এক কথায়, দেশের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছেন, ইহাই বরং অধিক দুঃখের কারণ। এবং দেশের এতগুলি কৃতবিদ্য ধনী ও উচ্চপদস্থ লোক তাঁহাদের গুণ, অর্থ ও প্রভাব দেশের সমাজগঠনের কাজে না লাগাইয়া, ইংরাজি সমাজে প্রতিপত্তি লাভের বিফল চেষ্টায় ব্যয় করিতেছেন দেখিলে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

কিন্তু আলোচনাকালে যদিও লোকে সেণ্টিমেণ্টের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে তথাপি কাজের বেলায় সুবিধা অসুবিধার প্রতিই অধিক নির্ভর করিয়া থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে কর্তৃপক্ষীয়দের চালচলন অবলম্বন করাতে সুবিধা আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যাহারা আমাদের চাহে না পরন্তু ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহাদের মনস্তুষ্টির বৃথা চেষ্টা কি সুখের বিষয় সুবিধার অবস্থা হইতে পারে? কোটের ছাঁট অথবা নেক্-টাইয়ের রং ঠিক হইল কি না, কাঁটা চামচ ধরিতে বা ইংরাজি কথায় Accent ফেলিতে কোন ত্রুটি হইল কি না, Esq এর বদলে কেহ বাবু লিখিয়া ফেলিল কি না, এই ভাবনা লইয়া দিন কাটাইয়াও কি নেটিভত্বের অসুবিধা ঘুচে? ফিরিঙ্গিভ্রমে কোন মুটে সাহেব বলিয়া ডাকিতে পারে বটে, স্বয়ং পাহারাওয়ালা হয়ত বা সেলাম করিয়া বসিতে পারে, কিন্তু ইহা কি এমনিই সুখ যে ইহাকে আত্মগ্লানিদ্বারা ক্রয় করা পোষায়?

এক আপত্তি হইতে পারে যে দেশী কাপড় তেমন পরিপাটি নহে, সত্য, কিন্তু যাঁহারা অধিক রুচি ও অভিজ্ঞতা বশতঃ এ অপ্রিয় সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহারাই যদি উক্ত কাপড় ত্যাগ করেন তাহা হইলে উহার কি উপায়ে উন্নতি হইবে। বাবু নাম ধরিয়া ইংরাজরা অপমান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে নাম হইতে পলায়ন কি মানী লোকের পরিচয়? পলায়নই কি সুনাম উপার্জ্জন করিবার উপায় বলিয়া খ্যাত? সর্ব্বদা অপরাধীর ন্যায় নিজের কাছ হইতে পালাইয়া বেড়ান অপেক্ষা বাবু নাম, বাবু পরিচ্ছদ ও বাবু আচরণ উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবার ব্রত অবলম্বন করিয়া মস্তক তুলিয়া ও বুক ফুলাইয়া নির্ভীক জীবন ধারণ করাই কি শতগুণ সুখের কারণ নহে—এবং সুখেতেই কি প্রকৃত সুবিধা নহে?

উপসংহারে আমেরিকা সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাউক।

……The social position of the man in whose veins negro blood courses is unalterably fixed at birth. The child may grow to be wise, to be wealthy, to be entrusted even with the responsibilities of office, but he always bears with him the visible marks of his origin and these marks condemn him to remain forever at the bottom of the social ladder. …… A white man may be ignorant, vicious and poor, for him, in spite of all, the door is ever kept open, But the black, or colored man, no matter what his personal merits may be is ruthlessly shut out. The white absolutely declines to

associate with him on equal terms. A line has been drawn ; ...... and it is not only the uneducated and the easily prejudiced who have drawn the line thus sharply.

ইংরাজদের দোষ দিবার উদ্দেশে আমরা এই Extract তুলি নাই। আমরা কেবল এই কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি যে, শ্বেতাঙ্গ আমাদের পরিচ্ছদ বা আচারের উপর যত না চটা আমাদের বর্ণের উপর ততোধিক, এবং রাগের শেষোক্ত কারণ আমরা দূর করিতে পারিব না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য বশতঃ তাহার প্রতি ছুটিয়া যাইবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু প্রাচ্য জাতির সে সভ্যতার গণ্ডির মধ্যে প্রবেশাধিকার নাই তাহা স্মরণ রাখিলে তাড়িত হইবার অপমান ভোগ করিতে হইবে না। ইহাও বিস্মৃত হওয়া উচিৎ নহে যে উক্ত সভ্যতা বাহির হইতে যতটা মনোহর ভিতরে তত নহে। উহার বড় বড় অট্টালিকার স্তূপ ও সুবিস্তীর্ণ রাজ-পথ তাড়িৎপথের জাল প্রভৃতি ধনের লক্ষণ, এবং চিত্রশালা, নাট্যশালা, গীত-বাদ্য-নৃত্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি সুখের আয়োজন আছে বটে, কিন্তু উহার তলে আহার-বস্ত্রহীন, ধর্ম্মহীন, আশাহীন, অনেকস্থলে মনুষ্যত্বহীন চির-দুঃখী দরিদ্র সংখ্যার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনও আছে, দুই দিক এক সঙ্গে বিবেচনা করিলে কি এই অত্যহঙ্কৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তত প্রবৃত্তি হয়?

সেই জন্যই বলিতেছি যে দেশীয় ভাবরূপ নোঙর ছাড়িয়া একবার বিলাতি সভ্যতার সমুদ্রে রীতিমত ভাসিয়া পড়িলে, দেখিব

যে, আর উপায় নাই, দাঁড়াইবারও স্থান নাই, ফিরিবারও সুবিধা নাই, এবং যেস্থানে যাইতে অভিলাষ সেখানে কিরূপ অভ্যর্থনা পাইবার সম্ভাবনা তাহাও পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে।

আর কোন কারণে না হোক, আত্মরক্ষার নিমিত্ত স্বজাতিকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, এবং বিদেশীয় লাঞ্ছনার দুঃখ এড়াইবার জন্য দেশানুরাগ আবশ্যক।

সম্পদ-ব্রত।

রাজা রাজমহিষী পাশা খেল্‌তেছিলেন। রাজা হার্‌তেছিলেন—রাণী জিত্‌তেছিলেন। খেলিতে খেলিতে রাণী কহিলেন—রাজা আমাকে একখানি পুরী নির্ম্মাণ করে দাও।

রাজা বল্লেন আচ্ছা। উঠে, এক পা দু' পা গেলেন। রাজা, হাড়ি সাত জনা মালী সাত জনা ডাক্‌লেন। দিঘি দিলেন,—পুকুর দিলেন। ফুলের বাগিচা দিলেন,—ফলের বাগান দিলেন। পুরী নির্ম্মাণ ক'রে বল্লেন হে রাজমহিষি, পুরী নির্ম্মাণ করেছি—দেখে যাও।

রাণী ১৬ সখী লয়ে গেলেম। যেয়ে দেখেন—দিঘিতে জল উদ্ধার হয়নি-পুকুরে জল উদ্ধার হয়নি। এক পুকুরের জল আর এক পুকুরে পড়ে না—হলহল করে না-কলকল করে না। ফুলের গাছে ফুল ধরে না—ফলের গাছে ফল ধরে না। পাইকে সিকে যোগান দেয় না। হাতী চেঁচায় না; ঘোড়া

মেমায় না। ধূলি মাটীতে অন্ধকার হয় না'। দেখে, রাণী, গোসা ক'রে শুয়ে থাক্‌লেন।

রাজা এসে বল্লেন,—হে রাজমহিষি কেন শুয়ে রয়েছ? রাণী বল্লেন—ছাইয়ের পুরী নির্ম্মাণ করেছ—দিব্য পুরী নির্ম্মাণ হয় নাই! শুনে, রাজা বল্লেন—এও কি একটা কথা!

আবার রাজা দেখ্‌তে গেলেন। হাড়ি সাত জনা মালী সাত জনা ডাক্‌লেন। তখন দিঘিতে জল উদ্ধার হ'লো—পুকুরে জল উদ্ধার হ'লো। এক পুকুরের জল আর এক পুকুরে পড়্‌তে লাগ্‌লো—হল্ হল্ কর্‌তে লাগ্‌লো—কল্ কল্ কর্‌তে লাগ্‌লো। ফুলের গাছে ফুল ধর্‌লো,—ফলের গাছে ফল ধর্‌লো। হাঁসাহাঁসি খেল্‌তে লাগ্‌লো।—ময়ূরে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌লো। হাতী চেঁচাতে লাগ্‌লো—ঘোড়া মেমাতে লাগ্‌লো। ধূলা মাটীতে অন্ধকার হ'লো।—পাইকে সিকে যোগান ধর্‌লো।

তখন রাজা বল্লেন,—"যাও রাজমহিষি,—পুরী নির্ম্মাণ দেখগে যাও"।

রাজমহিষী তখন ১৬ সখীকে ডেকে নিলেন। ঝাঁপ দিলেন—স্নান কর্‌লেন। ফুল তুল্‌লেন--পূজা কর্‌লেন। ফল তুল্‌লেন—জল খেলেন, দান বিতরণ কল্লেন। রাণী বল্লেন,—

সকল সইএর সরস মন,
বামন সই,—তোমার কেন
বিরস মন?

১২ বৎসর ধরে' আমার পতি পুত্র বিদেশ গেছে,—মনের দুঃখে মুখে হাসি আসে না। রাণী বল্লেন ওমা এও কি একটা কথা!

এক বৎসর যাক্। চৈত যায় বৈশাখ আসে—মহাবিষুব

সংক্রান্তির দিন আমার বিধানে ব্রত করো—আমারি বিধানে কথা শুনো। তা হ'লে তোমার পতি পুত্র দেশে আস্‌বে।

শুনে, সই বল্লেন,—এক দিনের দুঃখ সইতে পারি না এক বছরের দুঃখ সব কেমনে?

একবৎসর গেল। রাণী বল্লেন:—শুন সই ব্রতের বিধান কই। মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন একটি আস্ত কাপাস এনে হাতেই কেটো—হাতেই পিঁজো—সুতা বাহির করো—৩০ খেই সুতা কানে দিও, আর ৩০ দিন ভরে সম্পদের কথা শুনো। শেষ সংক্রান্তির দিন ৩×৩০ ক্ষিরের পুলি বানিও। ৩×৩০ পানের খিলি কোরো, ৩×৩০ খানা গুয়া কেটো; ৩×৩০ খানা কলা কেটো। ব্রত করো। কথা শুনিও।

গঙ্গার ৩০ পুলি গঙ্গাকে দিও। বোন্ বঁধুনীর * ৩০ পুলি বোন্ বঁধুনিকে দিও। পুরোহিতের ৩০ পুলি পুরোহিতকে দিও। ব্রতীর ৩০ পুলি ব'সে খেও।

কথা কইতে নড়ো সই,
পিঠা খেতে নড়োনা।

ব্রতী ব্রত কর্‌লেন—কথা শুন্‌লেন। গঙ্গার ৩০ পুলি গঙ্গাকে দিলেন, পুরোহিতের ৩০ পুলি পুরোহিতকে দিলেন—উঁহার পুলি উনি খেতে বস্‌লেন। এক পিঠায় যেই কামড় দিয়াছেন অমনি পাড়া পড়সি ডেকে বল্লো—

সই আলো, সই আলো,
ঐ তোর পতি পুত্র দেশে এলো।

উনি তখন কি কর্‌লেন:—হাতের পিঠে পাতে থু'লেন, মুখের

* বোন্-বঁধুনী—এস্থলে বোন্ শব্দ বঁধু শব্দের অপভ্রংশ। বোন্ বঁধুনী অর্থে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী বুঝাইতেছে।

পিঠা মাটীতে ফেল্‌লেন। কপালের সিন্দুর পুঁছে ফেল্‌লেন। ধোব কাপড়ে কালী ভরালেন; কুল ধূল দিয়ে ফিরে চাইলেন—ছিকণ গলায় দীঘল স্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

এলো পতি গেল ফিরে
এলো পুত্র গেল ফিরে॥

এদিকে রাজমহিষী বল্লেন ঃ—দেখ্‌লো দাসী বেটি, দেখ্‌লো বাঁদী বেটি, কি বিধানে বামন সই ব্রত কর্‌লো—দেখে আয়গে।

দাসী বেটি বাঁদী বেটি এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লো ঠাক্‌রুণ আলো—রাণী মা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন—কি বিধানে ব্রত করেছো—কি বিধানে কথা শুনেছো?

সই বল্লেন—ছার ব্রত করেছিলেম বৃথা ব্রত করেছিলাম ঃ—

এলো পতি গেল ফিরে
এলো পুত্র গেল ফিরে।

দাসী বেটি বাঁদী বেটি ফিরে এসে বল্লে—বামনসই তোমাকেও নিন্দিছে তোমার ব্রতকেও নিন্দিছে।

চাকর চাকরাণী ডাক দেও—আমি সইএর বাড়ী যাব। গেলেন। যেয়ে বল্লেন—সই,—আমাকে বা নিন্দিছ কেন আমার ব্রতকেই বা নিন্দিছ কেন!

তোমাকে কি নিন্দিছি—তোমার ব্রতকে কি নিন্দিছি—আমার কপাল শুঁড়্‌চি।

রাণী বল্লেন, সই, কি বিধানে ব্রত করেছিলে কি বিধানে কথা শুনেছিলে?

তা তুমি যা যা বলেছিলে তাই তাই করেছিলাম, ব্রত করেছিলাম—কথা শুনেছিলাম। গঙ্গার পুলি গঙ্গাকে দিয়ে, পুরোহিতের পুলি পুরোহিতকে দিয়ে আপনার পুলি আপনি খেতে বসে

ছিলাম। এক পিঠায় কামড় দিয়েছি এমন সময় পাড়াপড়সি ডেকে বল্লে ঃ—

সই আলো সই আলো,
ঐ তোর পতি পুত্র দেশে এলো।

তাই শুনে হাতের পিঠে পাতে থুলেম। মুখের পিঠে মাটীতে ফেল্‌লেম—কপালের সিন্দুর মুছলেম। ধোব কাপড়ে কালী ভরালেম, চিকণ গলায় দীঘল সুরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম।

এলো পতি গেল ফিরে,
এলো পুত্র গেল ফিরে।

রাণী বল্লেন—শুনে, তখনইত কয়েছি সই—

কথা কইতে নড়ো সই—
পিঠা খেতে নড়ো না।

আবার এক বৎসর থাক্। আমার বিধানে ব্রত করো—আমার বিধানে কথা শুনো। তাহ'লে তোমার পতি পুত্র দেশে আস্‌বে।

তখন বামন সই বল্লেন-সই এক দিনের দুঃখ সইতে পারি না-এক বছরের দুঃখ সব কেম্‌নে ?

তার পর এক বৎসর গেল। চৈত যায়,—বৈশাখ আসে,—মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন বামন সই বল্লেন সই তোমার যে ১৬ খানা সম্পৎ আছে—তারি একখানা আমাকে দাও উৎসর্গ করি।

শুনে, রাণী বল্লেন ঃ—

সই এত বড় কথা ক'লে
চিত্তে তুলে' ঘা দিলে
ঝি চাইলে দাসী করে দিতাম
ছেলে চাইলে নফর করে দিতাম
অর্দ্ধেক রাজত্ব চাইলে বেঁটে দিতাম।

কিন্তু ইহা তো কিছুতেই দিতে পারবো না।

সইএর বেড়াবেড়াতে থাক্‌তে না পেরে, রাণী বল্লেন যা দাসী বেটি যা বাঁদী বেটি রাজার কাছে বল্‌গে যা!—বামন সই ১৬ সম্পদের একখানা সম্পদ চায়।

শুনে রাজ ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। "এ ত বড় প্রমাদ হ'লো। একে তো বৈশাখ মাস। তাতে বামনের কন্যে। দিলে সম্পৎ হানি। না দিলে ব্রহ্মহত্যা হয়।" বল্লেন—দেও'গে যাও একখানা সম্পৎ উৎসর্গ কর্‌তে।

ভাট আন্‌লেন, বামন আন্‌লেন, ক্ষীর নদীর কূলে গেলেন একখানি সম্পৎ উৎসর্গ করে দিলেন।

রাজার অলক্ষ্মী লাগ্‌লো। ফিরে আস্‌তে আস্‌তেই রাজার হাতীশালায় হাতী মলো। ঘোড়াশালায় ঘোড়া মলো। রামলক্ষ্মণ দুইটা গোলা ঢসে পড়্‌লো। উরি মুরি দক্ষিণদ্বারী ছারখার হ'য়ে গেল। রাণী বল্লেন—চল রাজা ঘরে যাই।

ঘরে যেয়ে দেখেন—কিছুই নাই। দুটি পুত্র আছে। দুটি ঘোড়া আছে। গহনার ঝাইলটি আছে। মেঘডুম্বর ছাতিটি আছে। তাই নিয়ে রাজা রাণী বাহির হইলেন।

যেই বা'র হলেন অমনি মেঘডুম্বর ছাতিটি পবনে লয়ে গেল। গহনার ঝাইলটি চিলে নিল। দুটি পুত্র জল খেতে যেয়ে গঙ্গায় ডুবিল। দু'টি ঘোড়া ঘাস খেতে যেয়ে অরণ্যে মরিল।

তখন রাণী বল্লেন—চল রাজা কোথা যাবে?—বোন্‌বঁধুনির বাড়ী যাই। গেলেন বোন্‌বঁধুনির বাড়ী।

তখন পাড়াপড়সি বল্লেনঃ—

ঠাকুরুন আলো ঠাকুরুন আলো,
ঐ তোমার বোন বঁধুনি এলো।

শুনে বোন্ বঁধুনী বল্লেন—

আমার বোন বঁধুনি পৃথিবীর রাজা সম্পদের অধিকারী,

তারা কেন আস্‌বে আমার বাড়ী!

হয় নয় বাহিরে এলেন—চেয়ে দেখেন সত্য সত্যই বোন্ বঁধুনি এসেছে। বঁধুকে নিলেন আগ দুয়ার দিয়ে বঁধুনিকে নিলেন পাছ দুয়ার দিয়ে!

খাট দিলেন বস্‌বার
জল দিলেন পা ধোবার
গাঁ ছেপে দুধ আন্‌লেন
বিল ছেপে মাছ ধরলেন
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধলেন।

খাচ্ছেন দাচ্ছেন কত দিন যায়। সুখ হেন কম্‌তেছে—সম্পদ হেন কম্‌তেছে। সম্পদ নারাণ বল্‌তেছেন—

আপনার সম্পৎ পরকে দিল,
পরের বিপত্তি ঘাড়ে নিল,
বোন্ বঁধুনির সম্পৎ খেতে এলো।

বোন্ বঁধুনি একদিন বাটা ভ'রে মাণিক্য দিলেন। রাজারাণীর দৃষ্টিতে তাহা ছাই আঙার হ'লো। বঁধুনি বল্লে—কৈ রাণি আমার মাণিক্য কৈ?

রাণী বল্লেন কৈ বঁধুনি,—মাণিক্য ত দেও নাই। বাটা ভরে ছাই আঙ্গার দিয়েছিলে।

বঁধুনি বল্লেন—

এখানে থুছিলাম এখানে নাই
তোমাদের দৃষ্টিতে হ'লো ছাই।

চারিদিকের দুঃখে আমার এখানে এসেছিলে আমারি জিনিস

চুরি কর্‌লে ? মানুষে না জান্‌তে শুন্‌তে আমার বাড়ী থেকে বাহির হও।

শুনে রাজা বল্লেনঃ—

তখনি ত কহিলাম রাণি—
আপনার সম্পৎ পরকে দিলে—
পরের বিপত্তি ঘাড়ে নিলে।

যার হাতে না খেয়েছিলাম তার পাতে খেলেম। যার শিয়রে না গিয়েছিলাম তার পইথানে গেলাম। এখন যাবে কোথায় ? চল, যাই মিতা মিতিনীর বাড়ি।

(অতঃপর রাজা রাণী যে যে স্থানে গিয়াছিলেন সেই সেই স্থানে প্রথমে উল্লিখিতরূপে আদৃত হইয়া পরে সম্পদ নারায়ণ কর্ত্তৃক বিব্রত ও অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন।

"পাড়াপড়সি ডেকে বল্লেন ঠাকুরুণ আলো ঠাক্‌রুণ আলো হইতে এখন যাবে কোথায়" পর্য্যন্ত ভাষা ঠিক একই রকম। তবে, প্রত্যেক স্থলে অপহৃত বা অন্তর্হিত বস্তুগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌। মেয়েরা 'ব্রত কথা' বলিবার কালে সকল স্থলেই কিন্তু ঐ সাধারণ অংশটুকুর পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। আমরা বাহুল্য ও বিরক্তির ভয়ে সে গুলির পুনরুল্লেখে নিবৃত্ত থাকিলাম। লেখক।)

সেখান থেকে গেলেন মিতা মিতিনীর বাড়ী।

... ...

এক দিন মিতামিতীন থালে করে ভাত দিল। থাল মৃত্তিকায় সম্বরিল।

"মিতা আলো মিতিন আলো
থাল দাও ভাতখাই
এখানে থুছিলাম এখানে নাই।"

... ...

চল রাণী যাই বোন ভাগ্নের বাড়ী।

যান্ এক দিন ঝাড়ি করে জল দিল। তাহা মৃত্তিকা সম্বরিল।

দাদারে দাদা ঝাড়ি দাও জল খাই।

এখানে থুয়েছিলাম এখানে নাই।

... ...

চল রাণি, আপনার উদরের কন্যার বাড়ী যাই।

গেলেন কন্যা কন্যা জামাতার বাড়ী।

... ...

এক দিন কন্যা বল্লেন বাবা যাবৎ ধরে বিয়ে দিয়েছ তাবৎ হ'লো আর এক দিনও ঘাটে যাই নাই। আজ মায়ে ঝিয়ে ঘাটে নাইতে যাই—খোলখার দিই নে তুমি আমার ছেলে রাখ।

দুঃখে রাজা আপনার কপালে আপনি চড় দিলেন। বল্লেন দশ জন রেখেছি। আমার কপালের দুঃখ কন্যার ছেলে রেখে খেতে এসেছি।

মেয়ে নাইতে গেল। ছেলে কাঁদ্‌তে লাগলো। রাজা ছেলের হার খুলে ছেলের হাতে দিলেন মাটীতে চিত্রিত ময়ূরে সে হার গাছি কেড়ে নিল। মেয়ে নেয়ে এসে বল্লে—

বাবা ছেলে দাও কোলে লই,

হার দাও গলায় দিই।

রাজা বল্লেন হার এখানে থুয়েছিলাম এখানে নাই।

... ...

চল রাণী, বৃক্ষতলে যাই। নদীর কূলে বৃক্ষের তলে গিয়ে পড়ে মরিগে। দুইজনে বৃক্ষতলে গেলেন।

এদিকে এক নূতন বেশ্যা রাজা হবে। তার দাসী বাঁদী এসে জিজ্ঞাসা করলো—

মাগি কি কি কাজ জানিস?

রাণী বল্লেন—"এঁঠো মুছি এঁঠো না খাই—

কায করি ভাত খাই—

তামা কাঁসায়ে অম্বল দিতে জানি

গহনা ঝালাইতে জানি—

দুধ জাল দিতে জানি—

পূজার সাজ কর্‌তে জানি।

রাজা বল্লেন—মিন্‌সে কলাবন নিড়াতে জানে,

বাঁশ বন নিড়াতে জানে।

বাজকথা জানে, রাজনীতি জানে,

এক টাকা ভেঙে পাঁচ টাকার

সদায় কর্‌তে জানে।

দাসী বিটি বাঁদী বিটি যেয়ে বেশ্যাকে এই এই কথা বল্লো।

বেশ্যা শুনে বল্লেন—এই মানুষেরই ত আমার কাম। আন্‌গে ডাক্ দিয়ে।

রাজা রাণী গেলেন। রাজা গেলেন রাজার কাযে রাণী গেলেন রাণীর কাযে।

কায করেন ভাত খান। সুখ হেন কম্‌তে লাগলো সম্পদ হেন কম্‌তে লাগলো সম্পদ নারাণ ভাবতে লাগলেন—

আপনার সম্পৎ পরকে দিল

পরের বিপত্তি ঘাড়ে নিল

বেশ্যা বেশ্যির সম্পদ্ খেতে এলো।

আচ্ছা। অলক্ষ্মী লাগালেন।

রাণী দুধজাল দিলেন ছাই হ'লো
চন্দন ঘস্‌লেন বালি হ'লো
গহানার ঝাইলটি চিলে নিল।

দাসীবিটি বাঁদী বিটি বল্লে—মাগি শিগ্‌গীর পূজার সাজ করে দে। গহনার ঝাইল দে। ৫০বাটি দুধ দে। নূতন বেশ্যা রাজা হবে।

মাগী কিছুই দিতে পারলেন না।

দাসী বিটি বাঁদী বিটি এসে মাগীকে ঝাঁটার বাড়ি দিল, কাঁটার বাড়ি দিল। ৫ কলস রক্ত ফেল্‌লো।

রাণী তখন চিকণস্বুরে দীঘল গলায় কাঁদতে লাগ্‌লেন।

রাজা দৌড়ে এসে দেখেন আর কেহ না, তাঁরি রাজমহিষী কাঁদ্‌তেছেন! কাপড় দিয়ে চক্ষের জল পোঁছালেন।

দাসী বিটি বাঁদী বিটি বল্লে—মিন্‌সে, তোর মাগীকে মেরেছি!

রাজা বল্লেন বেশ করেছ!

ভাত কাপড় দেয় যে
মা বাপ হয় সে।

চল, যাই রাণি, নদীর কূলে বৃক্ষের তলে পড়ে মরিগে।

গেলেন বৃক্ষতলে। কতদিন সেখানে থাক্‌লেন। চৈত যায়—বৈশাখ আইসে। মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন সকলেই সুতা কাণে দিচ্ছে। হুলুধ্বনি দিচ্ছে।

রাণী বল্লেন—রাজা কোথা পাব সুতা? কোথা পাব চুকুর (কাপাস)? কোথা পাব ফুল—কোথা পাব ফল? এত বৎসর হ'লো ব্রত হারায়ে হাটের হাটুনী হয়েছি। ঘাটের ঘাটুনী হয়েছি। রাজ্যে রাজ্যে দেশে দেশে ফির্‌ছি!

রাজা সাগরে ঝাঁপ দিলেন। নগরে বার হ'লেন। ফুল আন্‌লেন। ফল আন্‌লেন। একটি (চুকুর) কাপাস আন্‌লেন। এনে

তুলা পিঁজ্‌লেন। সুতা কাট্‌লেন। ৩০ গাছ সুতা কেটে রাজা রাণী কাণে দিলেন। রাণী কথা শুন্‌ছেন ব্রত কর্‌ছেন।

অস্মরণ রাজার স্মরণ হ'লো!

এদিকে বেশ্যা বল্লে—দেখ্‌ লো বাঁদী বিটি দেখ্‌লো দাসী বিটি আমার চাকর চাকুরাণী কি হালে রয়েছে! চা'ল ভরা ডুঁথিটা দিয়ে আয় গে।

দাসী বিটি বাঁদী বিটি এসে বল্লে ঃ—ও মাগি মিন্‌সে এই সব আমাদের মা ঠাক্‌রুণ দিছেন'

তখন রাণী বল্লেন দেখ রাজা ৪ দিন ব্রত করে অস্মরণ রাজার স্মরণ হয়েছে। সম্পদ নারাণ তুষ্ট হয়েছেন। ৩০ দিন ব্রত কর্‌লে সব পাব।

রাণী ৩০ দিন ভরে ব্রত কর্‌লেন, কথা শুন্‌লেন। ৩০ দিন সম্পূর্ণ হ'লো—সম্পূর্ণ হ'লে রাজা সাগরে ঝাঁপ দিলেন। নগরে বের হলেন। বামন আনলেন, ভাট আন্‌লেন। ফুল আন্‌লেন—ফল আন্‌লেন। দুর্ব্বা আন্‌লেন। কলাওয়ালী কলা নিয়ে যাচ্ছে দেখে কলা নিলেন। পানওয়ালির কাছে পান রাখ্‌লেন। গুড় রাখ্‌লেন। দুধ এনে তাহা দিয়ে ৩×৩০ ক্ষিরের পুলি করলেন। ৩×৩০ টা পান, ৩×৩০ গুয়া কাট্‌লেন ব্রত কর্‌লেন কথা শুনলেন, পুরোহিতের ৩০ পুলি পুরোহিতকে দিলেন। বোন্‌ বঁধুনির ৩০ পুলি বোন্‌ বঁধুনিকে দিলেন। গঙ্গার পুলি গঙ্গাকে দিতে গেছেনঃ—

ওরে পিঠে জর জর—
ওরে পিঠে পর পর—

অমনি দু'টি পুত্র আঁচল ধরে উঠ্‌লো। দু'টি ঘোড়া অরণ্য থেকে আস্‌লো। গহ্‌নার ঝাইলটি চিলে দিয়ে গেল। মেঘ ডুম্বর ছাতাটি পবনে দিয়ে গেল।

সম্পদের হাতী কাট্ কাট্ মার্ মার্ ক'রে আস্ছে।

হাতি, তুমি শুয়ে ঘুম যাও। আমি আগে পিঠে খাই মুখ শুদ্ধি করি, তার পর তোমার কপালে তেল সিন্দুর দিয়ে ঘরে নেব।

হাতী শুয়ে ঘুমে গেল। রাণী পিঠা খেলেন-মুখ ধু'লেন। মুখ শুদ্ধি কর্লেন। গহনাখানি গায়ে দিলেন। সাড়ি খানি পর্লেন। হাতীর কপালে তেল সিন্দুর দিলেন। হাতী উঠ্লো। পাইকে সিকে যোগান ধরলো। ধুলো মাটীতে অন্ধকার হলো। হল হল কর্তে লাগ্লো কল্ কল্ কর্তে লাগ্লো বিদ্যাধরীরা নাচ্ কর্তে লাগলো।

রাজা চড়্লেন—রাজহাতীর উপর। রাণী চড়্লেন রাজ-দোলায়। রাজা বল্লেন চল, রাণি বাড়ী যাই।

রাণী বল্লেন, না রাজা যাহারা যাহারা চোর বলেছে ছেঁচর বলেছে তাদের কাছে সাধু হয়ে যাই।

গেলেন মিতা মিতিণীর বাড়ী।

পাড়া পড়সি ডেকে বল্লে—

ঠাক্রুণ আলো ঠাক্রুণ আলো
তোমার মিতা মিতিন এলো।

মিতিন বল্লেন :—

আমার মিতা মিতিন ১২ বৎসর ধরে গেছে। কোথায় মরেছে। হাড়ে দুর্ব্বা জ্বালাইয়াছে।

হয় নয়—বেড়ে যেয়ে দেখেন মিতাই ত মিতিনীই ত !

হাতে ঝাড়ি মাথে খাট করে বা'র হলেন, বল্লেন বসো বসো—মিতা মিতিন বসো। পা ধোও—জল খাও।

রাণী বল্লেন :—

তোমার খাটে বস্বোনা তোমার জলে পা ধোব না। ৪ দিনের

দুঃখে তোমার বাড়ী এসেছিলাম—চোর বলেছ ছেঁচর বলেছ। বাড়ী থেকে বে'র করে' দিয়েছ।

মিতিন বল্লেন ঃ—

আমি কি দিছি—তোমার সম্পদ নারাণ দিছেন।

রাণী বল্লেন—মিতিন, ঠাঁইখানি গোবর দাও। উবুর হয়ে প্রণাম কর।

মাটীর মৃত্তিকা—কেটে ফেল্‌বো, ছিঁড়ে ফেল্‌বো, খান্‌ খান্‌ কর্‌বো। হে সম্পদ নারায়ণ আমার মিতা মিতিনীর ধন তুলে দাও।

এক গুণের ধন ৫০ গুণ হয়ে উঠ্‌লো। হিরা মাণিক্য টল মল কর্‌তে লাগ্‌লো। হল্‌ হল্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো—কল্‌ কল্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো—মণি মুক্তা ঝলমল কর্‌তে লাগ্‌লো। পাইকে সিকে যোগান ধর্‌ল,—

দেখে মিতিন বল্লেন ঃ—রাণি, আমিও তোমার এ দ্রব্যও তোমার। এই বলে চল্লেন পিছে পিছে।

(রাজা রাণী এইরূপে সাধুত্বের পরিচয় প্রদানার্থ যত পূর্ব্ব সুহৃৎ স্থলে গমন করিলেন ; এবং "মাটীর মৃত্তিকা হইতে" অন্তর্হিত বস্তুর ৫০ গুণ সম্পদ্‌ আবির্ভূত করাইলেন। তবে বেশির ভাগ প্রত্যেক স্থলে অপহৃত বস্তুর সহিত "হিরা মাণিক্য টল মল" করাইলেন। "মণিমুক্তা ঝলমল করাইলেন। এখানেও বাহুল্য ভয়ে পুনরাবৃত্তি হইতে নিরস্ত থাকিলাম।—লেখক)

তার পর গেলেন সইএর বাড়ী। রাণী বল্লেন ঃ—

সইলো সই আমার সম্পৎ আমায় দাও
তোমার বিপত্তি তুমি লও।

রাণী ভাট আনালেন। বামন আনালেন। ক্ষির নদীর কূলে

গেলেন। তিল আন্‌লেন, তুলসী আন্‌লেন। উহাঁর সম্পৎ উনি নিলেন, তাঁহার বিপত্তি উহাঁকে দিলেন।

অতুল সম্পদ্ হ'লো
সর্ব্ব বিপত্তি নাশ হ'লো।

হাতীশালায় হাতী উঠ্‌লো। ঘোড়াশালায় ঘোড়া উঠ্‌লো। রাম লক্ষণ গোলা দু'টি উঠ্‌লো। ফুল ফলের বাগান হলো। দিঘি পুষ্করিণী হ'লো। এক পুকুরের জল আর এক পুকুরে পড়্‌তে লাগ্‌লো—ইত্যাদি। সকলই পূর্ব্ববৎ হ'লো।

দাসী বাঁদী পরের বাড়ী থেকে আস্‌লো। রাজা বস্‌লেন রাজ-খাটে, রাণী বস্‌লেন রাজপাটে। রাণী বল্লেনঃ—রাজা এমন দেও-য়ানে যাইও না—এমন দরবারে যাইও না।

সোণার লক্ষ্মীনারায়ণ বানাও। উপরে চাঁদা দাও মুক্তার ঝালর দাও।

উরি মুরি বাউইর বাসা
লক্ষ্মী নারায়ণ খেলেন পাশা
একালে লক্ষ্মী পরকালে নারায়ণ
ধূপ দীপ কাম সিন্দূর
রক্ত চন্দন ওর (জবা) ফুল।

নারায়ণ বল্লেন, লক্ষ্মী, নলপাতাকে বর দাও।

লক্ষ্মী বল্লেন:—আমি কি তাকে বর দিতে পারি?

সে রাজ্যরাজা বাপ্ চায়,
রাজমহিষী মা চায়,
হিমের কুটুম স্বামী চায়,
সভা উজ্জ্বল পুত চায়,

মেঝে উজ্জ্বল ঝি চায়,
আপ্‌শালা উজ্জ্বল বৌ চায়,
কুবের-সমান ধন চায়—
লক্ষ্মীর মত গিন্নি (হ'তে) চায়,
কুন্তীর মত সতী (হতে) চায়,—?
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী (হতে) চায়—
রাহুর মত পরমায়ু চায়।
যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্ম চায়।
ভীমের মত বল চায়—
চন্দ্রের মত শীতল চায়—
সীতার মত সুন্দরী চায়—
দুর্গার মত সোহাগী চায়—
শিবের মত পতি চায়।

শুনে, নারায়ণ বল্লেন ঃ—নলপাতাকে অবশ্য বর দিতে হ'বে।

ওঠ ওঠ নল-পাতা বর লও।

তখন নল পাতা—

গলা কেটে ঘর দিলেন,
মাথা কেটে ডাবর দিলেন
চাঁদি কেটে টাট দিলেন
নাক কেটে বাঁশি দিলেন
দাঁত কেটে আর্শি দিলেন
জিহ্বা কেটে অর্ঘ্য দিলেন
বুক কেটে শ্রীফল দিলেন
পিঠ কেটে পিঁড়ি দিলেন
দশ নখ কেটে পলতে দিলেন

দুই হাত কেটে খরতাল দিলেন
পা কেটে খড়ম দিলেন।

নল পাতা শরীর কেটে খণ্ড খণ্ড করলেন। দিন সাত কুল সোণা ব্যয় করলেন। এই বর পেলেন :—

রাজ্যরাজা বাপ্ পেলেন
রাজমহিষী মা পেলেন—
হিমের কুটুম স্বামী পেলেন—
ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৈশাখ মাস। বেলা দুই প্রহরের সময় :—

পতির উরে পুত্র দোলে,
আমি যেন মরি গঙ্গাজলে।

এই নল পাতার (!) বর-প্রাপ্তির সহিত সম্পৎ ব্রতের কি সম্বন্ধ বলিতে পারি না। তবে, মেয়েরা এই নলপাতার উপাখ্যানও—বরপ্রাপ্তিসংবাদ্য সম্পদ ব্রতের অঙ্গ বিশেষ মনে করে। সকলেই এক সঙ্গে বলে বলিয়ে সম্পদের কথার সহিতই নলপাতার বরপ্রাপ্তির বিবরণ লিখিত হইল বোধ হয়।

এই ব্রতের ফলশ্রুতি—হরিচরণ ব্রতের ফলশ্রুতির ন্যায়।

"পতির উরে পুত্র দোলে—
আমি যেন মরি গঙ্গাজলে"।

তবে অধিকন্তু "বৈশাখ মাস। বেলা দুই প্রহর"। এই মাত্র।

ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মী বাই।

(৪)

২৩ মার্চ্চ হইতে ৩ এপ্রিল পর্য্যন্ত ১১ দিবস, ইংরাজেরা, ঝাঁশি ঘেরাও করিয়া, ঝাঁশিসৈন্যের সহিত দিবারাত্র ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল; তথাপি রাণীঠাকুরাণীর অপরিসাম সাহস ও দৃঢ়নিশ্চয়তা প্রযুক্ত তাহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু তাহা নহে, ইংরাজদিগের যুদ্ধসামগ্রী নিঃশেষিত হওয়ায় তাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক্ এই সময়ে দৈব তাহাদিগের অনুকূল হইলেন। তাত্যাটোপের সৈন্য, ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী রণক্ষেত্রে ফেলিয়া পলায়ন করায়, সেই সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী অনায়াসে ইংরাজের হস্তগত হইল। এইক্ষণে সর-হিউ-রোজ, ঝাঁশি অবরোধ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া না থাকিয়া, একেবারে হল্লা করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য গুপ্তভাবে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সমস্ত সৈন্যকে বিভক্ত করিয়া, এক এক কাজে নিযুক্ত করিলেন। প্রথম বিভাগের সৈন্য বপ্র-প্রাকারে সিঁড়ি লাগাইয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিবে; দ্বিতীয় বিভাগ, তলবার ও সঙ্গান্ লইয়া শত্রুর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়া সহরের কোন এক দ্বারের মধ্য দিয়া সহরে প্রবেশ করিবে, এইরূপ যুক্তি স্থির হইল এবং এই যুক্তি অনুসারে, প্রভাতকালে, সমস্ত ইংরাজসৈন্য কেল্লার অভিমুখে চাল আরম্ভ করিল। বপ্রের মুখ্য দরজার দিকে ইংরাজসৈন্য আসিতেছে দেখিবামাত্র তত্রস্থ প্রহরীরা ভয়সূচক শিঙ্গা ও রণবাদ্য বাজাইয়া ঝাঁশির সমস্ত সৈন্যকে এই বার্ত্তা ইঙ্গিতের

দ্বারা অবগত করাইল ও তখনই প্রস্তুত হইয়া স্বস্ব কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হইল।

তাত্যাটোপের পরাভববার্ত্তা শুনিয়া রাণীঠাকুরাণী একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন; প্রবল ইংরাজসৈন্যের সহিত আর পারিয়া উঠিবেন না, এইরূপ তাঁর মনে হইতেছিল। তাঁহার সৈন্য-মধ্যেও এই কারণে, উদাস ভাব স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছিল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া রাণীঠাকুরাণী তাঁহার সরদারদিগকে ডাকাইয়া একত্র করিলেন এবং আবেশময় বাক্যে তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন—"আজ পর্য্যন্ত ঝাঁশি, ইংরাজের সহিত যে লড়িয়াছে সে পেশোয়ার বলের উপর নির্ভর করিয়া লড়ে নাই এবং কখনও তাঁহার সাহায্য আমাদের আবশ্যক নাই। আজ পর্য্যন্ত তোমরা যেরূপ আপন স্বাভিমান, আপন সাহস, আপন ধৈর্য্য, আপন শৌর্য্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া আপন খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার করিয়াছ, সেইরূপ এখনও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ঝাঁশি সংরক্ষণ করা তোমাদের কর্ত্তব্য।" এইরূপে রাণীঠাকুরাণী, উৎসাহজনক বাক্য বলিয়া, সৈন্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে সুবর্ণ বলয় ও পরিচ্ছদ বক্‌শিশ করিলেন; ইহাতে সৈন্যগণ পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া উঠিল; পুনর্ব্বার রণোৎসাহে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল। ঝাঁশির মুখ্য গোলন্দাজ গুলাম গোষ-খান্, তোপের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ ইংরাজসৈন্যের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। স্বয়ং রাণীঠাকুরাণী, কেল্লার বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য, বপ্রের উপর ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রে ইংরাজ গোলন্দাজরাও কেল্লা ও সহরের উপর ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ করিয়া, বপ্র-প্রাকারের স্থানে স্থানে, সছিদ্র ও ভগ্নপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজের গহ্বর-নলী তোপ হইতে, ঝাঁশির প্রাসাদের উপর গোলা-

বৃষ্টি হওয়ায় তাহারও অনেকটা জখম হইয়াছিল। তাহার দ্বিতীয়তলে গণপতির সিংহাসন ও আয়না-ঘর ছিল। এই আয়না-ঘর, লক্ষ্ণৌয়ের উৎকৃষ্ট মূল্যবান আর্শির দ্বারা সজ্জিত ছিল। ইহার উপর গোলা আসিয়া পড়ায় কাচের সামগ্রী সব চুরমার হইয়া গিয়াছিল এবং "কুপ্পী গোলা" হইতে পেরেক ও ছর্‌রা-গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় রাজবাটীর চারিজন লোক নিহত হয়। ইহাতে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাণীঠাকুরাণী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কোমরে তলবার বাঁধিয়া, বপ্রের উপর উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন এবং সৈন্যগণকেও উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ইংরাজ সৈন্য কেল্লা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে সবেগে আসিতেছে দেখিয়া, সহরের বপ্র ও কেল্লার বুরুজ হইতে ঝাঁশির সৈন্য তাহাদিগের উপর তোপ চালাইতে আরম্ভ করিল—তোপের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে ইংরাজসৈন্য একেবারে ধ্বংসপ্রায় হইল, তথাপি উহারা প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া সাহসের উপর ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বপ্র-প্রাকারে সিঁড়ি লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। কিয়ৎকালের জন্য কেল্লার লোকেরা সুচারুরূপে বপ্র সংরক্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ব্রিগেডিয়ার ষ্টুয়ার্ট সহরের বোর্চ্ছা দরজা হস্তগত করিয়া দক্ষিণ দিকে আক্রমণ করায় বপ্রোপরিস্থ গোলন্দাজ সৈন্য হতাশ হইয়া পলাইতে লাগিল; ষ্টুয়ার্টের সৈন্য জয়লাভ করিয়াছে শুনিয়া অন্যান্য বিভাগের ইংরাজসৈন্যমধ্যেও উৎসাহ বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল, এবং এক্ষণে সকল দিক হইতেই তাহারা সিঁড়ি লাগাইয়া বপ্রের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে এক সহস্র ইংরাজ সৈন্য বপ্রের উপর উঠিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে সর্-

হিউরোজ তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য লইয়া "বোর্‌ছা"-দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তিনিও সহরের দিকে চাল আরম্ভ করিলেন। ঝাঁশি-সহরের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড রাজবাটী ছিল এবং তাহার সংরক্ষণার্থ কতকগুলি লোক তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। সর হিউরোজ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রাজবাটী হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে রাণীঠাকুরাণী, কেল্লার সমস্ত তোপ-মঞ্চ সাম্‌লাইবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন; এমন সময়ে যখন শুনিলেন, সহরের দক্ষিণ বপ্র ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিল; তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কেল্লার উপর আসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সহরের দক্ষিণ দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন—সহস্র গোরা-সৈন্য সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাহাকার উঠাইয়াছে, ইহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই সময়ে কিছুকালের জন্য নৈরাশ্য ও ভীতির চিহ্ন তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সামলাইয়া শূরত্বের আবেশে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া শেষপর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য এইরূপ দেড় হাজার মুসলমান ও আরবী সৈন্য সঙ্গে লইয়া রাণীঠাকুরাণী সত্বর কেল্লার নীচে অবতরণ করিলেন, এবং কেল্লার বড় দরজা দিয়া বাহির হইয়া, দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। সহরের দক্ষিণ বপ্রের উপর দিয়া যে সহস্র গোরা সৈন্য সহরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ তলবার উত্তোলন করিল। রাণীঠাকুরাণী সকলের পশ্চাতে ছিলেন; তিনি এই সময়ে মহা আবেশ সহকারে নগ্ন তলবার উঠাইয়া সকলের মধ্য ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোরা-সৈন্য ও ঝাঁশি

সৈন্যের পরস্পর সাক্ষাৎকার হওয়ায়, তলবারে তলবারে ঝনাৎ-কার উঠাইয়া দুই পক্ষের লোকই এক সঙ্গে মিশাইয়া গেল। এই যুদ্ধে অনেক গোরা নিহত হইল—যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা সহরের দিকে পলাইয়া গিয়া, বৃক্ষ ও গৃহের অন্তরাল হইতে বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে একদল গোরা-সৈন্য আসিয়াছিল তাহারাও তলবার না চালাইয়া, দূর হইতে বন্দুকের গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে রাণীর পুরাতন সর্দ্দারেরা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল "মহারাণী, এই সময়ে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। গোরা-সৈন্য ইমারতের আড়াল হইতে গুলি মারিতেছে—তা ছাড়া শত শত গোরা সহরে প্রবেশ করিয়াছে। সহরের সকল দরজাই খোলা—এক্ষণে সহরের মধ্যে যুদ্ধ করিবার কোন অর্থ নাই। তদপেক্ষা, কেল্লার ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঈশ্বর যাহা যুক্তি দেন তাহাই আমাদের করা ভাল। ফিরিয়া যাইবার ইহাই সময়"। এই কথা বলিয়া, তাহারা রাণীঠাকুরাণীর হাত ধরিয়া ফিরাইয়া দিল। তখন তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে আবার কেল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে গোরা-সৈন্য চারিদিকের দরজা দিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইতে ৮০ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত পুরুষ দেখিবামাত্র তাহারা গুলি কিম্বা তলবারের দ্বারা নিহত করিতে লাগিল; সহরের একদিকে আগুন লাগাইয়া দিল। সেই সময় সহরের মধ্যে যেরূপ হাহাকার উঠিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। মেষপালের মধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া পড়িলে যেরূপ দশা হয়, লোকেরা প্রাণভয়ে আকুল হইয়া সেইরূপ পলাইতে লাগিল। কেহ বা গলির মধ্যে প্রবেশ করে, কেহবা গৃহের বিকট স্থানে

গিয়া লুকায়, কেহ বা দাড়ি গোঁপ কামাইয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করে, এই প্রকার যে যেরূপে পারিল, প্রাণ বাঁচাইবার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। গোরারা সহরে প্রবেশ করিয়া সহর একেবারে বিজন করিয়া তুলিল; সহরের মধ্যভাগে "ভিড়্যার বাগ" নামক একটা উদ্যান ছিল, তাহার মধ্যে সহস্র সহস্র লোক আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানেও যখন গোরারা প্রবেশ করিল, তখন সেই সকল লোক অতি দীনভাবে ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিল "আমি নিরপরাধা কৃষক; আমি যুদ্ধের মধ্যে নাই—দয়া করিয়া আমার প্রাণদান করুন"। তাহাদিগের এইরূপ করুণবাক্য শুনিয়া ইংরাজ সেনা-নায়কের দয়া হইল; তিনি সেই প্রণত লোকদিগকে অভয়বচন দিয়া, উদ্যানের চারিদিকে পাহারা বসাইয়া দরজায় তালা লাগাইয়া দিলেন; এবং এইরূপ হুকুম প্রচার করিলেন যে বাহিরের লোককে ভিতরে আসিতে এবং ভিতরের লোককে বাহিরে যাইতে কদাচ দেওয়া না হয়।

কিন্তু অন্য দিকের গোরারা লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সোনা রূপার সামগ্রী লুট করিতে লাগিল। পুরুষ দেখিলেই ধরিতে লাগিল, যতক্ষণ না তাহাদের অর্থসম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হইল ততক্ষণ তাহাদের ছাড়িল না—এমন কি অর্থ পাইলেও, শেষে তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিতে লাগিল। কিন্তু এ কথা বলিতে হইবে স্ত্রীলোকদিগকে উহারা কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক মারে নাই। তবে কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটিয়াছে, গোরারা সম্মুখের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া, ঘরের স্ত্রীলোকেরা সতীত্বনাশের ভয়ে পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কোথাও বা এরূপও ঘটিয়াছে, ঘরে প্রবেশ করিয়া গোরারা পুরুষকে গুলি করিতেছে,

সেই সময় তাহার স্ত্রী আসিয়া স্বামীর কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—সেই অবস্থায় গুলি স্বামীর গায়ে না লাগিয়া স্ত্রার গায়ে লাগিয়া সে নিহত হইয়াছে।

যাহা হউক সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত গোরারা এইরূপ লুটপাট করিয়া অবশেষে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

সহর ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে, সর্-হিউ-রোজ রাজবাটী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজবাটীর প্রহরীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া রাজবাটী সংরক্ষণের প্রযত্ন করিল। এই যুদ্ধে অনেক গোরা নিহত ও আহত হইল। কিন্তু ইংরাজের সংখ্যা অধিক থাকায় এবং রাজবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়ায়, প্রহরীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, অবশেষে গোরা-সৈন্য হল্লা করিয়া রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজবাটী হস্তগত হইলে, ইংরাজেরা তত্রস্থ লোকদিগকে নিহত করিল। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে ঝাঁশির একদল অশ্বারোহী প্রহরী ছিল, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল; অবশেষে তাহারাও নিহত হইল। এইক্ষণে সমস্ত রাজবাটী ইংরাজের হস্তগত হওয়ায়, গোরারা প্রাসাদের মূল্যবান সামগ্রা সকল লুটপাট করিতে লাগিল। এই সকল সামগ্রীর মধ্যে, ব্রিটিশ রাজচিহ্নাঙ্কিত ধ্বজা—"য়ুনিয়ন জ্যাক্" ইংরাজ সৈন্যের হস্তগত হওয়ায় তাহারা পরমানন্দ লাভ করিল এবং সেই ধ্বজা মহা বিজয়োৎসাহে রাজবাটীর উপরে উঠাইয়া তথায় ব্রিটিশ আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিল।

এদিকে রাণীঠাকুরাণী, ঝাঁশি সৈন্যের বিজয় লাভ হইতেছে না দেখিয়া, কেল্লার প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং শোকবিহ্বল হইয়া নিশ্চলভাবে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিলেন। সেই

তেজস্বিনী মহিলার এইরূপ দীন অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার আশ্রিত মণ্ডলীর অত্যন্ত কষ্ট হইল; চিন্তাকুল হইয়া এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, মৃদুস্বরে তাহারই বিচার করিতে লাগিল। এক প্রহরের পর, রাণী ঠাকুরাণী, সহরের কিরূপ দশা হইয়াছে দেখিবার জন্য বারাণ্ডায় আসিলেন। সেই সময়ে যেরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল, তাহা দেখিয়া তিনি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। "হলবাইপুরা" নামক সহরের সমৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রধান ভাগে অগ্নি লাগায় সেখানে হাহাকার উঠিয়াছিল। সেই ভর-পূর গ্রীষ্মকালের প্রতপ্ত সূর্য্যকিরণের মধ্যে, এই অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় সহরের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। চারি-দিকে ক্রন্দন ও হাহাকার রব—কে কোথায় পলাইবে তাহার ঠিক্ নাই। শত শত বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে আর শত লোক নিহত হইতেছে। এইরূপ ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া, রাণীঠাকুরাণী কিয়ৎকালের জন্য একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহি-লেন। এই সময়ে আবার শুনিলেন, কেল্লার মুখ্য দ্বার সংরক্ষণ-কারী সরদার কুম্বর-খুদাবক্স এবং তোপখানার প্রধান গোল-ন্দাজ—গুলাম-গোষ-খান্ ইহাঁরা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া-ছেন। এই সংবাদ শুনিয়া রাণীঠাকুরাণী আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি আপনার অধীনস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন, "আমরা আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া ঝাঁশি সংরক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু এখনও আমাদের জয়লাভ হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। আমাদিগের বীরচূড়ামণি ও গোলন্দাজেরা নিহত হইয়াছে; সুতরাং বপ্রের বন্দোবস্ত যথারীতি না হওয়ায় বপ্র ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। সহরমধ্যে, ইংরাজ সৈন্য, যত্র তত্র পথরোধ

করিয়া বসিয়া আছে। এক্ষণে, হল্লা করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উহাদিগের সহজ হইয়াছে।

কেল্লা উহাদিগের হস্তগত হইলে, আমাদিগকে কয়েদ করিয়া, কিরূপ প্রকারে যে উহারা আমাদিগের প্রাণনাশ করিবে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। এইহেতু, বারুদের দ্বারা রাজবাটী উড়াইয়া দিয়া, সেই সঙ্গে আমার ইহলীলা সাঙ্গ করিব এইরূপ সংকল্প করিয়াছি। গোরাদিগকে আমার দেহ স্পর্শ করিতে কখনই দিব না। অতএব, যাহাদিগের মরিতে ইচ্ছা আছে, তাহারা এইখানে থাকুক, বাকী সকলে, আজ রাত্রেই কেল্লা ছাড়িয়া সহরের মধ্যে চলিয়া যাউক, এবং আপনার প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা দেখুক"। রাণীঠাকুরাণীর এই কথা শুনিয়া, একজন বৃদ্ধ সর্দ্দারের অত্যন্ত কষ্ট হইল; সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিনয়পূর্ব্বক রাণীঠাকুরাণীকে এইরূপ বলিল:—"মহারাণি, আপনি কিঞ্চিৎ শান্ত হউন। ঈশ্বরই এই দুঃখ এই সহরের উপর আনিয়াছেন। তাহার আর উপায় নাই। সকল বিষয়ই পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। এই জন্মেই পূর্ব্বপাতকের ফলভোগ করিতেছি, তাহার উপর আর এক মহাপাতকের ভার চাপানো উচিত নহে। যে দুঃখই আসুক না কেন, তাহা দ্বিরুক্তি না করিয়া সহ্য করা আবশ্যক। তাহা হইলে, পরে আর উহার কোন উপসর্গ থাকিবে না। আপনি বীরাঙ্গনা, আত্মহত্যার কথা মনেই আনিবেন না। বিপদ আসিয়াছে। তাহা হইতে এখন উদ্ধার হইতে হইবে। এক্ষণে কিল্লার মধ্যে থাকা যদি নিরাপদ না হয়, তবে আসুন আমরা আজ রাত্রেই শত্রুর ঘের ভাঙ্গিয়া সহরের বাহিরে চলিয়া গিয়া পেশোয়ার সৈন্যের সহিত মিলিত হই। ইতিমধ্যে যদি মৃত্যু আসে তো খুবই ভাল।

এখানে আত্মহত্যা করিয়া পাতক সঞ্চয় করা অপেক্ষা, সম্মুখযুদ্ধে রক্তধারায় স্নান করিয়া স্বর্গারোহণ করা অতীব প্রার্থনীয়"। এই কথা শুনিয়া, রাণীঠাকুরাণী একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহার হৃদয় আবার বীরভাবে পূর্ণ হইল।

"ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেনালোকত্রয়ংজিতং।"

এই উপদেশ বাক্য অনুসারে, তিনি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন এইরূপ সংকল্প করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্ত দামোদররাও বলেন, এই বৃত্তান্ত ঠিক্ নহে। আসল কথা, "রাণীঠাকুরাণীর প্রধান কর্ম্মচারিমণ্ডলীই হতাশ হইয়া বারুদে আগুন লাগাইয়া প্রাণত্যাগ করিবার প্রস্তাব করে, এবং রাণীঠাকুরাণী এই প্রস্তাবে অনুমোদন না করিয়া, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপ সংকল্প করেন।"

সে যাহাই হউক, সন্ধ্যার পর, রাণীঠাকুরাণী আপনার নিকটস্থ পরিজন-মণ্ডলীকে ডাকাইয়া আনাইয়া তাহাদিগের নিকট অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে যোগ্য পুরস্কারাদি দিয়া, কেল্লার গুপ্তদ্বার দিয়া সহরের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। এই চিরবিচ্ছেদপ্রসঙ্গে, রাণীঠাকুরাণীর অনেকদিনকার পুরাতন ব্রাহ্মণ ভৃত্য ও দাসীগণ এবং অন্যান্য আশ্রিতমণ্ডলীর দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইল। সকলেই অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রিয় স্বামিনীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। কতকগুলি প্রভুভক্ত সেবক, রাণীঠাকুরাণীর সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং তাহাদিগের ইচ্ছা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিল। রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাণীঠাকুরাণী কেল্লা হইতে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার পিতা, মোরোপন্ততাঁবে প্রভৃতি আত্মীয়মণ্ডলী সকলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন; পথ-

খরচা হিসাবে কিঞ্চিৎ অর্থ থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া, তাঁহারা অশ্বারোহী অনুচরবর্গের জিম্মা করিয়া দিলেন; এবং সংস্থানের কুল-পরম্পরাগত রত্নাদি, হস্তিপৃষ্ঠে হাউদায় ভরিয়া, সেই হস্তি আপনাদিগের মধ্যভাগে রাখিলেন। প্রায় দুই শত বাছা বাছা সওয়ার সঙ্গে লইয়া ও কতকগুলি পাঠান প্রভৃতি বিজাতীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রধান সর্দ্দারগণ কেল্লা হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত তৎপর হইল। স্বয়ং রাণীঠাকুরাণী পুরুষবেশ করিলেন, অঙ্গে তার-জড়িত বর্ম্ম ধারণ করিলেন এবং কোমরে কিরিচ্ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের সহিত একটী দিব্য তলোয়ার ঝুলাইয়া আড়াই হাজার টাকা মূল্যের একটি সাদা রঙ্গের তেজালো ঘোড়ার উপর আরোহণ করিলেন। আপনার সঙ্গে তিনি কিছুমাত্র অর্থাদি লইলেন না। কেবল একটি রুপার পেয়ালা বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন এবং একটি অল্পবয়স্ক ক্ষুদ্র বালককে রেশমের কাপড়ে বাঁধিয়া পৃষ্ঠোপরি লইলেন। এই বালকটিই যে রাণীঠাকুরাণীর প্রাণপ্রিয় দত্তকপুত্র দামোদর রাও, তাহা বোধ হয় পাঠককে বলিতে হইবে না।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইলে পর, "জয়শঙ্কর" "হর হর মহাদেব" এইরূপ বাক্য উৎসাহভরে গর্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্ব মণ্ডলী কেল্লার নীচে অবতরণ করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা কেল্লার সুড়ঙ্গ রাস্তা দিয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু মধ্যরাত্রিপ্রযুক্ত সে রাস্তা খুঁজিয়া না পাওয়ায়, অতীব দক্ষতা সহকারে কেল্লাবুরুজের উপর দিয়া, ইংরাজ সৈন্যের গতিবিধির উপর নজর রাখিয়া, সহরের মধ্যস্থিত উত্তর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িবেন, এইরূপ মৎলব করিলেন। যে সময়ে রাণীঠাকুরাণী, ঝাঁশিকে শেষ নমস্কার দিয়া, সমস্ত সৈন্য সমক্ষে, আপনার সেই

তেজস্বী অশ্বকে পূর্ণবেগে ছুটাইয়া চলিলেন, সেই সময়ে সর্ব্বলোক রাণীঠাকুরাণীকে বিদায়-নমস্কার দিবার জন্য, রাস্তার দুই পার্শ্বে, কেল্লার মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। রাণী ঠাকুরাণী সকলের নিকট সপ্রেম বিদায় গ্রহণ করিয়া, অতি সত্বর, কতকগুলি সওয়ার-সমভিব্যাহারে, উত্তর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সেই দরজার বাহিরে 'তেহরী' সংস্থানের তোপ-মঞ্চ স্থাপিত ছিল। তোপ-মঞ্চের লোকেরা বাধা দেওয়ায়, "ইহা তেহরীর ফৌজ, রোজ সাহেবের সাহায্যে যাইতেছে" এই কথা বলিয়া রাণীঠাকুরাণী অতীব কৌশল সহকারে, সেইস্থান পার হইয়া গেলেন। রাণীঠাকুরাণীর দল চলিয়া গেলে, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার যে সৈন্য আসিতেছিল, ইংরাজ-সৈন্য তাহাদিগের গতিরোধ করিল। এবং উভয় সৈন্যের মধ্যে গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ হইয়া মহা যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এদিকে, এক জন দাসী, একজন বন্দুকধারী অশ্বারোহী, আর দশ পোনেরো জন সওয়ার, ইহা-দিগের সহিত রাণী ঠাকুরাণী, শত্রু-ছাউনীর মধ্য দিয়া একেবারে কাল্পীর রাস্তায় গিয়া পড়িলেন। সেই সময় ইংরাজ-সেনাপতি সর্-হিউ-রোজ রাণীর পলায়নের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অনুধাবন করিবার জন্য, লেফ্‌টেনণ্ট বৌকরের নেতৃত্বাধীনে কতক-গুলি সওয়ার পাঠাইলেন। কিন্তু রাণীঠাকুরাণীর অশ্ব অতীব দ্রুত-গামী হওয়ায়, পলকের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রাণী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন; ইংরাজ-সওয়ারেরা বরাবর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল; অবশেষে রাত্রি হওয়ায় আর তাঁহার সন্ধান পাইল না।

রাণীঠাকুরাণী কেল্লা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, তাহার পরদিন সকালে, তৃতীয় য়ুরোপীয় পণ্টনের অধিনায়ক, লেফ্‌টেনেণ্ট বেগ্রী ঝাঁশির কেল্লার উপর আরোহণ করিলেন। গিয়া দেখিলেন,

কেল্লার দরজা একেবারে উদ্ঘাটিত; তিনি পরমানন্দে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটি মাত্র মনুষ্য নাই। সমস্ত কেল্লা বিনা আয়াসে তাঁহার হস্তগত দেখিয়া, নিশ্চিন্তমনে তথায় তাঁহার বিজয়ধ্বজা স্থাপন করিলেন।

কর্ণেল মেডোজ টেলর সাহেব, রাণীর পলায়ন-ব্যাপার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :-"অবশেষে,—তখনও অনেক রাত্রি—কেল্লার যে ভাগটি অত্যন্ত নিরালা, সেই ভাগের একটি দরজা খোলা হইল —তাহার মধ্য দিয়া বিষণ্ণভাবে, পলাতকদিগের যাত্রার-ঠাট বাহির হইল। রাণী এবং তাঁহার ভগিনী বা সহচরী, পুরুষ-বেশ ধারণ করিয়া কতকগুলি বাছা-বাছা অনুচর-বর্গ সঙ্গে লইয়া, নীরবে, সিংহদ্বার পার হইয়া, বাহিরের ঘোর অন্ধকারে আসিয়া পড়িলেন..... মৃদুস্বরে দুই চারিটি ফুস্ ফুস্ কথা ভিন্ন, আর কারও মুখে কথাটি নাই—অবশেষে শেষ লোকটি পর্য্যন্ত পার হইয়া গেল— অমনি দ্বার রুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ হইল। প্রাণ হাতে করিয়া পলায়ন করাই সেই রাত্রির ব্যাপার; কেননা, ১৪ সংখ্যক ড্রেগুন-সৈন্যের ইংরাজ অশ্বারোহী পর্য্যটক প্রহরীদল এবং হাইদ্রাবাদের কণ্টি-জেণ্ট ফৌজ, সতর্ক ও সজাগভাবে সর্ব্বত্র পহারা দিতেছিল; মধ্যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সকল লোকের হস্ত হইতে রাণী কি করিয়া এড়াইয়া গেলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই; কিন্তু রাণীর সঙ্গে ভাল ভাল পথ-প্রদর্শক ছিল, এ কথা সত্য। রাণী একজন নির্ভীক ঘোড়সওয়ার ছিলেন, তিনি অতি দ্রুতবেগে, আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো পথের মধ্য দিয়া জঙ্গল-প্রদেশে আসিয়া পড়িলেন। এই জঙ্গলপ্রদেশে প্রবেশ করাই, তাঁহার প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়।"

কর্ণেল ম্যালেসন বলেন "সর হিউ রোজ, ইতিমধ্যে, কেল্লা আক্রমণ করিবার বিবিধ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু রাণী সেই বিষয়ে আর তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে দিলেন না।"

সে যাহা হউক, রাণীঠাকুরাণী ঝাঁশি হইতে বাহির হইয়া গেলে, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার যে সৈন্য আসিতেছিল, তাহাদিগের সহিত ইংরাজ সৈন্যের সাক্ষাৎ হওয়ায় তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঝাঁশি সৈন্যের মধ্যে "মকরাণী" অশ্বারোহী দল যদিও বিলক্ষণ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল—কিন্তু অবশেষে ইংরাজের গোলাগুলি প্রহারে অতিষ্ঠ হইয়া মোরোপন্ত-তাঁবে প্রভৃতি সর্দ্দার কে কোথায় পলাইতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। ইংরাজ সওয়ারেরা তাহাদিগকে অনুধাবন করিয়া প্রায় দুই শত লোক পাক্‌ড়াও করিয়া আনিল এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাহাদিগের প্রাণনাশ করিল।

রাণীঠাকুরাণীর পিতা ও মুখ্য কর্ম্মচারী—মোরোপন্ততাঁবে, হস্তি-পৃষ্ঠে রত্ন-ভার বোঝাই করিয়া সেই হস্তির সঙ্গে সঙ্গে, ঘোড়ায় চড়িয়া পলাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, রাত্রির অন্ধকারে, নিজের তলোয়ারের খোঁচা নিজের জঙ্ঘায় লাগিয়া গেল। তাহাতে ভয়ানক রক্তস্রাব হইয়া তাঁহার সমস্ত পায়জামা ভিজিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি তিনি ঘোড়ার রেকাবের উপর ভর দিয়া ছুটিতে লাগিলেন, প্রভাত সময়ে, "দতিয়া" সহরের নিকটে আসিয়া পৌছিলেন। দতিয়ার রাজা ইংরাজের মিত্র। মোরোপন্ত সমস্ত রাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান হওয়ায় অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে আবার জঙ্ঘাদেশে বিষম আঘাত লাগিয়া রক্তধারায় পরিচ্ছদাদি আপ্লুত হইয়াছিল—সুতরাং নিরুপায় হইয়া সহরের দরজার নিকট আসিয়া তত্রস্থ একজন খিলি-ওয়ালার নিকট,

দীনবচনে আশ্রয় চাহিলেন এবং তাহাকে কিছু টাকা দিতেও স্বীকৃত হইলেন। তাম্বুল-বিক্রেতা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া আপনার ঘরে রাখিল। এই কথা, দতিয়া-সংস্থানের দেওয়ান জানিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনাইয়া কয়েদ করিলেন; এবং তাঁহার নিকট যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি ছিল সমস্ত হস্তগত করিয়া, নিজ সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে ঝাঁশিতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে পৌছিবামাত্র ঝাঁশির প্রধান কর্ম্মচারী সররবর্ট হ্যামিল্টন্ ও সর-হিউ-রোজ, রাজবাটীর সম্মুখে, দিবা দুইটার সময়, তাঁহাকে ফাঁশি দিলেন। এইরূপে রাণীর পিতা মোরোপন্তের ইহলীলা সাঙ্গ হইল।

"তাদৃশী জায়তে বুদ্ধির্ব্যবসায়োঽপি তাদৃশঃ
সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা।"

রাণী লক্ষ্মীবাই ঝাঁশি হইতে বহির্গত হইয়া, ১০।১৫ জন সওয়ার-সঙ্গে, ভাণ্ডের-নামক এক সহরে আসিয়া পৌছিলেন। ঘোড়া হইতে নামিয়া, সহরকোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, স্বীয় দত্তক-পুত্র দামোদর রাওর জন্য আহারের যোগাড় করিলেন। এবং আহারাদি সমাপন করিয়া কাল্পী সহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে লেফ্‌টেনেণ্ট বোকর কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাণীকে অনুধাবন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাণী তাঁহাকে তলবারের দ্বারা আঘাত করিয়া, ঘোড়া সবেগে ছুটাইয়া নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। এবং ১৮৫৮ অব্দের ১২ জুন তারিখে কাল্পীতে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে, নানা সাহেবের ভ্রাতা রাও-সাহেব স্বসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া, পর দিন প্রাতে

শ্রীমন্ত রাও-সাহেব পেশোয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিজ তলবার রাও-সাহেবের হস্তে দিয়া এইরূপ বলিলেন "তোমার পূর্ব্বপুরুষেরাই এই তলবার আমাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহাদের পুণ্য-প্রতাপে আজ পর্য্যন্ত আমি এই তলবারের যোগ্য ব্যবহার করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আর সাহায্য করিতেছ না—অতএব, এই তলবার আমি তোমাকে ফেরত দিতেছি"। এই কথা শুনিয়া, রাও-সাহেবের হৃদয় বিগলিত হইল; এবং তাহার সৈন্যের দ্বারা রাণীর যে কোন সাহায্য হয় নাই, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এইরূপ বলিলেন "আপনি আজ পর্য্যন্ত, ঝাঁশির সুবেদার বংশের অনুরূপ যে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রবল ইংরাজ সৈন্যের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া যেরূপ রণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ন্যায় বীরাঙ্গনা যদি সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের জয়ের সম্ভাবনা। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সময়ে, শিন্দিয়া, হোলকার, গায়কবাড়, বুন্দলে, প্রভৃতি সর্দারগণ রাজ্যরক্ষার্থ আপনাদিগের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে তৎপর হইয়াছিলেন বলিয়াই মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের পতাকা আটক পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছিল; এক্ষণে আপনার ন্যায় শৌর্য্যশালী সর্দারেরা যদি এই সময়ে আমাদিগকে সাহায্য করেন তবেই আমাদিগের সিদ্ধি লাভ হইতে পারে; অতএব, আপনার তলবার ফিরিয়া লউন এবং আমাদিগকে উত্তম রূপে সাহায্য করুন।" রাও-সাহেবের এই সবিনয় মিনতি মান্য করিয়া রাণী তাঁহার তলবার পুনঃগ্রহণ করিলেন। রাও-সাহেব পেশোয়া, সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া, তাহাদিগের কওয়াৎ করাইয়া, রাণীঠাকুরাণীকে ও তাত্যা-টোপেকে সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন।

এদিকে সর-হিউ-রোজ, সসৈন্যে কাল্পী আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন এবং প্রথমে কুঁচ-সহর আক্রমণ করিয়া তাত্যাটোপে ও বান্দে-ওয়ালা নবাবকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন। এই যুদ্ধে অনেক বারুদ গোলা ও ধান্য তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, তাত্যাটোপে, রাও-সাহেব প্রভৃতি মণ্ডলী কাল্পীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বান্দেওয়ালে নবাবের যুক্তি অনুসারে, রাও-সাহেব সমস্ত সৈন্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রাণীঠাকুরাণীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন নাই, এই হেতু, রাণী এই যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। রাণীর নিজ সৈন্য না থাকায়, তিনিও রাও-সাহেবদিগের সহিত কাল্পীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কাল্পীতে আসিয়া, রাণী সৈন্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাও-সাহেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন; তিনি বলিলেন, সুব্যবস্থা না থাকাতেই গত যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে এবার রাও-সাহেব সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাণীকে সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব না দিয়া, আপনি সেনাপতি হইলেন। রাও-সাহেবের প্রাধান্য-লালসা ও যশোলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল – তাঁহার বিপুল সৈন্যের আধিপত্য একজন স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করিতে তিনি ইষ্ট মনে করিলেন না। তথাপি বাহ্যাকারে বহুমান প্রদর্শন করিয়া রাণীর অধীনে ২০০।২৫০ অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে যমুনাভিমুখের দিক সংরক্ষণার্থ বিনতি করিলেন। রাণী তাহাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, সুব্যবস্থা সহকারে, তাহাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। সর্-হিউরোজ, একেবারে কাল্পীতে না গিয়া, প্রথমে গলাবলী সহর আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। এই সময়ে কাল্পীর বিদ্রোহী-সৈন্যের বীরোৎসাহ সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া-

ছিল—তাহারা যমুনার শপথ করিয়া বলিতে লাগিল, হয় ইংরাজ-দিগকে ধরাশায়ী করিব নয় আমরা যুদ্ধাঙ্গনে প্রাণ দিব। এই বলিয়া তাহারা নিরাপদ স্থান ছাড়িয়া ইংরাজদিগের তোপের আন্দাজের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ইংরাজেরা এই সুবিধা পাইয়া প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। কাল্পীর সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিল বটে কিন্তু অবশেষে পরাভূত হইল। কাল্পীর অগ্রগামী সৈন্যদলের পরাভব হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র, পেশোয়ার সমস্ত সৈন্য হতাশ হইয়া পড়িল। রাও-সাহেব পেশোয়া, বান্দেবালে-নবাব প্রভৃতি মুখ্য যোদ্ধৃগণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পলাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেইসময়, রাণী তাঁহাদিগকে সাহস দিয়া আপনার ঘোড়া আনিতে বলিলেন এবং তাহাতে সওয়ার হইয়া কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে, ইংরাজদিগের দক্ষিণ পার্শ্ব সবেগে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার এই ঝড়গতি আকস্মিক আক্রমণে ইংরাজ সৈন্য একেবারে হটিয়া গেল এবং তিনি এরূপ সতেজে যুদ্ধ করিলেন যে ইংরাজ "লাইট ফিল্‌ড্‌" তোপের গোলন্দাজেরা কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং তাহাদের তোপ বন্ধ হইয়া গেল! শুধু তাহা নহে, রাণীঠাকুরাণী তোপের ২০ ফুট অন্তর-পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে সাহস পাইয়া কাল্পীর অন্যান্য ফৌজও আসিয়া পড়িল। দুইপক্ষ একেবারে মুখামুখী হওয়ায় ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইংরাজ গোলন্দাজেরা হতবীর্য্য হইয়া পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া সর্‌-হিউ-রোজ স্বীয় উষ্ট্রারোহী সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তিনি স্বয়ং সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সতেজে কাল্পী-সৈন্যের বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। কাল্পীর সৈন্য এতক্ষণ ভাং পান করিয়া নেশার ঘোরে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে-

ছিল, কিন্তু উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে যখন গোলা-গুলি অজস্র বর্ষণ হইতে লাগিল, তখন তাহাদিগের চেতনা হইল এবং আর রণস্থলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। এক্ষণে রাণীঠাকুরাণী হতাশ হইয়া রাও সাহেব পেশোয়ার ছাউনী মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ইংরাজেরা কাল্পী অধিকার করিল এবং দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের যুদ্ধ সামগ্রী তাহাদিগের হস্তগত হইল।

এদিকে, রাও-সাহেব পেশোয়া পরাভূত হইয়া, সসৈন্যে গোয়ালিয়ারের ৪৬ মাইল দূরে, গোপালপুর নামক এক সহরে পলাইয়া গেলেন। রাণীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ক্রমে সেখানে তাত্যা-টোপে ও বান্দেওয়ালা নবাবও আসিয়া জুটিলেন। তাঁহাদিগের সকলকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও পেশোয়াকে চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া রাণী তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন "আজ পর্য্যন্ত মারাঠীরা যে শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, দুর্ভেদ্য ও বলাঢ্য কেল্লার আশ্রয়ই তাহার মুখ্য কারণ। শ্রীছত্রপতি শিবাজি মহারাজ যে, যবনদিগকে পরাভূত করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, সেও সিংহগড়, রায়গড়, তোরনা আদি কেল্লার বলে। তিনি প্রথমে আত্মরক্ষণের জন্য ঐ সকল প্রচণ্ড কেল্লা হস্তগত করেন, পরে, শৌর্য্য-পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। অতএব, পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা হইতে জানা যাইতেছে যে, কেল্লার সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধ করা ব্যর্থ। আমাদিগের অধীনে, ঝাঁশি, কাল্পী প্রভৃতির ন্যায় অনেকগুলি কেল্লা থাকা প্রযুক্তই আমরা আজ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সকল কেল্লা আমাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে। এক্ষণে আর একটি কেল্লা হস্তগত করা আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। আমরা যেথা-

সেই পলাইতেছি ইংরাজেরা আমাদিগের অনুসরণ করিতেছে। এবং কোন প্রকারে আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এইরূপ স্থির করিয়াছে। যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই। তাহার প্রতি দৃক্-পাত না করিয়া, এই উপস্থিত বিপদকালে, একটা কোন কেল্লা হস্তগত করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে যাহাতে জয়লাভ হয় তাহার উপায় শীঘ্র অবলম্বন করা আবশ্যক।" রাণীঠাকুরাণীর এই বাক্য শুনিয়া, শ্রীমন্ত পেশোয়া বড়ই তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কোন্ কেল্লা হস্তগত করিবার চেষ্টা করা যাইবে। রাণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "উপস্থিত বিপদে ঝাঁশি কিম্বা কাল্পী অধিকার করিবার আশায় শত্রুর সম্মুখ দিয়া যাত্রা করায় ইষ্ট নাই। এই হেতু, গোয়ালিয়ারে যাত্রা করিয়া শিন্ধিয়া সরকার ও তাঁহার ফৌজের সাহায্য লওয়া যাউক্ এবং সেখানকার পাহাড়ী কেল্লার আশ্রয় ধরিয়া আমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যাউক্।" এই কথা রাও সাহেবের বড়ই মনোনীত হইল এবং তিনি ইহার জন্য রাণীঠাকু-রাণীকে অভিনন্দন করিলেন। তাত্যা টোপেও এই কথায় অনু-মোদন করিলেন। তাত্যা টোপে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার গোপনে গোয়ালিয়রে গিয়াছিলেন তাই তিনি শিন্ধিয়া সৈন্যের মনোভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অতএব, এক্ষণে গোয়ালিয়ারে যাত্রা করাই স্থির হইল। রাও সাহেব ও রাণীঠাকুরাণী সসৈন্যে ১৮৫৪ অব্দের ৩০ মে তারিখে গোয়ালিয়ারের নিকটস্থ মুরারের ছাউনীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই সময়ে শ্রীমন্ত মহারাজ জয়াজীরাও শিন্ধিয়া গোয়ালিয়ারের অধিপতি ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ২৩ বৎসর ছিল; ইনি প্রায়ই বিলাস সম্ভোগেই নিমগ্ন থাকিতেন; কিন্তু

এদিকে, বুদ্ধিমান ও যুদ্ধপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী দিনকর রাওই প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য্য চালাইতেন। দিনকর রাও প্রথমে একজন সামান্য কেরাণী মাত্র ছিলেন, রেসিডেণ্ট বুশ্‌বি সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া তাঁহার ঐরূপ পদোন্নতি করিয়া দেন। সেই অবধি, তিনি অতীব দক্ষতাসহকারে গোয়ালিয়ার সংস্থানের সংস্কার সাধন করিয়া, সুচারুরূপে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এই সময়ে ম্যাক্‌ফর্সন সাহেব গোয়ালিয়ারের রেসিডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার সহিত মহারাজের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। মহারাজ একবার কলিকাতায় গিয়া লর্ড ক্যানিঙের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দত্তকগ্রহণে তাঁহার আধিপত্য বংশানুক্রমে স্থায়ী করিতে পারিবেন এই অনুমতিও লাট সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই হেতু সিন্ধিয়া সরকার ইংরাজের খুব বাধ্য ছিল কিন্তু সিন্ধিয়ার সৈন্য ও প্রধান মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই বিদ্রোহীদিগের সহিত সহানুভূতি ছিল। এই সময়ে রাও সাহেব সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সিন্ধিয়া সরকারের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন। সিন্ধিয়া মহারাজ সাহায্য করা দূরে থাক্, এই পত্র পাইয়া বলিয়া উঠিলেন "বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সমুচিত শাস্তি দিতে আমি প্রস্তুত আছি"। কিন্তু সুচতুর দেওয়ান দিনকর রাও আপনার মনোগত ভাব শত্রুপক্ষকে জানিতে না দিয়া, গোয়ালিয়ার সহরের সংরক্ষণের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজদিগের ফৌজ আসিয়া পৌঁছিলে তখন তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। এবং সমস্ত ঘটনা ম্যাকফর্সন সাহেবকে জানাইয়া তাঁহার সহিত গোপনে পত্রব্যবহার চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এ দিকে, সিন্ধিয়া মহা-

রাজ চপল বাল-স্বভাব প্রযুক্ত, তাঁহার নিজ খাস সৈন্যের পরামর্শ শ্রবণ করিয়া বিদ্রোহীগণকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১লা জুন তারিখে প্রাতঃকালে সিন্ধিয়া মহারাজ যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে, মুরার-ছাউনীর দুই মাইল দূরে বাহাদুরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের ছাউনীর অভিমুখে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই একটা গোলা ছাউনীর পার্শ্বে আসিয়া পড়ায়, পেশোয়ার সেনানায়কগণ শিঙ্গা বাজাইয়া সমস্ত সৈন্যকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে ইসারা করিল। কিন্তু পেশোয়ার নিকট যে দুই একজন মুচ্ছুদি-লোক ছিল তাহারা বলিল "পেশোয়া সর-কারের সহিত প্রেম সম্বন্ধ সিন্ধিয়া সরকারের মধ্যে এখনও জাগ্রত আছে—সিন্ধিয়া সরকার কখনই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। ঐ যে তোপের আওয়াজ শোনা যাইতেছে, বোধ হয় উহা আপনার স্বাগতার্থ সিন্ধিয়া সেলামী দিতেছেন"। রাও সাহেব পেশোয়া ও তাত্যাটোপের, সিন্ধিয়ার সাহায্যের উপর পূর্ণ ভরসা থাকায়, তাঁহারা এই কথায় বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধের হুকুম দিলেন না। এদিকে, শত্রুপক্ষ হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, পেশোয়ার সৈন্য অতিষ্ঠ হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল; পেশোয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

রাণীঠাকুরাণী এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া, মহা আবেশ সহকারে আপনার দুই তিন শত ঘোড়শোয়ার সঙ্গে লইয়া, একে-বারে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং সিন্ধিয়ার তোপখানার উপর সবেগে ধাবমান হইলেন। তোপখানা আক্রমণ করিবামাত্র, গোলন্দাজেরা তোপ ফেলিয়া পলায়ন করিল। কেবল, মহারাজ জয়াজীরাও সিন্ধিয়া শৌর্য্যানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া, আপনার খাস-

সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণীর সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, দিনকর রাও ও দুই একজন সর্দ্দার সমভিব্যাহারে মহারাজ সিন্ধিয়া আগ্রা অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

এদিকে, শ্রীমন্ত রাও সাহেব পেশোয়া, মঙ্গলবাদ্য সহকারে মহা সমারোহে গোয়ালিয়ার প্রাসাদে আগমন করিলেন। মহারাণী লক্ষ্মীবাই ঠাকুরাণী, সৈন্য ছাউনীর নিকট 'নবলখ' নামক এক বাগানবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাত্যাটোপে গোয়ালিয়ার কেল্লায় কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন—তাহারা পৌঁছিবামাত্র কেল্লার সর্দ্দার কেল্লার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। তাত্যাটোপের সৈন্যগণ, সমস্ত যুদ্ধ সামগ্রীর সহিত কেল্লা অধিকার করিল। কেল্লা দখল করিয়া বিদ্রোহীরা দেওয়ান দিনকর রাও এবং অন্যান্য মান্য গণ্য লোকদিগের গৃহ ভূমিসাৎ করিল এবং সহরে লুঠপাঠ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু রাও সাহেব, নগরবাসীদিগের প্রতি কোন প্রকাব অত্যাচার না হয় এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়া লুঠপাঠ শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দিলেন।

৩রা জুন তারিখে দরবার আহ্বান করিয়া রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সমাপন করিয়া, রাও সাহেব পেশোয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গোয়ালিয়ায়ে, "গঙ্গা দশহরা" উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রথা থাকায়, তিনি প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে আকণ্ঠ ভোজন করাইয়া সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপ চারিদিন ধরিয়া বিজয়োৎসব চলিতে লাগিল। এদিকে সর্ হিউরোজ বিদ্রোহীদলদিগকে পরাভব করিতে করিতে ক্রমশ গোয়ালিয়ারের নিকটবর্ত্তী মুরারের ছাউনীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে রাও সাহেব এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেই ব্যস্ত ছিলেন। এই সংবাদ

যখন শুনিলেন, তখন তিনি তাত্যাটোপেকে সৈন্যের ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন কিন্তু স্বয়ং ব্রাহ্মণভোজন লইয়াই ব্যাপৃত রহিলেন।

তাত্যাটোপে মুরারের ছাউনী রক্ষণার্থ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, উভয় পক্ষে দুই ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ হইল, অবশেষে ইংরাজেরা মুরার দখল করিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র রাও সাহেব ত্রস্তব্যস্ত হইয়া সৈন্যশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাণীঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতি নম্রতাপূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এই আসন্ন বিপৎকালে কি কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাণীঠাকুরাণী ইতিপূর্ব্বে সৈন্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাও সাহেবকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি বিজয়োৎসবে মত্ত হইয়া সে দিকে বড় মনোযোগ দেন নাই। এতক্ষণে তাঁহার চেতনা হইল। কিন্তু সুযোগ একবার ছাড়িয়া দিলে আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

'ন কার্য্যকালং মতিমানতিক্রমেৎ কথঞ্চন।
কথঞ্চিদেব ভবতি কার্য্যযোগঃ সুদুর্লভঃ॥"

রাণী ঠাকুরাণী তাত্যা-টোপেকে এইরূপ বলিলেনঃ—"আজ পর্য্যন্ত আমরা যে এত প্রাণপণ পরিশ্রম করিলাম, তাহা সফল হইবার আর আশা রহিল না! শ্রীমন্ত পেশোয়ার দুরাগ্রহী স্বভাব প্রযুক্ত ও তাঁহার বিজয়োন্মত্ততা বশতঃ আমাদের সমস্ত যুক্তি পরামর্শই বৃথা হইল! ইংরাজ সৈন্য আমাদিগের মুখামুখী হইয়াছে, তথাপি এখনও আমাদের সৈন্যমধ্যে কিছুমাত্র ব্যবস্থা নাই। অতএব, এখন আমরা ইংরাজের সম্মুখীন হইয়া কতদূর কৃতকার্য্য

হইব, তাহাতো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তথাপি, উপস্থিত বিপদের সময়ে সাহস ত্যাগ করিলে কোন ফল হয় না। তুমি এক্ষণে ফৌজের পরিদর্শনে এখনি বহির্গত হও এবং যাহাতে বিরুদ্ধ পক্ষ আমাদিগের প্রতি আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করো। আমি নিজ কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত আছি। এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।” তাত্যা-টোপে, এই কথা শুনিবামাত্র বীর্য্যোৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং রাণী ঠাকুরাণীর প্রতি গোয়ালিয়ারের পূর্ব্বদিক্ রক্ষণের ভার দিয়া নিজে অন্য সৈন্যবিভাগের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক্ষণে রাণী ঠাকুরাণী যোদ্ধৃ-বেশ পরিধান করিয়া ও অশ্বারূঢ় হইয়া আপনার সৈন্যের মধ্যে কাওয়াৎ করাইতে লাগিলেন।

১৭ই তারিখে ব্রিগেডিয়র স্মিথ্ যুদ্ধের ব্যুগল্ বাজাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইংরাজ সৈন্য সম্মুখে অগ্রসর হইবামাত্র, রাণীর গোলান্দাজেরা তোপ হইতে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজেরা হটিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাণীর অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাহাদিগের উপর ধাবমান হইল। রাণী ঠাকুরাণীও মহা আবেশের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—রণাঙ্গনমধ্যে বিদ্যুল্লতার ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। অবশেষে ইংরাজেরা শত্রুপক্ষের দুই তিনটা তোপ বলপূর্ব্বক অধিকার করায় পেশোয়ার সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়িল—এদিকে আর একদল ইংরাজ সৈন্য রাণীর সৈন্যকে আক্রমণ করায়, রাণীর সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। এক্ষণে, রাণী, দুই তিনজন দাসী ও দুই এক জন বিশ্বাসী সর্দ্দার সমভিব্যাহারে শত্রুর হস্ত হইতে কোন প্রকারে

এড়াইয়া, সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া শক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন। ইংরাজ সওয়ারেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিল—তিনি সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—ইংরাজ সওয়ারেরা তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাঁহার দাসী মুন্দরা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল 'রাণী ঠাকরুণ! মলুম মলুম!' এই শব্দ রাণীর কর্ণগোচর হইবামাত্র রাণী ফিরিয়া আসিয়া মুন্দরার হত্যাকারী ইংরাজ-যোদ্ধাকে অসির আঘাতে যমপুরীতে পাঠাইয়া আবার সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন। সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র জল-প্রবাহ দেখিয়া ঘোড়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। (রাণীর প্রিয় ঘোড়া যুদ্ধে আহত হওয়ায় তিনি সিন্ধিয়ার অশ্বশালা হইতে এই ঘোড়াটি বাছিয়া লইয়াছিলেন।) তিনি ঘোড়াকে খালের উপর দিয়া লইয়া যাইবার বিধিমতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু ঘোড়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ইতিমধ্যে যে ইংরাজ সওয়ার তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, সে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া তিনি তলবার উত্তোলন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—ঐরূপ কিছু কাল অসিযুদ্ধ চলিতে লাগিল—অবশেষে ইংরাজ সওয়ার রাণীর মস্তকের উপর তলবারের এক দারুণ কোপ বসাইয়া দিল। তাহাতে মস্তকের দক্ষিণ ভাগ একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল এবং একটা চক্ষুও বাহির হইয়া পড়িল। ইহার উপরেও দুই এক ছোরার ঘা বসাইয়াছিল এই সময়ে রাণীও তলবারের এক আঘাতে সেই ইংরাজ অশ্বরোহীকে যমসদনে পাঠাইলেন। এক্ষণে, তাঁহার স্বামিনিষ্ঠ সেবক রামচন্দ্র রাও তাঁহাকে এইরূপ আহত দেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেখান হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া নিকটস্থ একটা পর্ণকুটীরে লইয়া গেল। পর্ণকুটীরটির অধিকারী গঙ্গাদাস

বাবাজী। রাণী অত্যন্ত তৃষিত হওয়ায়, বাবাজী তাঁহাকে গঙ্গাজল পান করিতে দিলেন। রাণী ঠাকুরাণী রক্তাপ্লুত দেহে, আঘাতের এই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে, তাঁহার প্রিয় পুত্র দামোদর রাওরপ্রতি বাৎসল্য ভাবে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

সিরাজদ্দৌলা।

প্রথম অধ্যায়।

(সেকালের সুখ দুঃখ)

নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম সকলের কাছেই চিরপরিচিত। তিনি অতি অল্পদিন মাত্র বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যেই স্বদেশে এবং বিদেশে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন!

ইংরাজেরা একবার তাহাদের দেশের একজন হতভাগ্য নরপতিকে নরবলি দিয়াছিল! ঘাতকের শাণিত কুঠার যখন সেই রাজমুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করে, শোণিতলোলুপ জন-সাধারণ তখন উন্মত্ত পিশাচের মত ভৈরব-নৃত্যে করতালি দিয়া কিছুদিনের জন্য প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহাদের দেশের কুটীরে কুটীরে, দুর্গে দুর্গে, প্রাসাদে প্রাসাদে, কত কৃষক, কত সৈনিক, কত সম্ভ্রান্ত পরিবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল! বাঙ্গালী যখন ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে গৃহতাড়িত করে, মীরণের নৃশংস আদেশে সিরাজমুণ্ড যখন দেহবিচ্যুত হয়, দেশের রাজা প্রজা তখন সকলে মিলিয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া

তাহার কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় করজোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন;—সিরাজের শোচনীয় পরিণামে তাহার জন্য কেহই একবিন্দু অশ্রু-মোচনের অবসর পান নাই।

এ সকল এখন পুরাতন কথা। দেশের আর সে অবস্থা নাই, লোকের আর সে তীব্র প্রতিহিংসা নাই, সিরাজ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাজা প্রজা সকলেই ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এখন বোধ হয়, বাঙ্গালী যথার্থ নিরপেক্ষভাবে সিরাজ-চরিত্র আলোচনা করিবার অবসর পাইবেন।

সিরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার সময়ে যে বাঙ্গলা দেশ ছিল, সে বাঙ্গলা দেশও নাই। মোগল বাদশাহেরা যাহাকে "সমুদায় মানবজাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি" * বলিয়া অনুশাসন-পত্রে উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরব-চ্যুত হৃত-সর্ব্বস্ব কাঙ্গাল-ভূমি! সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই; বাঙ্গালীর সে রাজপদ মন্ত্রীপদ নাই, জমিদারদিগের সে জীবন মরণের বিচারক্ষমতা নাই;—সে বাহুবল, সে রণকৌশল, সকলই এখন ইতিহাসগত অতীত কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে! সিরাজদ্দৌলা যে সময়ের লোক, সে সময় এখন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

এক সময়ে এ দেশে মুসলমানের নাম গন্ধ ছিল না। হিন্দুস্থান কেবলমাত্র হিন্দু অধিবাসীর শঙ্খঘণ্টারবে প্রতিশব্দিত হইত। কিন্তু সে বহুদিনের কথা। সে কালের সকল চিত্রই এত পুরাতন, এত জরাজীর্ণ, এত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন আর ভাল করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিচার করিবার উপায় নাই। বহুদিন হইতে এ দেশ হিন্দু মুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হই-

---

* Akbar and Aurangzeb.

যাছে; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বহুদিন হইতে হিন্দু মুসলমান বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা বহন করিতেছে। সিরাজদ্দৌলার সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছিল, কিন্তু ক্ষমতাগত, পদগৌরবগত কোনই পার্থক্য ছিল না। মুসলমানের পরিচ্ছদ, মুসলমানের শিষ্টাচার, মুসলমানের প্রয়োজনাতীত-সৌজন্য-পরিপ্লুত শ্লথবিন্যস্ত শ্রুতি-সুমধুর সুমার্জ্জিত যাবনিক ভাষা এবং পদবিজ্ঞাপক যাবনিক উপাধি গৌরবের সঙ্গে হিন্দু মুসলমানে সমভাবে ব্যবহার করিতেন!

দিল্লীর বাদশাহ নামমাত্র বাদশাহ;—বাঙ্গলার নবাবই বাঙ্গলা দেশের প্রকৃত 'মা বাপ' হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই নবাব-দরবারে হিন্দু মুসলমানের কোনরূপ আসনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল না। বরং অনেকাংশে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। বিলাস-লোলুপ ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব মুসলমান অমাত্যগণ আহার বিহার লইয়াই সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন; কর্ম্ম-কুশল হিন্দু অধিবাসিগণ, কেহ রাজা কেহ মন্ত্রী, কেহ কোষাধ্যক্ষ কেহ বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহুবিক্রমে বাঙ্গলা দেশের ভাগ্য-বিবর্ত্তন করিতেন।

মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। বাঙ্গলা দেশই তাঁহার স্বদেশ, এবং বাঙ্গালী-জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ন বাঙ্গলাদেশেই সঞ্চিত থাকিত; যাহা ব্যয় হইত তাহাও বাঙ্গালীগণ কেহ দ্রব্যবিনিময়ে, কেহ শ্রমবিনিময়ে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চির-নির্ব্বাসিত হইত না!

সেই একদিন, আর এই একদিন! আজ সেদিনের বিলুপ্ত-

কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে অতীতের স্বপ্নসমুদ্র সন্তরণ করিয়া সেকালের বাস্তব রাজ্যের বাস্তব চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে; সেকালের চক্ষু লইয়া, সেকালের প্রাণ লইয়া সেকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে।* সে ইতিহাস কেবল হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার মর্ম্মবেদনার ইতিহাস নহে,—তাহা আমাদিগের পূজনীয় পিতৃপিতামহের সুখদুঃখের ইতিহাস।

সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গলাদেশ ১৩ চাক্‌লায়, এবং ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরগণাগুলি কোন না কোন জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা বাহুবলে আপনাপন রাজ্য রক্ষা করিয়া, বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, যথাকালে নবাবসরকারে রাজস্ব দিতে পারিলে তাঁহাদের স্বাধীন শক্তির প্রবলপ্রতাপে কেহই বাধা দিতে চাহিত না। চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান "ফৌজদার" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা থাকিতেন; তাঁহারা যথাকালে রাজস্ব সংগ্রহের সাহায্য করা ভিন্ন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালীর বাণিজ্য-ভাণ্ডার বহন করিত; সে বাণিজ্যে জেতৃবিজিত বলিয়া শুল্কদানের কোনরূপ তারতম্য ছিল না। মুসলমান নবাব সময়ে সময়ে পাত্রমিত্র লইয়া দরবার করিতেন, কিন্তু শাসনকার্য্যে প্রায়ই মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতেন না! জগৎশেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাদশাহের নামে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রিত হইত, পরগণাধিপতি জমিদারগণ জগৎশেঠের কোষাগারে রাজস্ব ঢালিয়া দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ করিতেন; এবং কখন কখন শিষ্টাচারের অনুরোধে রাজধানীতে আসিয়া কাবা চাপকান পরিয়া, উষ্ণীষ বাঁধিয়া, জানু পাতিয়া, মুসলমানী প্রথায় নবাবদরবারে সমাসীন হইতেন।

দেশে যে অত্যাচার অবিচার ছিল না তাহা নহে;—বরং অনেক সময়েই দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইত। কিন্তু সে অরাজকতায় জমিদার ও মহাজনগণ যতই উৎপীড়িত হ'ন না কেন, কৃষক-কুটীরে তাহার ছায়াস্পর্শ হইত না! কৃষক যথাকালে হলচালনা করিয়া, যথাসম্ভব শস্য সঞ্চয় করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরুদ্বেগে কালযাপন করিত। দেশে দস্যু তস্করের উৎপীড়নের অভাব ছিল না; কিন্তু দেশের লোকের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারেও কোনরূপ নিষেধ ছিল না। সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরাও লাঠি তরবারি চালনা করিতে জানিতেন। দস্যু তস্করের উপদ্রব হইলে, গ্রামের লোকে দল বাঁধিয়া, রাত্রি জাগিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, মশাল জ্বালাইয়া, তরবারি ভাঁজিয়া, বর্শা চালাইয়া আত্মরক্ষা করিত। দস্যু তস্কর ধরা পড়িলে গ্রামবাসিরাই দশজনে মিলিয়া প্রয়োজনাতীত উত্তম মধ্যম দিয়া সংক্ষেপে বিচার-কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত!

ইহাতে যেমন দুঃখ ছিল, সেইরূপ সুখও ছিল। আজকাল দস্যু তস্করে উপদ্রব করিলে কেহ কাহারও সাহায্য করিতে বাহির হয় না; অসহায় গৃহস্থ ঘরে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে! দস্যুদল সর্ব্বস্ব লুটিয়া, মানসম্ভ্রম পদদলিত করিয়া হেলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে বহুদূরে চলিয়া গেলে, গৃহস্থ পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া থানায় গিয়া পুলিসে সংবাদ দিয়া আসে। দারোগা, বক্সী, কনষ্টেবল এবং চৌকিদার মহাশয় অবসর অনুসারে একে একে শুভাগমন করিলে, গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া একহাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে আর একহাতে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঋণগ্রহণে বাহির হয়। দস্যু তস্কর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক সন্দেহে পড়িয়া অনেক গরীবকে নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, দুই

এক স্থলে মিথ্যা অভিযোগ বলিয়া গৃহস্থকেও রাজদ্বারে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সেকালে সুবিচারের সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিল না, সুতরাং কাহাকেও বিচারবিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না।

অনেক বিষয়ে অসুবিধা ছিল; কিন্তু অনেক বিষয়ে সুবিধাও ছিল। পথ ঘাট ছিল না, ত্বরিত গমনের সদুপায় ছিল না, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় ঔষধালয় ছিল না;—কিন্তু লোকের ধন ধান্য ছিল, স্বাস্থ্য ও বাহুবল ছিল; হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবার আবশ্যকতা ছিল না লোকে ঘরে বসিয়া তুলট কাগজে হাতে লেখা রামায়ণ মহাভারত পড়িত, অবসরসময়ে কবিকঙ্কণের চণ্ডীরগান গাহিত, এবং আপনাপন বাসস্থলীতে বসিয়া নিপুণভাবে প্রসন্নচিত্তে আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।

অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে। সভ্যতাবিরোধী সুচিক্কণ সূক্ষ্মবস্ত্রের জন্য সকলেই লালায়িত হইত না; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের একরকম দিন চলিয়া যাইত! পাঠশালার গুরুমহাশয়ের অথবা তাঁহার বেত্র-দণ্ডের মহিমায় যথাসম্ভব বিদ্যাভ্যাস করিয়া বালকেরা অবসরসময়ে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; কখন বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে নিতান্ত অসঙ্গতরূপে একজনের স্থানে দুই তিন জনে চাপিয়া বসিত; কখন বা বর্ষার জলে নদনদী খাল বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত; সময়ে অসময়ে গৃহস্থের গোরু বাছুর চরাইয়া, হাটবাজার বহিয়া দিনশেষে ঠাকুরমার উপ-কথায় হুঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকদল দিবসে তাস পাশা খেলিয়া, দাবাব'ড়ে টিপিয়া, বৈকালে লাঠি তরবারি ভাঁজিত; সন্ধ্যাসমাগমে সযত্নবিন্যস্ত লম্বাকোঁচা দোলাইয়া

অনাবৃত দেহসৌষ্ঠবের গৌরব বাড়াইবার জন্য কাঁধের উপর রঙ্গীন গামছা ছড়াইয়া দিয়া বাবৃরি চুলে চিরুণী গুঁজিয়া, শুক-সারি অথবা নিতান্ত অভাবপক্ষে একটা পোষা বুল্‌বুল্‌ হাতে লইয়া তাম্বুলরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠে মৃদুমন্দ শিষ্‌ দিতে দিতে—পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইত। বৃদ্ধেরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া, দাস দাসী খাটাইয়া, কড়ায় গণ্ডায় সংসারধর্ম্ম পালিয়া, পর্য্যাপ্ত ভোজনের পর তৈলাক্ত স্নিগ্ধ তনু দিবানিদ্রায় সমাহিত করিয়া সায়াহ্নে তামাকু সেবনের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে, নদীসৈকতে অথবা বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া, দেশের কথা, দশের কথা, ওপাড়ার মুখুয্যেদের বিধবা ভাদ্রবধূর কথা,—কত কি আবশ্যক অনাবশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্ধ্যার পর হরিসংকীর্ত্তনে অথবা পুরাণশ্রবণে ভক্তিগদগদহৃদয়ে নিমগ্ন হইতেন। সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহারা দেবতা ব্রাহ্মণ অতিথি ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া, সময়ে অসময়ে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া, নথ নাড়িয়া, চুল খুলিয়া সন্ধ্যার শীতলবাতাসে পুখুরঘাট আলো করিয়া বসিতেন; কত কথা, কত রঙ্গরস,—তার সঙ্গে প্রৌঢ়ার সগর্ব্ব হস্তসঞ্চালন, নবীনার অবগুণ্ঠনজড়িত অস্ফুট সখিলম্ভাষণ, এবং স্থবিরার স্খলৎ-বচনে শিবমহিম্নস্তোত্রের বিকৃত আবৃত্তি সান্ধ্যসম্মিলনকে মধুময় করিয়া তুলিত।

সে দিন আর নাই;—এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। বালকেরা দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই ক খ ধরিয়া পাঁচঘণ্টা স্কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাঁড়াইয়া কখন বা বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে। যুবারা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চাকৃরির আশায়, উমেদারীর আশায়, কখন বা শুধু একখানি প্রশংসাপত্র পাইবার আশায় দেশে দেশে

ছুটাছুটি করিয়া অল্পদিনেই অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে নিতান্ত অসময়ে স্থবিরত্ব লাভ করে! বৃদ্ধেরা অনাবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুঁটার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় দলাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন; আর সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী,—সেই অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ অর্দ্ধঅবগুণ্ঠনে স্বামীপুত্রের সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যকরূপে চিকিৎসকের এবং স্বর্ণকারের ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এ সকল যদি একালের সুখের চিত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি; তবে সেকালেও দেশের লোকের যে সুখশান্তির একেবারেই অভাব ছিল তাহা বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(বাল্যলীলা)

রোমক সভ্যতার তিরোভাবে ইউরোপখণ্ড অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। শিল্প বিজ্ঞানের অভাবে, শিক্ষাদীক্ষার দুর্দ্দশায়, ইউরোপীয়গণ একপ্রকার অসভ্য বর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধ্যযুগের অবসানে আবার ইউরোপের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইল; শিক্ষার জ্যোতিতে আবার চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; উৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্খার তীব্র তাড়নায় ধনরত্নের সন্ধানে লোকে দেশে দেশে ছুটিতে আরম্ভ করিল; পুরাতন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থাবলীর জরাজীর্ণ কীটদষ্ট দুই এক পাতা যে যেখানে কুড়াইয়া পাইল তাহাই লোকে আগ্রহাতিশয়ে অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত হইল। এইরূপে কালক্রমে ভারতবর্ষের নাম ইউরোপে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সেকালে "স্বর্ণখনি" বলিয়া ভারতবর্ষের সুখ্যাতি

ছিল, অধ্যবসায়ী ইউরোপীয়গণ সেই স্বর্ণখণি হস্তগত করিবার আশায় নানাপথে সমুদ্রযাত্রা করিলেন; এবং অধ্যবসায়গুণে কালক্রমে ভারতবর্ষের সন্ধান লাভ করিলেন। দলে দলে ইউ-রোপীয় শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই স্বর্ণখণি সহসা হস্তগত করিবার সেরূপ সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহার ধনরত্ন কুক্ষিগত করিবার আশায় দেশে দেশে বাণিজ্যালয় খুলিয়া, পণ্য দ্রব্য সাজাইয়া, ডাক হাঁক আরম্ভ করিলেন। তাঁহা-দের পণ্যদ্রব্য কতকগুলি কাচের পুতুল,—এদেশের লোক তাহাতে ভুলিল না। ইংরেজ বণিক গ্রামে গ্রামে সেই সকল পণ্যদ্রব্য বহিয়া "বহুত আচ্ছা মাল যাতা হ্যায়" বলিয়া অনেক চীৎকার করিলেন, কৌতুক দেখিবার জন্য কেহ কেহ বোঝা নামাইতে বলিল, কিন্তু একজনেও 'সওদা' করিল না। * সওদাগরেরা অব-শেষে কুঠি খুলিয়া এদেশের কার্পাস এবং পট্টবস্ত্র বিলাতে রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিলেন; কারবার বেশ জাঁকিয়া উঠিল; দেশের লোকের সঙ্গেও একটু আধটু করিয়া আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল।

মুসলমান নবাব বিদেশী বণিকের সৌভাগ্যগর্ব্বে সেরূপ আনন্দ অনুভব করিলেন না। ইংরাজেরা কলিকাতা গোবিন্দপুর ও সুতা-নটী নামক তিনখানি গণ্ডগ্রাম লইয়া ছোটখাট একটি দুর্গ ও বাণিজ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; দিল্লীর নাম-সর্ব্বস্ব বাদশাহের "ফরমাণ" দেখাইয়া জলে স্থলে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং আরও ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার ক্ষমতা আনাইয়াছিলেন। নবাব জমিদারদিগকে শাসন করিয়া দিলেন,

* Dow's Hindoostan.

কেহ ইংরাজের নিকট স্থচ্যগ্র ভূমিও বিক্রয় করিতে সাহস পাই-লেন না; অগত্যা ইংরাজ বণিক দেশে দেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিল্লীর বাদশাহের বাহুবল ক্রমেই টুটিয়া আসিতেছিল; অযোধ্যায় এবং দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য গঠিত হইতেছিল; শিবজীর পদানুসরণ করিয়া মহারাষ্ট্রসেনা হিন্দু সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতেছিল; দেখাদেখি বাঙ্গলার নবাবেরাও বাদশাহকে রাজ-কর প্রদানের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছিলেন। বাঙ্গলাদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন; কেবল কাগজে পত্রে দিল্লীর অধীন বলিয়া পরিচিত হইতেছিল।

এই সময়ে সরফরাজ খাঁ বাঙ্গলার নবাব; তিনি অল্পদিনের মধ্যেই লোকের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রিয়লালসাই তাঁহার কাল হইল! তিনি মোহান্ধ হইয়া একদিন জগৎশেঠের পুত্রবধূকে ধরিয়া আনিলেন;—দেশের লোকে একেবারে শিহরিয়া উঠিল! রাজা ও জমিদারবর্গ সকলে মিলিয়া সরফরাজকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

সেকালের জমিদারদিগের ক্ষমতা ছিল, পদগৌরব ছিল; দিল্লীর দরবারে পরিচয় ছিল। তাঁহারা দশজনে মিলিয়া বাদশাহকে ধরিয়া বসিলে ইচ্ছামত লোককে নবাব করিতে পারিতেন। সরফ-রাজের অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া সকলে মিলিয়া সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন; কিছুদিনের মধ্যেই বাদশাহের অনুমতি আসিল।

সরফরাজের পিতা সুজারখাঁর নবাবী আমলে হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দীখাঁ নামক দুই জন সুশিক্ষিত প্রতিভাসম্পন্ন মুসলমানের বড়ই প্রাধান্য হইয়াছিল। তাঁহারা দুই সহোদর সুজাখাঁর দক্ষিণ বাহু হইয়া প্রথমে মুর্শিদাবাদের মন্ত্রভবনে, পরে উড়িষ্যা ও পাট-

নার রাজধানীতে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী পাটনার নবাব হইয়াছিলেন; লোকে তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। সরফরাজ সেই গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ পাইয়া পাটনাভিমুখে চলিলেন, আলিবর্দ্দীও বাদশাহের ফরমাণ পাইয়া মুরসিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উভয় নবাবের যুদ্ধ হইল। সরফরাজ নিহত হইলেন; আলিবর্দ্দী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

আলিবর্দ্দী হিন্দু মুসলমানের প্রিয়পাত্র,—শুদ্ধ, শান্ত, উৎসাহশীল, ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু নরপতি বলিয়া পরিচিত। তিনি হিন্দুদিগকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; লোকে বলে, তিনি যখন পাটনার নবাব তখন একজন হিন্দু সাধুপুরুষ নাকি তাঁহার সিংহাসন লাভের কথা গণনা করিয়া দিয়াছিলেন। জনরব যাহাই হউক, আলিবর্দ্দী যে বাপুদেব শাস্ত্রী ও তাহার শিষ্য নন্দকুমারকে সবিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলিবর্দ্দীর তিনটিমাত্র কন্যা, একটিও পুত্র সন্তান নাই। তিনি নিজ ভ্রাতা হাজি আহাম্মদের তিন পুত্রের সহিত আপন তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিন জামাতাকে তিন প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিলেন; তদনুসারে একজন পাটনায়, একজন পূর্ণিয়ায় এবং একজন ঢাকায় থাকিয়া নবাবী করিতে আরম্ভ করিলেন।

আলিবর্দ্দী যে দিন পাটনার শাসনভার প্রাপ্ত হন, সেই শুভ দিনে তাঁহার মিরজা মহম্মদ নামে এক দৌহিত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী সেই শুভদিনের আনন্দকোলাহলের মধ্যে সেই নবজাত শিশুকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ যে বালক, কাল সে যুবা হয়; আজ সূতিকাগৃহের ধাত্রীক্রোড় যাহার এক

মাত্র ক্রীড়াভূমি, কালে সমগ্র পৃথিবীও তাহার জন্য যথেষ্ট বিহার-ক্ষেত্র দেখাইয়া দিতে পারে না। আজ যে আলিবর্দ্দীর স্নেহপুত্তল পোষ্যপুত্র, সময়ে সেই বালকই যে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা নামে জগতের নিকট চিরপরিচিত হইবে তাহা কে জানিত?

বাল্যকাল বড় সুখের কাল; কিন্তু বাল্যকালই আবার ভবিষ্যতের অনেক সুখদুঃখের মূল! যে ভাবে, আহার সহবাসে, যেরূপ শাসনে বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়, পরজীবনে তাহার দাগ একেবারে বিলীন হয় না। মানবচরিত্র বুঝিতে হইলে লোকে সেই জন্য বাল্যজীবনের আলোচনা করিয়া থাকে;—আমরাও বালক সিরাজদ্দৌলার বাল্যজীবন আলোচনা করিব।

সিরাজদ্দৌলা মাতামহের স্নেহ-পুত্তল, সেই মাতামহ আবার বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপান্বিত নবাব; সুতরাং বালক সিরাজদ্দৌলা যখন যাহা ধরিয়া বসেন, মাতামহ "সাগর ছেঁচিয়া সাত রাজার ধন এক মাণিক" আনিতে হইলেও তাহা তৎক্ষণাৎ আনিয়া হাজির করেন। তাড়না নাই,—স্নেহ সম্ভাষণ আছে; শাসন নাই,—আব্দার পূরণটুকু পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে; ইহাতে আব্দার দিন দিনই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। আব্দার পূরণ করিয়া শিশুর মুখে সাময়িক উৎফুল্লতা দেখিতে কোন্ মাতামহের না ইচ্ছা হয়? তাহাতে আবার আলিবর্দ্দীর পুত্রসন্তান নাই!

শিশু যাহা ধরিয়া বসে তাহা প্রায়ই অকিঞ্চিৎকর অথবা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। সে কখন হাতি চায়, কখন ঘোড়া চায়, কখন বা একেবারে আকাশের চাঁদখানা হাতের মধ্যে ধরিতে চায়! গরীব-লোকে আর কি করিবে? শোলার হাতি, মাটির ঘোড়া কিনিয়া দেয়, এবং "আয় আয় চাঁদ আয়' বলিয়া আকাশের চাঁদকে

সাদর সম্ভাষণে আবাহন করে। বড়লোকে সত্য সত্যই হাতি ঘোড়া কিনিয়া দেয়, চাঁদ ধরিবার জন্য লোক লস্করের উপর হুকুম জারি করে; শিশু ভবিষ্যতে চাঁদ হাতে পাইবার আশায় আশ্বস্ত হয়। এ সকলই অতি তুচ্ছ বিষয়;—কিন্তু এই সকল তুচ্ছ বিষয় হইতেই শিশুর একটি প্রবল কুশিক্ষার আরম্ভ হয়, এবং একটি প্রয়োজনীয় সুশিক্ষার অভাব জন্মে। সে প্রবৃত্তি দমন করিতে শিখে না; ইচ্ছামাত্রে বাঞ্ছিত বস্তু হাতের কাছে না পাইলে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে না। মাতামহের আদরে সিরাজের তরুণ হৃদয়ে এইরূপে অনেক কুশিক্ষার বীজ পতিত হইতে লাগিল; বালক সিরাজদ্দৌলা প্রবৃত্তি দমনের শিক্ষা পাইলেন না; বাল্যকাল হইতেই মনোবৃত্তির বেগ ক্রমে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল!

এই বালক যে একদিন বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার "মসনদে" উপবেশন করিবে সে কথা লোকের কাছে বেশী দিন ছাপা রহিল না। দাস দাসী এবং আত্মীয় বন্ধুদিগের শিষ্টাচারে, এবং কথোপকথনে বালক সিরাজদ্দৌলাও বুঝিলেন যে তিনি একটি ক্ষুদ্র নবাব! শৈশবজীবনেই বিলাসের বীজ পতিত হইল; পার্শ্বচরেরা প্রাণপণ যত্নে তাহাকে অঙ্কুরিত ও ফলফুলে সুশোভিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন!

রাজপ্রাসাদের আশেপাশে যাহাদের গতিবিধি, তাহারা একেবারেই স্বার্থশূন্য নহে। কেহ পরের খরচে বাবুগিরিটা চালাইবার আশায়, কেহ বা পরের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া ডুব দিয়া জল খাইবার ভরসায় রাজকুমারদিগের সহবাসে মিলিত হইতে আরম্ভ করে। আলিবর্দ্দীর ধর্ম্মজীবন এই শ্রেণীর লোকের নিকট চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিল। আলিবর্দ্দী কর্ত্তব্যপরায়ণ;

কর্ত্তব্যপালনে ধর্ম্ম আছে, পুণ্য আছে, যশোগৌরব আছে; কিন্তু নিয়ত কর্ত্তব্যপালনে আমোদ কোথায়? নবাব হইয়াও যদি কেবল একটি মাত্র মহিষী এবং রাজ্যচিন্তা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবেন, তবে আলিবর্দ্দী নবাব হইলেন কেন? আলিবর্দ্দীর উন্নতজীবন যাঁহাদের নিকট এই সকল কারণে উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা পছন্দমত নবাব গড়িবার আশায় গায়ে পড়িয়া সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত হইতে লাগিলেন।

বুড়া বয়সের অনেকগুণ; কিন্তু একটি প্রধান দোষ এই যে বুড়া বড় স্নেহপ্রবণ;—সে স্নেহপ্রবণতা প্রায়ই অন্ধতার নামান্তর মাত্র। স্নেহপরায়ণ বুড়া স্বামী দ্বিতীয় পক্ষের তরুণীভার্য্যার মেজাজ একেবারেই বিগড়াইয়া দেন; কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া সে কথা একেবারেই উড়াইয়া দেন;—কালে সেই স্বহস্তরোপিত বিষবৃক্ষে সুধাফল ফলে না! বুড়া মাতামহ নাতি নাৎনীর অসঙ্গত আবদারেও সহায়তা করিয়া তাহাদের পরকাল মাটি করেন; কেহ সে কথা তুলিলে "আহা! উহারা সে দিনের দুধের ছেলে, এখনই কি শাসন করিবার সময় হইয়াছে" বলিয়া কথাটা একেবারেই পড়িতে দেন না; বুড়া মাতামহের কাছে নাতি নাৎনীরা চিরদিনই "সে দিনের দুধের ছেলে" থাকিয়া যায়, কখনই তাহাদিগকে শাসন করিবার সময় উপস্থিত হয় না। আলিবর্দ্দীর বুড়া বয়সের স্নেহ-প্রবণতায় সিরাজদ্দৌলার শাসনকার্য্যের সময় হইয়া উঠিল না!

বাল্য ফুরাইল, কৈশোর আসিল; কৈশোরও ফুরাইল, যৌবন আসিল;—কেবল শাসনের সময় আসিল না। সিরাজ ক্রমে ক্রমে কুক্রিয়াসক্ত যুবকদলের দলপতি হইয়া উঠিলেন!

তৃতীয় অধ্যায়।

(প্রমোদশালা)

ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ সিরাজদ্দৌলাকে কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি যে বুদ্ধিবৃত্তিহীন পশুবিশেষ তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কালিকলমের অপব্যয় করিয়াছেন। সিরাজ যে সকল অমানুষিক অত্যাচারে বাঙ্গালীহৃদয় দলন করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; আমরা সেই জন্য সিরাজের নাম শুনিলে এখনও যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি! সুতরাং সত্যের সঙ্গে দশটা মিথ্যা অপবাদ রচনা করিয়া দিলেও তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি না। ইতিহাস বিমুখ বাঙ্গলাদেশে ইংরাজশিক্ষক যেমন শিখাইয়াছেন তাহাই কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ মস্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়পতাকা বাঁধিয়া লোকসমাজে পণ্ডিতম্মন্য হইতেছি। তাঁহারা সিরাজকে শত কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, আমরা আর তাহার বিষয় নূতন করিয়া আলোচনা করিতে চাহিতেছি না।

সিরাজদ্দৌলার যে বুদ্ধিবৃত্তির অভাব ছিল তাহা সত্য নহে; বরং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি এতই অধিক ছিল যে বুদ্ধিমান ইংরাজ বণিকও অনেক সময়ে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে বুদ্ধি কেবল দুষ্ট বুদ্ধি! বন-শার্দ্দুল যেমন অতি সংগোপনে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে শিকারের অনুগমন করিয়া সময় ও সুযোগ পাইবামাত্র একলম্ফে চকিতের মধ্যে গ্রীবা ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিয়া থাকে, সিরাজ সেইরূপ শার্দ্দুল-বৃত্তি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার গতিবিধি এত সরল, কথাবার্ত্তা এত বালকোচিত এবং আচার

ব্যবহার এত সন্দেহশূন্য বোধ হইত, যে নবাব আলিবর্দ্দী কিছুতেই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেন না।

আলিবর্দ্দীর ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে মুরসিদাবাদের রাজপ্রাসাদ যেন পবিত্র তপোবন হইয়া উঠিয়াছিল; মসজিদে মসজিদে যথাসময়ে নমাজ হইত, দ্বারে দ্বারে গরীব কাঙ্গাল অন্ন বস্ত্র লাভ করিত, ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে বিচারকার্য্য পরিচালিত হইত; অবসরসময়ে সুপণ্ডিত মৌলবীগণ শাস্ত্রব্যাখ্যায় চিত্তবিমোহন করিত। বারবনিতাশ্রেণী সিংহদ্বার অতিক্রম করিতে পারিত না; নৃত্যগীত রাজকার্য্যের মধ্যে কলুষকালিমা ঢালিয়া দিবার অবসর পাইত না। ইহাতে বৃদ্ধের দিন কাটিতে পারে; কিন্তু যুবক সিরাজদ্দৌলার দিন কাটিল না। মাতামহের সহবাস প্রথমে একটু অসুবিধাজনক এবং পরে একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। সিরাজ সেই সহবাসে অবরুদ্ধ গৃহকোটরে ছটফট করিতেছিলেন; বুদ্ধিবলে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন।

আলিবর্দ্দী ভাল করিয়া সিরাজচরিত্র বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না; কিন্তু চতুর সিরাজদ্দৌলা ভাল করিয়াই আলিবর্দ্দীর চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে যুক্তিসঙ্গত কথায় যে কোন আবদার ধরিয়া বসিলেই আলিবর্দ্দী তাহা পূরণ করিতে কোন আপত্তি করিবেন না। সুতরাং সিরাজ একটি নূতন বাটী নির্ম্মাণের জন্য আব্দার জানাইলেন। "একখানি জীর্ণ কম্বলে দশজন ফকির এক সঙ্গে বসিয়া বৎসর কাটাইয়া দিতে পারে, কিন্তু একটিমাত্র পুরাতন প্রাসাদে প্রবীণ এবং নবীন দুইজন ভূপতি এক সঙ্গে বাস করিলে তাহাদের মান সম্ভ্রম শীঘ্রই উপহাসের বিষয় হইয়া পড়ে।" কথাটি এত সরল, এত সুযুক্তিপূর্ণ, এত

স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল যে বৃদ্ধ নবাব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দৌহিত্রের জন্য একটি নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিলেন ;—ইহার মধ্যে যে সিরাজের গুপ্ত পাপলিপ্সা লুক্কায়িত থাকিতে পারে, সে কথা একবারও আলিবর্দ্দীর মস্তকে প্রবেশ করিতে পারিল না।

রাজধানীর এক ক্রোশ দক্ষিণে মতিঝিল ;—সেইখানে সিরাজের জন্য প্রমোদভবন নির্ম্মিত হইতে লাগিল। গৌড়ের ইতিহাসবিখ্যাত বাদসাহদিগের সযত্নসঞ্চিত কারুকার্য্যভূষিত প্রস্তররাশি সংগ্রহ করিয়া মতিঝিলের প্রমোদভবন সুসজ্জিত করা হইল। মতিঝিল আছে, কিন্তু সে রাজপ্রাসাদ আর নাই ; মহাপাপের জ্বলন্ত হুতাসনে তাহা ভস্মে পরিণত হইয়াছে ; সে ভস্মরাশিও মীরজাফরের কলঙ্কস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। মতিঝিলের প্রমোদভবন এখন ধূলিবিলুণ্ঠিত,—তাহার কৃষ্ণমর্ম্মরখচিত সুরচিত তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষমাত্র বর্ত্তমান ; তাহাও লতাগুল্মে ঢাকিয়া পড়িয়াছে! ভাগীরথী আর তাহার পদধৌত করিয়া প্রবাহিত হয় না ; মতিঝিলের নীলজলে পদ্মকোরক আর তেমন শোভায় বিকশিত হয় না ; চারিদিক হইতে কি যেন এক গভীর মর্ম্মবেদনার হাহাকার বহন করিয়া তীরতরুগুলি বায়ুভরে শন্ শন্ করিতেছে! ঝিলের জল শৈবালে শাদ্বলে কলঙ্কিত হইয়াছে, কুসুমবন, লতানিকুঞ্জ সকলই এখন তৃণকণ্টকে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বনজন্তুর নিভৃত নিকেতন বলিয়া লোকসমাগম একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছে।

মতিঝিলের প্রমোদভবনে সিরাজের সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল ; মতিঝিলের প্রমোদভবনে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজমুকুট মাথায় তুলিয়াছিলেন ; আবার সেই

মতিঝিলের রাজপ্রসাদেই "দেওয়ানী সনন্দ" ঘোষণকা রিয়া লর্ড ক্লাইব প্রথম পুণ্যাহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইখানে মুসলমানের অস্তগিরি, এইখানেই আবার ইংরাজের উদয়াচল। তাহার পর মতিঝিলের শূন্যগৃহ ওয়ারেণ হেষ্টিংস, সারজনসোর প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারির নিভৃত নিবাস হইয়াছিল; কালক্রমে তাহা ধূলি-পরিণত হইয়াছে। মুসলমান রাজ্য যেমন আজি ইতিহাসগত, মতিঝিলের রাজপ্রাসাদও সেইরূপ ইতিহাসগত;—তাহাকে আর জীবন্তভাবে দেখিবার উপায় নাই!

মতিঝিলের প্রমোদভবন নির্ম্মিত হইলে দলবল লইয়া সিরাজদ্দৌলা বিলাসতরঙ্গে দেহমন ভাসাইয়া দিলেন। কক্ষে কক্ষে, কুঞ্জে কুঞ্জে, ঝিলের শান্তশীতল নীলজলে এবং তীরতরুতলে বিলাসের অট্টহাস্য ছুটিয়া চলিল। মাতামহের প্রাচীন প্রাসাদে যে শক্তি গৃহানিবদ্ধ নির্ঝরিণীর মত ধীরে ধীরে গোপনে গোপনে বহিয়া চলিত, মতিঝিলে আসিয়া সেই শক্তি সমতলক্ষেত্রবাহিনী কলনাদিনী তরঙ্গমালিনী স্রোতস্বিনীর মত কালসমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিল; কে তাহার গতিরোধ করিবে? মাতামহ স্বাধীনতা দিয়াছেন, স্বহস্তে প্রমোদভবন গড়িয়া তুলিয়াছেন, প্রয়োজনানুরূপ বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া ভোগবিলাসের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন; সুতরাং দৌহিত্রের বিশ্বাসস্রোত প্রবলবেগে ছুটিয়া চলিল! হায়, সিরাজদ্দৌলা! এই বিলাসস্রোতই যে সময়ে ধন মান জীবন এবং সিংহাসন পর্য্যন্তও ভাসাইয়া লইবে তাহা জানিলে তোমার জীবন বুঝি মতিঝিলের বর্ত্তমান ইতিহাসকে এত বিষাদপূর্ণ করিত না!

নিত্য নূতন কুসঙ্গী জুটিতে লাগিল; নিত্য নূতন পাপের উৎস খণিত হইতে আরম্ভ করিল; অবশেষে সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন যে

নবাবদত্ত নির্দ্দিষ্ট মাসিকবৃত্তিতে ইচ্ছানুরূপ পাপলিপ্সা চরিতার্থ করা অসম্ভব। চতুর সিরাজ কৌশলক্রমে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলের। মাতামহকে পাত্র মিত্র লইয়া মতিঝিলে পদধূলি দিবার জন্য সসম্ভ্রমে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন ;—আলিবর্দ্দী আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে মুর্সিদাবাদের নবাবদরবারে অনেক রাজা মহারাজা উপস্থিত থাকিতেন ; আলিবর্দ্দী সকলকে সঙ্গে লইয়া মতিঝিলে শুভাগমন করিলেন। অভ্যর্থনার ত্রুটি নাই ; সাদর সম্ভাষণের বিরাম নাই ;—কেহ লতাকুঞ্জে, কেহ শিলাখণ্ডে, কেহ বা সোপান-শ্রেণীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া কখন গঠনসৌষ্ঠবের প্রশংসায়, কখন সেকালের কারুকার্য্যের সহিত এককালের শিল্পীদিগের ঝুঁটাকাজের তুলনায় সমালোচনায়, কখন বা সঙ্গীদিগের সঙ্গে কথা কৌতুকে রাজা মহারাজা সকলে মিলিয়া নবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নবাব একাকী প্রাসাদ পরিদশনে গিয়াছেন, পরিদশন শেষ হইলেই বিস্তৃত কক্ষে দরবার বসিবে। কিন্তু যতই বিলম্ব হইতে লাগিল ততই সকলে অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। নবাব কোথায়, এতক্ষণেও পরিদর্শন শেষ হইতেছে না কেন, নয়নে নয়নে সকলেই পরস্পরকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে সিরাজদ্দৌলা নবাবকে একাকী প্রাসাদ পরিদর্শনে আহ্বান করিয়া কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতে কৌশলক্রমে একটি কক্ষে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছেন। বৃদ্ধ মাতামহ যতই দ্বার হইতে দ্বারান্তরে যাইতেছেন ততই রুদ্ধদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দৌহিত্র উচ্চ করতালি দিয়া অট্টহাস্যে হর্ম্ম্যতল প্রতিশব্দিত করিয়া তুলি-তেছেন : কিছুক্ষণ এ কৌতুকে নবাব বড়ই আমোদ অনুভব

স্করিলেন; কিন্তু শেষে যখন একটি দ্বারও খুলিল না, তখন বাহিরে আসিবার জন্য সিরাজকে দ্বার খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। বালকবুদ্ধির নিকট প্রবীণ নবাব পরাজিত হইয়া কৌশলসংগ্রামে বন্দী হইয়াছেন; সমুচিত অর্থদণ্ড না পাইলে বিজয়ী সিরাজদ্দৌলা তাহার বন্ধনমোচন করিবেন না। নবাব কত বুঝাইলেন, প্রচুর অর্থদানের অঙ্গীকার করিলেন; চতুর সিরাজ সময় বুঝিয়া বলিলেন যুদ্ধশাস্ত্রে নগদ অর্থই একমাত্র মুক্তিপত্র—রাজা বাদশাহের কথায় বিশ্বাস কি? নবাব নিরূপায় হইয়া সমবেত রাজা মহারাজার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন যাহা হইবার হইয়াছে, এ কথা বাহিরে প্রকাশ হইলে সকলে বড়ই উপহাস করিবে। সিবাজ আরও সুযোগ পাইয়া বলিলেন বৃদ্ধ নবাবের পক্ক কেশ রাজা মহারাজাদিগের নিকট যদি এতই মূল্যবান বস্তু তবে তাঁহারাই কেন অর্থদানে নবাবের বন্ধন মোচন করুন না?

নবাব হারিলেন; রাজা মহারাজা সকলে এই সংবাদ শুনিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সিরাজকে জানিতেন, জানিতেন যে সিরাজ যাহা ধরিয়া বসেন কেহ তাহা ঠেলিয়া ফেলিতে পারে না। অগত্যা যাহার কাছে যাহাছিল সমস্ত একত্র করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা সিরাজের হাতে দিয়া নবাবের বন্ধন মোচন করিলেন। সিরাজ এরূপ বালকোচিত পরিহাসপূর্ণ চতুরতার সঙ্গে এই কার্য্যসাধন করিলেন যে নবাব ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং বুদ্ধিকৌশলে বালকের নিকট পরাজিত হইয়া অধিকতর কৌতুক অনুভব করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

সিরাজের বুদ্ধিকৌশলের সঙ্গে অর্থবল মিলিত হইয়া নিত্য নূতন উৎসবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সে উৎসবে নৃত্যগীত, সুরা এবং সুরাসহচরিদিগের প্রাধান্য বাড়িতে লাগিল। অবশেষে গৃহস্থের

সুন্দরী ললনার অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া সিরাজের অনুচরদিগের শ্যেনদৃষ্টি ধাবিত হইল। অর্থবলে, ছলকৌশলে, প্রলোভনে কত গৃহস্থকন্যার সর্ব্বস্বধন লুণ্ঠিত হইতে লাগিল! বাঙ্গালী যাহার জন্য সিরাজের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠে সে এই মহাপাপের কথা দিন দিনই চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু নবাব বর্গীর হাঙ্গামার নিত্য নূতন উৎপীড়নে বিপর্য্যস্ত বলিয়া ইহার গতিরোধ করিবার কোনই আয়োজন করিতে পারিলেন না। দিন যাইতে লাগিল,—কিন্তু দিন দিনই পাপস্রোত খরবেগ ধারণ করিতে লাগিল!

নিবেদন।

তোমার চরণ আমি বন্দনা করি না, প্রভু,
সুখ লালসায়।
স্বাস্থ্য, যশ, ধন, মান, আয়ু—এসবের লাগি
ডাকি না তোমায়।
প্রভু তুমি বড় স্নেহবান,
তোমারে পূজিতে আমি তাই বড় ভালবাসি।
বেশী আরও পাইবার লোভে
কাছে নাহি আসি।

কি আবার দিবে তুমি? কি যে তুমি দাও নাই
তাই ভাবি মনে।

পৃথিবী খুঁজিয়া, কিছু নাহি মিলে, কি অভাব
জানাব চরণে।
সেও শুধু ভক্তি ভালবাসা ;
যেমন প্রকৃতি মাতা তরুলতিকার কাছে
ল'ন মধু পুষ্প উপহার
মহারণ্য মাঝে।

সুখের আশায় নহে, তবে কি দণ্ডের ভয়ে
তব পূজা করি ?
পাপ যদি করি, নাথ, দিয়ো দণ্ড যথাবিধি,—
তাহে নাহি ডরি।
না না প্রভু, ক্ষমা চাহিব না ;
কুম্ভীপাক নরকের যোগ্য যদি হই, হায়,
ঝাঁপাইয়া পড়িব তাহাকে
আপন ইচ্ছায়।

কার্য্যকারণের মাঝে সুদৃঢ় শৃঙ্খলাবলী
বাঁধিয়াছ যাহা,
প্রথম প্রভাত হতে এ বিশ্বের, অদ্যাবধি
ভাঙে নাই তাহা।
সে প্রার্থনা কেমনে করিব ?
নিয়ম-ভঞ্জন, যাহা আমি নিজে ঘৃণা করি,
তাহা তুমি কেমনে করিবে
আপনা বিস্মরি ?

আমার জীবনে, পিতা, রহিয়াছে এই মহা-
গর্ব্ব করিবার,
অন্য কেহ নহি আমি, ক্ষুদ্র নহি, আমি মহা-
সন্তান তোমার।
কমলার পুত্র দীন নহে ;—
তোমার সন্তান আমি, একি কভু হতে পারে
আমি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ধূলিকণা,
তৃণ এ সংসারে ?

গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য্য, তোমার কিঙ্কর তারা,
নহে কি আমার ?
যত কিছু মধুময় রূপ, রস, গন্ধ আদি,
কার তরে আর ?
এ বিপুল স্নেহ-নিদর্শন
হৃদয়ের ভক্তি পূজা না লইয়া নাহি যায়,
সাধ করে নাহি ভালবাসি,
নাহি নমি পায়।

তাই নাথ, নাহি চাহি সুখ আর মোক্ষ আদি
অশেষ কামনা ;
আমার নিশ্চয় যাহা, তাহার লাগিয়া কেন
বৃথা এ ভাবনা ?
তুমি পিতা, আমি পুত্র তব,
এ মহা সম্বন্ধ যদি চিরদিন থাকে মনে,
তবে আর কি অভাব র'বে
জীবনে মরণে ?

ফল লাভ লোভে যেন, করি না কর্ত্তব্য কায
মুহূর্ত্তের তরে।
পাপে না বিরত রহি পরিণাম আশঙ্কায়,
পরিবাদ ডরে।
যাহা কিছু করিব জীবনে,
তোমার সন্তান হয়ে সে কার্য্য উচিত কি না,
তাই যেন বিবেচনা করি,
অন্য কিছুই না।

ক্ষুধার্ত্তে আহার দিয়া, এ কথা কখনও যেন
মনে নাহি হয়,
"যা দিয়াছি, সমুদয় অপর জন্মের লাগি
করেছি সঞ্চয়"।
এই যেন ভাবি মনে মনে ;—
"সে পিতার পুত্র আমি, উচ্চ এ পদবী যবে;
আমি যদি দয়া না করিব,
কে করিবে তবে"?

মিথ্যা, পাপ, কপটতা, নীচতা, এ সবে যদি
ছুটে অভিলাষ;
মনে নাহি করি যেন —"শেষ কি নরকে যাব,
হবে সর্ব্বনাশ"!
নয়ন জ্বলিয়া উঠে যেন :—
"তাঁহার সন্তান আমি, আমার এ অধঃপাত"!
আসে যদি স্বয়ং সয়তান,
হবে ভস্মসাৎ।

এমন হইলে পরে, আমারে ছাড়িয়া আর
সুখ কোথা র'বে ?
ভয়ে, লোভে, আর কেন নিত্য নব কামনার
প্রয়োজন হবে ?
কিন্তু হায় কতদিন পরে,
এ সম্পূর্ণ অধিকার সম্পূর্ণ বুঝিব আমি ?
কোন্ গ্রহে, কত জন্ম পরে,
হৃদয়ের স্বামি ?

অতিথি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ বালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু তোমরা যাচ্চ কোথায় ?—প্রশ্নকর্ত্তার বয়স ১৫।১৬র অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, কাঁঠ'লে।

ব্রাহ্মণবালক কহিল, আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার ?

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ?

ব্রাহ্মণ বালক কহিল, "আমার নাম তারাপদ।"

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড় সুন্দর দেখিতে। বড় বড় চক্ষু এবং

প্রসন্ন হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত; কোন শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁৎ নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছে। যেন সে পূর্ব্বজন্মে তাপস বালক ছিল, এবং নির্ম্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জ্জিত ব্রাহ্মণশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলাল বাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, বাবা তুমি স্নান করে এস, এইখানেই আহারাদি হবে।

তারাপদ বলিল, রসুন্। বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলাল বাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ কোটা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার তেমন পটুত্ব ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্প কালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই একটা তরকারীও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল; একটি ছোট কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড় বড় চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জ্জিত পৈতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়াছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন - মনে মনে কহিলেন, আহা কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে!—

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুই-খানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল, তখন সে কোন অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে, অথচ এমন সহজে করে যে, তাহাতে কোন প্রকার "জেদ্" অথবা "গোঁ" প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশ-মাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পালা-ইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, তোমার মা নাই?

তারাপদ কহিল—আছেন।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তোমাকে ভাল বাসেন না?

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, কেন ভালবাস্‌বেন না?

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে?

তারাপদ কহিল, তাঁর আরও চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ওমা, সে কি কথা! পাঁচটি আঙুল আছে বলে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়?

তারাপদর বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল;—মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন কি, গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না—মারিলেও বালকের আত্মীয় পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্ব্বদাই চুরি করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতর চিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোন্‌রা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড় ভাই পুরুষ অভিভাবকের কঠিন কর্ত্তব্য পালন উপলক্ষ্যে তাহাকে মৃদুরকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্ত চিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন কি, স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না;—তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে;—সে যখনি দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূর দেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে অথবা "বেদে"রা নদীতীরের পতিত

মাঠে ছোট ছোট চাটাই বাঁধিয়া বাঁথারি ছুলিয়া চাঙারি নির্ম্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্ত তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি উপরি দুই তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটবড় সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষতঃ পুরমহিলাবর্গ যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মত বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মত সঙ্গীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগী করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনও সঙ্গীতসভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্কভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সঙ্গীত কেন, গাছের ঘনপল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলি তাহাকে উতলা করিত। এই সঙ্গীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া

সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাখীর মত প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখী কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্ন্যাষ্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ় মাসের অবসান পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্য্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষ্যে দুই তিন দল যাত্রা, পাঁচালি, কবি, নর্ত্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোট ছোট নদী উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্ন্যাষ্টিকের দল এই পর্য্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমতঃ নৌকারোহী দোকানী-দের সহিত মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ এই জিম্ন্যাষ্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়া-ছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভাল বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল জিম্ন্যাষ্টিকের সময় তাহাকে দ্রুততালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরে বাঁশি বাজাইতে হইত এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল নন্দীগ্রামের জমিদার বাবুরা মহা সমারোহে এক সখের যাত্রা খুলিতেছেন—শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্য্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন

স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি প্রভাবে কোন দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারের অনেক কুৎসিৎ কথা সে সর্ব্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোন প্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই, সে এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজ-হংসের মত সাঁতার দিয়া বেড়াইত—কৌতুহলবশতঃ যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এই জন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লান-ভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলাল বাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্নপূর্ণা পরমস্নেহে এই ব্রাহ্মণ বালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয় পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন;—তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্ম্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্দ্ধনিমগ্ন কাশ-তৃণশ্রেণী, এবং তাহার ঊর্দ্ধে সরসসঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পর-প্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোন

এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যজাগ্রত নবীন সৌন্দর্য্যের মত নির্ব্বাক্ নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্য্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের ক্ষেত, গাঢ় শ্যামল আমন্ ধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সঙ্কীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারিদিকের সচলতা, সজীবতা, মুখরতা,—এই ঊর্দ্ধ অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ, চিরস্থায়ী, নির্নিমেষ, বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল ;—অথচ সে এই চঞ্চল মানবকটিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্নেহবাহুদ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাটুঘোড়া সম্মুখের দুই দড়িবাধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা, জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চ কণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষজলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জ্জন করিয়া লইতেছে, কোমর বাঁধা মেছুনীরা চুপ্‌ড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতূহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশঃ দাঁড়ি মাঝিদের

সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল—যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে তুমি কি খাও!

তারাপদ কহিল, যা' পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।

এই সুন্দর ব্রাহ্মণ বালকটির আতিথ্যগ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল; কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলাল বাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, আমার ভাল লাগে না।

নদীর উপর দুই তিন দিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া বাজার করা হইতে নৌকাচালনা পর্য্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা এবং তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে কোন দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদের সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে কোন কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্ব্বদাই সচল হইয়া আছে; এই জন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মত সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন অথচ সর্ব্বদাই ক্রিয়াসক্ত।

মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে ;—কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ,—ভূত ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন বন্ধন নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য্য।

এদিকে অনেক দিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেক প্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোন প্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্ম্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিষ আশ্চর্য্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালি, কথকতা, কীর্ত্তনগান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলাল বাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রী কন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন ; কুশ লবের কথার সূচনা হইতেছে, এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, বই রাখুন ! আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান্।

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালী আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মত সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল ;—দাঁড়ি মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল ; হাস্য, করুণা এবং সঙ্গীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল,—দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে সকল নৌকা চলিতেছিল তাহাদের আরোহীগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল ; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন ?

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলাল বাবু ভাবিতে লাগিলেন এই ছেলেটিকে যদি কোনমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়। কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশির অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চারুশশি তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড়পরা, চুল বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যে দিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সে দিন তাহার মায়ের ভয় হইত পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ্ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুলবাঁধাটা তাহার মনের মত না হইল, তবে সে দিন যতবার চুল খুলিয়া যত রকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক্ কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোন আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্ব্বতোভাবে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া

দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না—দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদের বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদের যে,কোন গুণ আছে ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল অথচ, তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যে দিন কুশীলবের গান করিল সেদিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, সঙ্গীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে;—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—চারু, কেমন লাগ্‌ল? সে কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গীটিকে ভাষায় তর্জ্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—কিছুমাত্র ভাল লাগে নাই এবং কোন কালে ভাল লাগিবে না!

চারুর মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতি বাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্য্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত—তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ সরোদনে বলিত, মা, তোমরা কি গোল করচ আমার ঘুম হচ্চে না। পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সঙ্গীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার

একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত। এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদের নিকট অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না! কেবল, তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনু দেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গীতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মত শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা এক মনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদের সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নন্দীগ্রাম কখন্ ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকা কখনো পাল তুলিয়া কখনো গুণ টানিয়া নানা নদীর শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল;—নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই সকল নদী উপনদীর মত, শান্তিময় সৌন্দর্য্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারো কোনরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত, এদিকে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড় দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমি-

দারের আগমনে বাড়ি হইতে পাল্কী এবং টাটু ঘোড়ার সমাগম হইল, এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী বলিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোন বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয়হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মত হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোনপ্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে, রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে;—ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে, দাদাঠাকুর একটু বসত ভাই আমি আস্‌চি—তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান্‌ করিতেও সে মজবুৎ, তাঁতের

রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনাও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষ্যা সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদের সুদূরে নির্ব্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এত দিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন চারুশশি তাহার প্রমাণ দিল।

বামুন ঠাকরুণের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সেই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যে দিন দেখা করিতে আসিল সে দিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটা মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, তারাপদ নামক তাহাদের নবার্জ্জিত পরমরত্নটির আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুন ঠাকুরুণকে সে মাসী বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া থাকে, যখন শুনিল তারাপদ কেবল, যে, বাঁশিতে কীর্ত্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল

খিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ—অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়—ইতরসাধারণে তাহার একটু আধ্‌টু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপেগুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশিদের ধন্য-বাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণ বালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল? আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে? সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়!

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জ্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন? বুঝিবে কাহার সাধ্য!

সেই দিনই অপর একটা তুচ্ছসূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্ম্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার সখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়া-ইয়া সেটাকে নির্দ্দয়ভাবে ভাঙ্গিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশীধ্বংসকার্য্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয় মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কহিল "চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙ্‌চ কেন?" চারু রক্ত নেত্রে রক্তিমমুখে "বেশ কর্‌চি, খুব কর্‌চি" বলিয়া আরও বার দুই চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটি তুলিয়া উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিল তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে, তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর

হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশি প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল মতিলাল বাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদের এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলাল বাবু বলিলেন, "ইংরিজি শিখ্‌বে? তা হলে এ সমস্ত ছবির মানে বুঝ্‌তে পারবে।" তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল "শিখ্‌ব।"

মতিবাবু খুব খুসি হইয়া গ্রামের এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার রামরতন বাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি অধ্যাপনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিল না। পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নির্জ্জন নদীতীরে দ্রুত-বেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড় একটা দেখিতে পাইত না।

পূর্ব্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত—কিন্তু তদুপলক্ষ্যে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জেদ্ করিয়া বসিল, আমিও ইংরাজি শিখিব। তাহার পিতামাতা তাহাদের খামখেয়ালী কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহদুর্ব্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাষ্টারের নিকট তারাপদের সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসঙ্গত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন কি, কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়ামুখস্থ করিত ইহা সেই ঈর্ষ্যাপরায়ণ কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে

তাহার লেখা খাতায় কালি ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন কি, বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড় বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্ন মুখে বসিয়া ছিল;—চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুর্ ঘুর্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারম্বার এত কাছে ধরা দিল, যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুস্কিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোন কালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোন উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুক্‌রা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড় বড় করিয়া লিখিল, আমি আর কখন খাতায় কালি মাখাব না। লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেক প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুক্‌রায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ

করিয়াছে সেটা অনন্তকাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এদিকে সঙ্কুচিতচিত্ত সোনামণি দুই একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে! সখী চারু-শশির সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসঙ্কোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, কি সোনা, খবর কি? মাসী কেমন আছে?

সোনামণি কহিত, অনেকদিন যাওনি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার কোমরে ব্যথা বলে দেখ্‌তে আস্‌তে পারে না।

এমন সময় হয়ত হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "অ্যাঁ সোনা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস্, আমি এখনি বাবাকে গিয়ে বলে দেব!"—যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশ-মাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কি অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠ-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালরূপ জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ৎ সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া

সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিত চিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন!" চারু সর্পিণীর মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত—"যাবে বৈ কি! তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাষ্টার মশায়কে বলে দেব না?"

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই একদিন সন্ধ্যার পর বামুন ঠাকরুণের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থবারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মা'র মসলার বাক্সর চাবি তালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল! তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করযোড়ে সানুনয়ে বারম্বার বলিতে লাগিল, তোমার দুটিপায়ে পড়ি আর আমি এমন করব্ না! তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি খেয়ে যাও!" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সঙ্কটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আর কখনও তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন্ তাহার কিরূপ মেজাজ্ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছু দিন যখন উপরি উপরি সে ভালমানুষী করিতে থাকে, তখনি একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের

জন্ত তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কি উপলক্ষ্যে কোন্ দিক্ হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এমনি করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়ত দৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য্য অলক্ষিতভাবে তাহার-হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এদিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতি বাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই তিনটি ভাল ভাল সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্চ কেন? তারাপদ ছেলেটি ত বেশ। আর, তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন

"সেও কি কখনো হয়? তারাপদর কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটি মাত্র মেয়ে আমি ভাল ঘরে দিতে চাই!"

একদিন রায়ডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল—কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙ্গার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখান হইবে না। তাহারা ভাবিল মেয়ের বুঝি কোন একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভাল; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জ্জনীয় বোধ হউক্ শ্বশুরবাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল, যে, বংশ ভাল কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মত তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনো রাগ, কখনো অনুরাগ, কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্য্যার নিভৃতশান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল, এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণ বালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ অব্যাহতভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজকাল এক একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্ব্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙীন্। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্ব্বের মত স্বভাবতঃ পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই নিগূঢ় পরিবর্ত্তন, এই আবদ্ধ আসক্ত ভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিষপত্রের ফর্দ্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোট ছোট নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল, এবং শুষ্ক নদীপথে গরুরগাড়ি চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহপ্রত্যাগত পার্ব্বতীর মত, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল—উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটীরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল,—শুষ্ক নির্জ্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশ বিদেশ হইতে বোঝাই লইয়া ছোট বড় নানা আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল—বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময়ে বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণজলরথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্ব্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে, এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারিদিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময় কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া

দেখিল কোন নৌকা নাগরদোলা, কোন নৌকা যাত্রার দল, কোন নৌকা পণ্য দ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সর্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে, যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সঙ্গীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল—চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল থল থল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদী-তীরবর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল;- সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর একতীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়াগ্রাম আপন কুটীরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধ সামগ্রীপূর্ণ তিন-

খানা বড় নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারী কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদের পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহপ্রেমবন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্ব্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

অপূর্ব্ব কলাবিদ্যা।

আমাদের শাস্ত্রে নৃত্যকে দৃশ্য-সঙ্গীত বলা হইয়া থাকে। যে হিসাবে সঠিক ও প্রোজ্জ্বল বর্ণনাকে চিত্র বলা হয়, সে হিসাবে যে চিত্রে সঙ্গীতের অনুরূপ অনির্দ্দিষ্ট ভাব উদ্রেক করে, তাহাকেও দৃশ্য সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। কিন্তু নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরী পত্রের লেখক যে নূতন কলার আবির্ভাবের সূচনা করিয়াছেন, তাহাকেই বিশেষ রূপে এই নাম দেওয়া যাইতে পারে। * সঙ্গীতে যেমন বিবিধ শব্দ পরম্পরা দ্বারা মনে নানারূপ ভাব উদ্রেক করা হইয়া থাকে, সেই রকম, বিচিত্র বর্ণবিন্যাস দ্বারা অনুরূপ ভাবোদ্রেককারী এক নূতন ললিত কলার এখনো স্থান এবং আবশ্যকতা আছে বলিয়া লেখকের ধারণা।

---

* Nineteenth Century. July.—Color-music By William Schooling.

কল্পনাটি কৌতুকাবহ এবং উহার সম্ভবপরতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আজকাল কলাক্ষেত্রে রংকে বিশেষরূপে চিত্রেরই অঙ্গ-স্বরূপ মনে করা এত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে এই-ক্ষেত্রে তাহার যে স্বতন্ত্র ক্ষমতা আছে তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষেই শালের কাজ, গালিচা পর্দ্দা প্রভৃতির কাজ, মীনের কাজ ইত্যাদি, অনেকগুলি বর্ণ-সৌন্দর্য্যপ্রধান শিল্পকার্য্য আছে; সে সকল শিল্পে ফুলপাতা পাখী প্রভৃতির চিত্রগুলি বিসদৃশ ভ্রমাত্মক; প্রধানতঃ বর্ণসৌন্দর্য্যবিন্যাসেই তাহার কলানৈপুণ্য প্রকাশ পায়। এক্ষণে বিলাতী প্রণালীর অনুকরণে প্রকৃত গঠ-নের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না, মধ্য হইতে বর্ণবিন্যাসের দক্ষতা ও রুচি লোপ পাইতেছে।

সে যাহা হৌক, রঙের যে স্বতন্ত্র আনন্দদায়ক ক্ষমতা আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আকাশের নীল বা ধান্যক্ষেত্রের সবুজের দৃষ্টান্ত লইলে হয়ত ঠিক হইবে না; কারণ, এইরূপ দৃশ্যের বর্ণ ছাড়া ভাবোদ্রেক করিবার অন্য হেতু আছে। বিশুদ্ধ রঙের প্রভাব অনুভব করিতে হইলে, যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যকিরণের বিবিধ রঙের মধ্যে কোন একটিকে স্বতন্ত্র করিয়া, দেখিতে হয়। ইহা না দেখিলে কোন কৃত্রিম রঙের দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতার কোন আদর্শ পাওয়া যায় না। ইহাকে সুমিষ্ট বংশীর একটি মাত্র স্বরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা মনে যে ঠিক কোন ভাব আসে তাহা নহে, তবে মনকে যেন রসসিঞ্চন পূর্ব্বক ভাবের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়।

আমাদের দেশে চিত্রকলার মোটে চর্চ্চা হয় নাই বলিলেও হয়, এবং চিত্র-সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিও বড় স্থূল তাহা স্বীকার

করিতে হয়, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় নির্ভর করিলে চলিবে না। য়ুরোপে যাঁহারা এ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন এবং আধুনিক চিত্র সকল দেখিলেও বুঝা যায় যে চিত্রাঙ্কন এবং বর্ণবিন্যাস ক্রমে পৃথক হইয়া উন্নতি লাভ করিতেছে। দেখা যায় যে, গঠনসৌন্দর্য্য বিকাশই যে চিত্রকরের মুখ্য উদ্দেশ্য বর্ণের প্রতি সে, ইচ্ছা করিয়াই হোক বা বাধ্য হইয়াই হোক, ততটা মনোযোগ দেয় না। যথা মনুষ্যমূর্ত্তির বিশেষ ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিতে হইলে কাপড় বা মুখের রং ঠিক দেওয়া হয় না। অপর পক্ষে দৃশ্যের বর্ণসৌন্দর্য্যই যদি দেখান উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সে দৃশ্যের উপকরণসকলের গঠনকে অনেকটা উপেক্ষা করা হয়—গাছের ডালপালা কোন রকম মোটামুটি খাড়া করিয়া তাহার বিবিধ বর্ণের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়; মনুষ্য মূর্ত্তির নাক চোখ মুখ সবই অস্পষ্ট রাখিয়া তাহার চাদরের ও কাপড়ের রঙই অধিক ফুটান হয়!

চিত্রকলায় এই নূতন ধরণকে সঙ্গীতের প্রচলিত পদ্ধতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্ভবতঃ সুর করিয়া কথা বলা হইতে। যখন মনুষ্যের সুর-সৌন্দর্য্য বোধ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, সুরের স্বতন্ত্র খেলাজনিত সুখভোগ করিবার ইচ্ছা জন্মিতে লাগিল, তখন কথার মর্য্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল, এবং কথা অবনতি প্রাপ্ত হইয়া (তোম তানা) বোলে আসিয়া ঠেকিল। তাহার পর বাদ্যসঙ্গীতের উৎপত্তি। অন্য পক্ষে কথা সুরচ্যুত হইয়া সুগঠিত গদ্য পদ্যে পরিণত হইল।

চিত্রকলার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আশা করা যাইতে পারে

যে ইহাতেও এরূপ পার্থক্যের সূত্রপাত হইয়াছে। ভাস্কর্য্য কলায় যেমন বর্ণ-সংযোগ নিষিদ্ধ সেইরূপ ক্রমে হয়ত চিত্রাঙ্কন রংকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র উন্নতিপথে চলিবে, এবং অপর পক্ষে রং বন্ধনমুক্ত হইয়া এক স্বতন্ত্র আনন্দদায়ক এবং ভাবোদ্দীপক ললিতকলার সৃষ্টি করিবে। †

আপাততঃ মনের উপর রঙের কোন বিশেষ বা সূক্ষ্ম প্রভাব নাই বলিয়া নিরাশ হইবার কারণ নাই। মূলে শব্দেরও মনের উপর অল্পই প্রভাব। খাদের সুরের সহিত গাম্ভীর্য্য, চড়ার সহিত তীব্রতা, কোমল সুরের সহিত দুঃখ প্রভৃতি বড় জোর দুই চারিটি মৌলিক সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সেইরূপ ঘোর রঙের সহিত গাম্ভীর্য্য, উজ্জ্বল রঙের সহিত তীব্রতা, ফিকা রঙের সহিত কোমলতা প্রভৃতি—রঙের সহিতও মনের ভাবের কতকগুলি সম্বন্ধ পাওয়া যায়। সঙ্গীতে এই মূলের উপর যে ভাবের স্তূপ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কেবল অভ্যাস এবং চর্চ্চার ফলে। মনে রাখিতে হইবে যে আদিম মনুষ্য যখন কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার এবং বিবিধ অঙ্গভঙ্গী ও লম্ফ ঝম্পের দ্বারা কোন গতিকে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিত, তখন, তাহারই মধ্যে, গদ্য পদ্য, গীত বাদ্য নৃত্য, সকলেরই বীজ নিহিত ছিল।

থিওরিতে ত দেখা গেল যে এ নূতন কলা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। ইতিপূর্ব্বে কার্য্যতঃ যে এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করা হয় নাই তাহার কারণ রহিয়াছে। সঙ্গীতের গতি উহার একটা প্রধান অঙ্গ।

† মাঝখানে, অবশ্য, এক স্থান চিরকালই থাকিয়া যাইবে যেখানে চিত্রাঙ্কন ও বর্ণবিন্যাস সংযুক্ত থাকিবে। সঙ্গীতে যেমন গান। গানে, যদিও, কথা ও সুর কোনটারই সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা হয় না, তথাপি এরূপ সংযোগে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতীয় আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা কথা অথবা সুরের পৃথক উন্নতির দ্বারা সম্ভব হইত না।

এক সুর মিলাইয়া গিয়া আর এক সুর আনাতে যে ফল পাওয়া যাইতেছে, স্থায়ী সুরে তাহা পাওয়া সম্ভব হইত না। দৃশ্য সঙ্গীতেও সেইরূপ, স্থায়ী রঙের দ্বারা কাজ হইবে না। বর্ণ ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিবার উপায় চাহি। যেমন তেমন রং হইলেও হইবে না। একটা বিবিধ রঙীন কাগজের ফিতা চোখের সামনে দিয়া চালিত হইয়া, নানা বর্ণ দেখাইয়া গেলেও, মনে ভাব উদয় হইবার সুবিধা হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিশুদ্ধ রঙীন আলোক চাহি।

ইতিপূর্ব্বে এরূপ রঙীন আলোক ইচ্ছামত দৃষ্টিপথে আনিবার কোন উপায় হইতে পারিত কি না সন্দেহ। এক্ষণে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে তাহা আর অসম্ভব নহে। সূর্য্য-কিরণ-বিশ্লেষণী যন্ত্রের * উপযুক্ত প্রয়োগের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, রঞ্জিত স্থির বিদ্যুৎ উৎপাদনী তাড়িৎ যন্ত্রের † দ্বারাও হইতে পারে।

লেখক বলেন যে তিনি এই দ্বিতীয় প্রণালীর এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে পিয়ানো বা হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রের ন্যায়, চাবি বিশেষ টিপিয়া ইচ্ছামত রঙীন আলোক চোখের সামনে আনা যায়। এক্ষণে সকল আয়োজনই হইয়াছে। দৃশ্যসঙ্গীত রচনাসক্ষম ওস্তাদের অভ্যুদয় হইলেই এই নূতন ললিত কলা জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

---

* Spectroscope and Polariscope.

† Electric Vacuum tubes.

বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

(পাঞ্চভৌতিক সভা।)

বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তি এবং চরমলক্ষ্য লইয়া ব্যোম এবং ক্ষিতির মধ্যে মহা তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। তদুপলক্ষে ব্যোম কহিল—

যদিও আমাদের কৌতূহলবৃত্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি, তথাপি, আমার বিশ্বাস, আমাদের কৌতূহলটা ঠিক বিজ্ঞানের তল্লাস করিতে বাহির হয় নাই; বরঞ্চ তাহার আকাঙ্ক্ষাটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সে খুঁজিতে যায় পরশপাথর, বাহির হইয়া পড়ে একটা প্রাচীন জীবের জীর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ; সে চায় আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ, পায় দেশালাইয়ের বাক্স। আল্‌কিমিটাই তাহার মনোগত উদ্দেশ্য, কেমিষ্ট্রি তাহার অপ্রার্থিত সিদ্ধি; অ্যাষ্ট্রলজির জন্য সে আকাশ ঘিরিয়া জাল ফেলে কিন্তু হাতে উঠিয়া আসে নর্ম্যান্ লক্‌ইয়ারের অ্যাষ্ট্রনমি। সে নিয়ম খোঁজে না, সে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের নব নব অঙ্গুরী গণনা করিতে চায় না; সে খোঁজে নিয়মের বিচ্ছেদ, সে মনে করে কোন্ সময়ে এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইবে, সেখানে কার্য্যকারণের অনন্ত পুনরুক্তি নাই। সে চায় অভূতপূর্ব্ব নূতনত্ব—কিন্তু বৃদ্ধ বিজ্ঞান নিঃশব্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাহার সমস্ত নূতনকে পুরাতন করিয়া দেয়, তাহার ইন্দ্রধনুকে পরকলা-বিচ্ছুরিত বর্ণমালার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, এবং পৃথিবীর গতিকে পক্বতালফলপতনের সমশ্রেণীয় বলিয়া প্রমাণ করে।

যে নিয়ম আমাদের ধূলিকণার মধ্যে, অনন্ত আকাশ ও অনন্ত

কালের সর্ব্বত্রই সেই এক নিয়ম প্রসারিত ; এই আবিষ্কারটি লইয়া আমরা আজকাল আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু এই আনন্দ এই বিস্ময় মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক নহে ; সে অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্করাজ্যের মধ্যে যখন অনুসন্ধানদূত প্রেরণ করিয়াছিল তখন বড় আশা করিয়াছিল, যে, ঐ জ্যোতির্ম্ময় অন্ধকারময় ধামে ধূলিকণার নিয়ম নাই, সেখানে অত্যাশ্চর্য্য একটা স্বর্গীয় অনিয়মের উৎসব, কিন্তু এখন দেখিতেছে ঐ চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র, ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল, ঐ অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা আমাদের এই ধূলিকণারই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদর। এই নূতন তথ্যটি লইয়া আমরা যে আনন্দ প্রকাশ করি, তাহা আমাদের একটা নূতন কৃত্রিম অভ্যাস, তাহা আমাদের আদিম প্রকৃতিগত নহে !

সমীর কহিল, সে কথা বড় মিথ্যা নহে। পরশপাথর এবং আলাদিনের প্রদীপের প্রতি প্রকৃতিস্থ মানুষমাত্রেরই একটা নিগূঢ় আকর্ষণ আছে। ছেলেবেলায় কথামালার এক গল্প পড়িয়াছিলাম যে, কোন কৃষক মরিবার সময় তাহার অলস পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিল, যে, অমুক ক্ষেত্রে তোমার জন্য আমি গুপ্তধন রাখিয়া গেলাম। সে বেচারা বিস্তর খুঁড়িয়া গুপ্তধন পাইল না কিন্তু প্রচুর খননের গুণে সে জমিতে এত শস্য জন্মিল যে, তাহার আর অভাব রহিল না। বালকপ্রকৃতি বালকমাত্রেরই এ গল্পটি পড়িয়া কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। চাষ করিয়া শস্য ত পৃথিবীসুদ্ধ সকল চাষাই পাইতেছে—কিন্তু গুপ্তধনটা গুপ্ত বলিয়াই পায় না ; তাহা বিশ্বব্যাপী নিয়মের একটা ব্যভিচার, তাহা আকস্মিক, সেইজন্যই তাহা স্বভাবতঃ মানুষের কাছে এত বেশি প্রার্থনীয় ; কথামালা যাহাই বলুন, কৃষকের পুত্র তাহার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় নাই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা

মানুষের পক্ষে কত স্বাভাবিক আমরা প্রতিদিনই তাহার প্রমাণ পাই। যে ডাক্তার নিপুণ চিকিৎসার দ্বারা অনেক রোগীর আরোগ্য করিয়া থাকেন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বলি লোকটার "হাতযশ" আছে; শাস্ত্রসঙ্গত চিকিৎসার নিয়মে ডাক্তার রোগ আরাম করিতেছে একথায় আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি নাই; উহার মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ একটা রহস্য আরোপ করিয়া তবে আমরা সন্তুষ্ট থাকি।

আমি কহিলাম, তাহার কারণ এই যে, নিয়ম অনন্ত কাল ও অনন্ত দেশে প্রসারিত হইলেও তাহা সীমাবদ্ধ, সে আপন চিহ্নিত রেখা হইতে অণু পরিমাণ ইতস্তত করিতে পারে না, সেইজন্যই তাহার নাম নিয়ম এবং সেই জন্যই মানুষের কল্পনাকে সে পীড়া দেয়। শাস্ত্রসঙ্গত চিকিৎসার কাছে আমরা অধিক আশা করিতে পারি না—এমন রোগ আছে যাহা চিকিৎসার অসাধ্য; কিন্তু এপর্য্যন্ত হাতযশ নামক একটা রহস্যময় ব্যাপারের ঠিক সীমা নির্ণয় হয় নাই; এই জন্য সে আমাদের আশাকে কল্পনাকে কোথাও কঠিন বাধা দেয় না। এই জন্যই ডাক্তারি ঔষধের চেয়ে অবধৌতিক ঔষধের আকর্ষণ অধিক। তাহার ফল যে কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যাশা সীমাবদ্ধ নহে। মানুষের যত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, অমোঘ নিয়মের লৌহপ্রাচীরে যতই সে আঘাত প্রাপ্ত হয়, ততই মানুষ নিজের স্বাভাবিক অনন্ত আশাকে সীমাবদ্ধ করিয়া আনে, কৌতূহলবৃত্তির স্বাভাবিক নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা সংযত করিয়া আনে, নিয়মকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং প্রথমে অনিচ্ছাক্রমে পরে অভ্যাসক্রমে তাহার প্রতি একটা রাজভক্তির উদ্রেক করিয়া তোলে।

ব্যোম কহিল—কিন্তু সে ভক্তি যথার্থ অন্তরের ভক্তি নহে, তাহা কাজ আদায়ের ভক্তি। যখন নিতান্ত নিশ্চয় জানা যায় যে, জগৎকার্য্য অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মেবদ্ধ, তখন কাজেই পেটেরদায়ে প্রাণের দায়ে তাহার নিকট ঘাড় হেঁট করিতে হয়;—তখন বিজ্ঞানের বাহিরে অনিশ্চয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সাহস হয় না। তখন মাদুলি তাগা জলপড়া প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইলে ইলেক্ট্রিসিটি, ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্‌, হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি বিজ্ঞানের জাল মার্কা দেখিয়া আপনাকে ভুলাইতে হয়। আমরা নিয়ম অপেক্ষা অনিয়মকে যে ভালবাসি তাহার একটা গোড়ার কারণ আছে। আমাদের নিজের মধ্যে এক জায়গায় আমরা নিয়মের বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি সকল নিয়মের বাহিরে—সে স্বাধীন; অন্ততঃ আমরা সেইরূপ অনুভব করি। আমাদের অন্তরপ্রকৃতিগত সেই স্বাধীনতার সাদৃশ্য বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করিতে স্বভাবতই আমাদের আনন্দ হয়। ইচ্ছার প্রতি ইচ্ছার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল;—ইচ্ছার সহিত যে দান আমরা প্রাপ্ত হই, সে দান আমাদের কাছে অধিকতর প্রিয়; সেবা যতই পাই তাহার সহিত ইচ্ছার যোগ না থাকিলে তাহা আমাদের নিকট রুচিকর বোধ হয় না। সেই জন্য, যখন জানিতাম যে, ইন্দ্র আমাদিগকে বৃষ্টি দিতেছেন, মরুৎ আমাদিগকে বায়ু যোগাইতেছেন, অগ্নি আমাদিগকে দীপ্তিদান করিতেছেন, তখন সেই জ্ঞানের মধ্যে আমাদের একটা আন্তরিক তৃপ্তি ছিল; এখন জানি রৌদ্রবৃষ্টি বায়ুর মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, তাহারা যোগ্য অযোগ্য প্রিয় অপ্রিয় বিচার না করিয়া নির্ব্বিকারে যথানিয়মে কাজ করে; আকাশে জলীয় অণু শীতল বায়ুসংযোগে সংহত হইলেই সাধুর পবিত্র মস্তকে বর্ষিত হইয়া সর্দ্দি উৎপাদন করিবে এবং অসাধুর

কুষ্মাণ্ডমঞ্চে জলসিঞ্চন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না ;—বিজ্ঞান আলোচনা করিতে করিতে ইহা আমাদের ক্রমে একরূপ সহ্য হইয়া আসে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা আমাদের ভালই লাগে না।

আমি কহিলাম—পূর্ব্বে আমরা যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব অনুমান করিয়াছিলাম, এখন সেখানে নিয়মের অন্ধ শাসন দেখিতে পাই, সেই জন্য বিজ্ঞান আলোচনা করিলে জগৎকে নিরানন্দ ইচ্ছাসম্পর্কবিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইচ্ছা এবং আনন্দ যতক্ষণ আমার অন্তরে আছে, ততক্ষণ জগতের অন্তরে তাহাকে অনুভব করিতেই হইবে—পূর্ব্বে তাহাকে যেখানে কল্পনা করিয়াছিলাম সেখানে না হউক্, তাহার অন্তরতর অন্তরতম স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত না জানিলে আমাদের অন্তরতম প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার করা হয়। আমার মধ্যে সমস্ত বিশ্বনিয়মের যে একটি ব্যতিক্রম আছে, জগতে কোথাও তাহার একটা মূল আদর্শ নাই, ইহা আমাদের অন্তরাত্মা স্বীকার করিতে চাহে না। এই জন্য আমাদের ইচ্ছা একটা বিশ্ব-ইচ্ছার, আমাদের প্রেম একটা বিশ্বপ্রেমের নিগূঢ় অপেক্ষা না রাখিয়া বাঁচিতে পারে না।

সমীর কহিল—জড় প্রকৃতির সর্ব্বত্রই নিয়মের প্রাচীর চীন দেশের প্রাচীরের অপেক্ষা দৃঢ় প্রশস্ত ও অভ্রভেদী, হঠাৎ মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র বাহির হইয়াছে, সেইখানে চক্ষু দিয়াই আমরা এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছি, দেখিয়াছি প্রাচীরের পরপারে এক অনন্ত অনিয়ম রহিয়াছে ; এই ছিদ্রপথে তাহার সহিত আমাদের যোগ ;—সেইখান হইতেই সমস্ত সৌন্দর্য্য স্বাধীনতা প্রেম আনন্দ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সেই জন্য এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে কোন বিজ্ঞানের নিয়মে বাঁধিতে পারিল না।

এমন সময়ে স্রোতস্বিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া সমীরকে কহিল, সেদিন দীপ্তির পিয়ানো বাজাইবার স্বরলিপি বইখানা তোমরা এত করিয়া খুঁজিতেছিলে, সেটার কি দশা হইয়াছে জান?

সমীর কহিল, না।

স্রোতস্বিনী কহিল, রাত্রে ইঁদুরে তাহা কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া পিয়ানোর তারের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছে। এরূপ অনাবশ্যক ক্ষতি করিবার ত কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সমীর কহিল—উক্ত ইন্দুরটি বোধ করি ইন্দুরবংশে একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। বিস্তর গবেষণায় সে বাজনার বহির সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারিয়াছে। এখন সমস্ত রাত ধরিয়া পরীক্ষা চালাইতেছে। বিচিত্র ঐক্যতান-পূর্ণ সঙ্গীতের আশ্চর্য্য রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রভাগ দ্বারা বাজনার বহির ক্রমাগত বিশ্লেষণ করিতেছে, পিয়নোর তারের সহিত তাহাকে নানাভাবে একত্র করিয়া দেখিতেছে। এখন বাজনার বই কাটিতে সুরু করিয়াছে, ক্রমে বাজনার তার কাটিবে, কাঠ কাটিবে, বাজনাটাকে শতছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে আপন সূক্ষ্ম নাসিকা ও চঞ্চল কৌতূহল প্রবেশ করাইয়া দিবে—মাঝ হইতে সঙ্গীতও ততই উত্তরোত্তর সুদূরপরাহত হইবে! আমার মনে এই তর্ক উদয় হইতেছে যে, ইন্দুরকুলতিলক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে তার এবং কাগজের উপাদানসম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে কিন্তু উক্ত কাগজের সহিত উক্ত তারের যথার্থ যে সম্বন্ধ তাহা কি শত সহস্র বৎসরেও বাহির হইবে? অবশেষে কি সংশয়পরায়ণ নব্য ইন্দুরদিগের মনে এইরূপ একটা বিতর্ক উপস্থিত হইবে না, যে, কাগজ কেবল কাগজ মাত্র, এবং তার কেবল তার;— কোন জ্ঞানবান জীবকর্ত্তৃক উহা-

দের মধ্যে যে একটা আনন্দজনক উদ্দেশ্যবন্ধন বদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবল প্রাচীন ইন্দুরদিগের যুক্তিহীন সংস্কার ; সেই সংস্কারের কেবল একটা এই শুভফল দেখা যাইতেছে যে তাহারই প্রবর্ত্তনীয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তার এবং কাগজের আপেক্ষিক কঠিনতা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু এক একদিন গহ্বরের গভীরতলে দন্তচালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং অন্তঃকরণকে ক্ষণকালের জন্য মোহাবিষ্ট করিয়া দেয়। সেটা ব্যাপারটা কি? সে একটা রহস্য বটে কিন্তু সে রহস্য নিশ্চয়ই, কাগজ এবং তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমশঃ শতছিদ্র আকারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

নন্দোৎসব।

রাধাকান্তপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া ক্ষুদ্রকায়া চুর্ণীনদী প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে তাহার নির্ম্মল স্বচ্ছ জলরাশি সৈকত ভূমে নিস্তব্ধে লুণ্ঠিত হইতে থাকে, যেন একখানি মুকুর ; উভয় তীরে দূরব্যাপী শ্যামল শস্যক্ষেত্র, নদীকূলে দুই একখানি নৌকা বাঁধা, স্থানে স্থানে বাঁশজালের চারি পাঁচখানি দীর্ঘবাঁশ, কোথায় ধোপার কাপড় কাচিবার পাট। মধ্যাহ্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড তাহার স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া দূরে দূরে ভাসিয়া যায় ; রাত্রে চন্দ্রের তরল শুভ্র হাস্য তাহার বক্ষে আসিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে, আবার যখন একটু বাতাস উঠে, তখন তাহার নিস্তরঙ্গ জলরাশি মৃদুমন্দ কাঁপিতে থাকে, তাহার সেই কম্পন প্রবাসপ্রত্যাগত প্রিয়-

ন্তমের করস্পর্শে প্রেমবিহ্বলা, শিহরিতা নায়িকার হৃৎকম্পের ন্যায় আবেগপূর্ণ।

কিন্তু এই বর্ষাকালে তাহার আর সে ভাব নাই। কোথায় সেই শস্যক্ষেত্র কোথায় সবুজ মখমলের ন্যায় শৈবালরাশি? উন্মত্ত ফেনিল জলরাশি গভীর গর্জ্জনে দক্ষিণদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, উভয় কূল প্লাবিত করিয়া নদীজল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, নদী-তীরবর্ত্তী আমবাগান অর্দ্ধময়, বাবলা গাছের সারি আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের শাখায় লাল পিপীলিকা এবং কালো কালো জলীয় কীট আশ্রয় বাঁধিয়াছে। বালিকা এবং যুবতীগণ পূর্ব্বে যেখানে স্নান করিতে করিতে গল্প করিত, পরস্পরের গায়ে কৌতুকভরে জল ছিটাইয়া দিত এবং সরল মধুর হাস্যধ্বনিতে উন্মুক্ত নদীবক্ষের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিত এখন সেখান দিয়া হোরমিলার কো-ম্পানীর দ্রুতলা ষ্টীমার আরোহীবক্ষে কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। রমণীগণ সেওড়া গাছের গো-ড়ায় একহাঁটু জলে দাঁড়াইয়া সভয়ে স্নান করিয়া লইতেছে এবং কোন চপলা বালিকা কলসীতে ভর দিয়া একটু বেশীজলে নামিবার দুঃসাহস প্রকাশ করিলে তাহার দিদি বা ভাজ তাহাকে শাসাই-তেছে, এবং বাড়ী ফিরিলে তাহার পৃষ্ঠে যে কিলবর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানাইতেছে তাহার শব্দ ভাদ্রমাসের সুপক্ক তালপতন শব্দের অনুরূপ—অত্যন্ত গুরু গম্ভীর। বর্ষীয়সী রমণী ও বৃদ্ধাগণ অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া স্নানশেষে উঠিয়া যাইতেছে; আজ জন্মা-ষ্টমী, যাঁহারা উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহারা অনেক বেলায় নিশ্চিন্ত মনে স্নান করিতেছেন, আজ আর আহারাদির চিন্তা নাই, কেবল ভয় পুরোহিত ঠাকুর জন্মাষ্টমীর ব্রত কথা শুনাইতে আসিয়া পাছে ফিরিয়া যান।

এদিকে পুরোহিত ঠাকুরেরও উপবাস; তিনি সংযম করিয়া আছেন, সমস্ত যজমানবাড়ীতে আজ জন্মাষ্টমীর কথা শুনাইতে হইবে, রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে পর পূজার্চ্চনার শেষে তিনি জলযোগ করিতে পারিবেন। ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মেজাজ আজ বড় চটা, তিনি গায়ে নামাবলী জড়াইয়া অপরাহ্নের পূর্ব্ব হইতেই যজমানবাড়ীতে ব্রতকথা শুনাইয়া বেড়াইতেছেন!

কথা শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, অদূরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ নদীর চঞ্চলবক্ষে কাল মেঘের ছায়া পড়িয়াছে, ঝাউগাছে বাতাস লাগিয়া সন্‌সন্‌ শব্দ হইতেছে, গ্রাম্য পথ জনহীন, পুরোহিত ঠাকুর হস্তলিখিত তালপত্রের দীর্ঘ পুঁথিখানি সযত্নে নামাবলীর মধ্যে ঢাকিয়া লইয়া ঊর্দ্ধতন তিনপুরুষের ব্যবহৃত বহুতালিবিশিষ্ট লোহার দামাট লাগান ভাঙ্গাছাতাটি মুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে যজমানবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

"আঃ আজ কি দুর্য্যোগ, জন্মাষ্টমীর দিন চিরকালই এমনি দুর্য্যোগ হয়—ওগো তোমরা কোথায়?" বলিয়া পুরোহিত গৃহকর্ত্রীকে আহ্বান করিলেন। একখানি চারিচালা ঘরের দ্বারদেশে বসিয়া হরিনামের মালায় করঃসংযোগ পূর্ব্বক গৃহিণী পুরোহিতের অপেক্ষা করিতেছিলেন, বড় বৌ, মেজ বৌ, ছোট বৌ তাঁহার কাছে বসিয়াছিলেন। পাড়ার আর তিনচারটি দরিদ্র বিধবা কথা শুনিবার জন্য সেখানে উপস্থিত; ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত আজ খেলাধুলা ছাড়িয়া কর্ত্তামাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, আজ তাহারা জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা শুনিবে। পুরোহিতের আহ্বানে গৃহকর্ত্রী উত্তর করিলেন, "এসো ঠাকুরপো, তোমার আস্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে আমরা ভাবছিলাম, জলে ভিজেছো দেখচি যে, কাপড় ছাড়বে কি?" "না,

থাক, যজমেনে পুরোতের আর সুখ কোথায় ?" বলিয়া পুরোহিত ঠাকুর বস্ত্রখণ্ডে জড়ানো পুঁথি খুলিতে লাগিলেন। তখন অন্ধকার হইয়াছিল, একটি মেয়ে মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়া গৃহদ্বারের নিকট দীপগাছায় রাখিতে গেল, আর তাহার দশমাসের ছোট ভাইটি দীপশিখা দেখিয়া মাতৃক্রোড় হইতে সেই দিকে হাত বাড়াইল, বালিকা পেদীপটি তাহার মুখের কাছে ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল—

"আলোরে ঝালোরে আঁধার ঘরে বাতি জ্বলে,
যে আমার খেকোকে খোঁড়ে যেন তার মুখখানা পোড়ে।"

খোকা দীপশিখার দিকে একবার স্তিমিত চক্ষে চাহিয়া মাতার কোলে মুখ লুকাইল, মা সস্নেহে পুত্রের মুখ চুম্বন করিলেন।

দীপগাছার উপর প্রদীপ রাখা হইলে পুরোহিত ঠাকুর পুঁথি খুলিয়া চোখে চসমা আঁটিয়া সুর করিয়া জন্মাষ্টমীর কথা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সে অতিপুরাতন কথা, কিন্তু বৃদ্ধারা অতি ভক্তিভরে, সেই মধুর কাহিনী শুনিতে লাগিলেন, বালকবালিকারাও স্থির ভাবে সেই কোমল ঝঙ্কার শুনিতে লাগিল; সে কোন কথা ? সেও এমনি এক বর্ষার রাত্রি, সেই রাত্রে প্রবলঝড় এবং মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, বর্ষার মেঘে সমস্ত আকাশ ঢাকা, ঘোর অন্ধকার, এবং সমস্ত মথুরা সুসুপ্ত; শুধু কংসের কারাগাররক্ষক প্রহরীগণ সশস্ত্র অবস্থায় জাগ্রত আছে। অর্গলবদ্ধ লৌহদ্বার কারাগারে পাষাণভারলুণ্ঠিত বসুদেব অচৈতন্য, পাশে দুঃখকাতরা বিদীর্ণহৃদয়া দৈবকী, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রসববেদনায় তখন দৈবকীর সংজ্ঞা লোপ হইয়াছিল; সহসা আকাশপথে দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইলে, প্রস্ফুট পারিজাতের স্নিগ্ধ সৌরভে নিরানন্দময় কারাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, বসুদেবের বক্ষের দুর্ব্বিসহ পাষাণভার অকস্মাৎ অপসৃত হইয়া গেল; তিনি উঠিয়া সেই কমললোচন

নীলকান্তি পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলকষ্ট ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু পরদিন প্রভাতে নির্দ্দয় কংসহস্তে তাহার পরিণাম কল্পনা করিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন, সমস্ত আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল; বসুদেব সেই সদ্যপ্রসূত কুমারকে অঙ্কে ধারণ করিয়া তাহাকে নন্দালয়ে রাখিতে চলিলেন। লৌহ-অর্গলবদ্ধ রুদ্ধ লৌহদ্বার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে খুলিয়া গেল, দ্বারের প্রহরীরা তাহাদের মুক্ততরবারি শিয়রে রাখিয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বসুদেব সন্তর্পণে দ্বার অতিক্রম করিয়া চলিলেন, অন্ধকারময় সুপ্ত রাজপথে জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই, শুধু ঘটিকাক্লিষ্ট রাত্রির দীর্ঘশ্বাস, বৃক্ষশাখার সঘন আন্দোলন। অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় রাজপথ কর্দ্দমিত, বসুদেব সমস্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া চকিত বিদ্যুতালোকের সহায়তায় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া যমুনার দিকে ছুটিলেন।

সন্ধ্যার স্তিমিত প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া পুরোহিত মেঘমন্দ্র স্বরে সরল সংস্কৃতে এই প্রাচীন কাহিনী পুঁথির পাতা উলটাইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

একটি বহু পুরাতন অথচ চিরনবীন দুঃখে রমণীগণের বক্ষ ভরিয়া উঠিল, যাহারা এই কাহিনীর এক বর্ণও বুঝিল না তাহাদের চক্ষুও ছলছল করিতে লাগিল। কথা শেষ হইলে সকলে অবনত মস্তকে পুরোহিত ঠাকুরকে প্রণাম করিলে, সকলেই সাধ্যানুসারে দুই এক পয়সা দক্ষিণা দিল, যাহারা পয়সা সংগ্রহ করিতে পারে নাই তাহারা সুপারী দিল।

সন্ধ্যা গাঢ় হইতে না হইতে বৌবাজারের বারোয়ারীতলায় ঢাক বাজিয়া উঠিল। বাজনার শব্দ শুনিয়া পাড়ার ছেলেরা বৃষ্টি বাদলা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বারোয়ারীতলায় ছুটিতে লাগিল। তখন গোটাকত কেরোসিনের 'ডিব্বি' জ্বালাইয়া মালীরা প্রতিমা

চিত্রি শেষ করিয়া যশোদাকে ডাকের গহনাতে সজ্জিত করিতে-ছিল; যশোদার দুই পাশে দুই সখী, টানাটানা চোখের উপর ভুরু, এক হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া এবং একহাত ঝুলাইয়া দিয়া সখীদ্বয় ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; যশোদার এক পা ঝুলান, অন্য পা, বাঁকাইয়া উরুর উপর তোলা; কোলে কৃষ্ণের শিশু মূর্ত্তি, নীল যাড়িয়া ঘন করিয়া কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিয়াছে, সেই ঘন নীলের উপর তার্পিনতেলের পোঁচ দেওয়াতে একটা বেশ সুগন্ধ উঠিতেছে এবং কেরোসিনের আলোকে চিক্ চিক্ করিতেছে; যশোদার নতদৃষ্টি শিশুর মুখের উপর স্থাপিত, কিন্তু সেই দীর্ঘ নয়নের বৃহৎ কৃষ্ণতারকার মধ্যে গভীর পুত্রস্নেহের একটা পরি-স্ফুটভাব দেখা যায় না। ওষ্ঠ ও করতল হিঙ্গুলে ডগডগ করিতেছে এবং নাসিকায় দোদুল্যমান এক প্রকাণ্ড নথ যুগান্তরের সেই গোপ-রাজ্ঞীর রুচিনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। সখী দুটি নীলাম্বরী কাপড়ে সজ্জিত হইল। রাত্রি অধিক হইলে আবার সমস্বরে ঢাক বাজিয়া উঠিল, সকলে বুঝিল প্রতিমাকে বেদীর উপর স্থাপন করা হইতেছে।

সন্ধ্যার সময় হইতে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে ভাজাভুজির ধুম লাগিয়া গিয়াছে। গৃহিণীগণ তালেরবড়া কলাবড়া আঁদোশা প্রভৃতি ভাজিবার জন্য উননের কাছে বসিয়াছেন, কড়ার উপর ঘি কলকল করিতেছে, যাহারা ঘৃতের যোগাড় করিতে পারে নাই, তাহারা বড়াগুলি তেলে ভাজিয়া রসে ফেলিতেছে; বাহিরে ভয়ানক দুর্য্যোগ, ঘরেও কলরবের অভাব নাই, কোন মেয়ে তালের রসনিপীড়িত আঁঠি দুই হাতে ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চুষিতেছে; আঁটিটার উপর তাহার ছোট ভাইটির বিশেষ লক্ষ্য ছিল, সুতরাং হঠাৎ হস্তান্তরিত হওয়াতে সে কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া

উঠিল, তাহার পর দিদির দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "রাক্ষশ কোতাকার।" কোন ছেলে রন্ধনাগারে মায়ের কাছে উবু হইয়া পড়িয়া "মা একটা বড়াদেও," বলিয়া ভারি আবদার আরম্ভ করিয়াছে, মা বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন "তোরাই ত খাবি, একটু জুড়োতে দে, এত আদেখ্‌লেপানা করিস কেন?"

কোন ঘরে ছেলে মেয়েরা লুকোচুরী খেলিতেছে, এবং দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে বাক্স প্যাটরা, তোরঙ্গ, তক্তপোষে বাধিয়া ধুপধাপ করিয়া আছাড় খাইতেছে, কেহ আঘাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার উঠিয়া খেলায় মাতিতেছে। কোন বাড়ীতে ছেলেদের মধ্যে 'টোকাটুকী' খেলা আরম্ভ হইয়াছে, একটি মেয়ে একটি ছোট ছেলের চোখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া অদূরে উপবিষ্ট পাঁচ ছয় জন্‌ ছেলে মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিতেছে "আয়রে আমার সোনামণি" একটি ছেলে ধীরে ধীরে আসিয়া বস্ত্রাবৃতচক্ষু বালকের মাথায় টোকা মারিয়া আবার পা টিপিয়া টিপিয়া নিজ স্থানে গিয়া বসিল, সকলে জিজ্ঞাসা করিল "কে?"—আবৃতচক্ষু বালক বলিল "বল্‌বো, চারু"—তাহার কথা ঠিক হইল না বলিয়া তাহাদের মধ্যে একটা ভারি হাসি পড়িয়া গেল। এমন সময় মা ডাকিলেন "ও ননি, কুসুম, যোগীন, তোরা খাবিনে? আয়!"—অমনি খেলা বন্ধ হইল, দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ করিয়া সকলে খাবার ঘরে ছুটিয়া গেল।

মধ্যরাত্রে পূজা শেষ হইল। পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণবাড়ীতে শালগ্রাম শিলা, নারায়ণ প্রভৃতি গৃহবিগ্রহগণ যথেষ্ট পরিমাণে তালেরবড়া, কলাবড়া, লুচি প্রভৃতি উপহার পাইলেন। ব্রাহ্মণীরা অনেক করিয়া বড়া ভাজিয়াছিলেন, পরদিন সকালে পাড়ার ছেলে মেয়েদের ও যজমানবাড়ীতে প্রসাদ বিতরণের

অভিপ্রায়ে তাহা ঢাকিয়া রাখিলেন। পূজা শেষ হইলে বারোয়ারীতলায় এক জীর্ণ শততালিবিশিষ্ট সামিয়ানার নীচে কবি আরম্ভ হইল। বাজনা বাজিয়া উঠিল, কোমরে চাদর বাঁধিয়া, কানে হাত দিয়া, মুখব্যাদানপূর্ব্বক প্রাণপণ শক্তিতে কবির দল 'চিতেন' ধরিলে গ্রামের সকলে বুঝিতে পারিল কবি আরম্ভ হইয়াছে; আর কি স্থির থাকা যায়? যুবকের দল বাঁধিয়া কবি শুনিতে ছুটিল; পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতে আসিলে, তেরিজ ও জমা খরচ কষিতে কষিতে সন্ধ্যাবেলাতেই যে সকল ছেলে শ্লেটের উপর ঢুলিয়া পড়ে এবং কিল,চড়, কানুটিতেও যাহাদের সম্যক চৈতন্য সঞ্চার হয় না—তাহারা আজ কবি শুনিবার জন্য সুস্থ মনে ঘুমাইতে পারে নাই, অন্যের কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিয়া জুতা, পিরাণ ও চাদর খুঁজিতেছে। সেনেদের চণ্ডিমণ্ডপ ও কবির আসর লাগালাগি; পাড়ার মেয়েরা কবি শুনিতে আসিবে বলিয়া সেই চণ্ডিমণ্ডপে চিক টাঙ্গান হইয়াছে। কবির দল সমস্বরে গান আরম্ভ করিবামাত্র চিকের আড়ালে মলের ঝন ঝন শব্দ, পট্টবস্ত্রের খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। দেওয়ালগিরির আলোতে কাহারো গলার দায়মনকাটা চিক,কাহারো কানের আটটা নূতন মাকড়ী চিকের ফাঁক দিয়া এক একবার ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঠিতেছে। তাহার পর গান যত জমিয়া আসিল চিকের মধ্যে হইতে ততই অস্পষ্ট কলধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল, কেহ কবিওয়ালাদের কণ্ঠস্বরের, ঝাঁটার ন্যায় সোজা সোজা গোঁফের এবং গুলিখোরের মত চেহারার সমালোচনা করিতেছে, কেহ অপরের গহনার এবং সেই সঙ্গে উক্ত গহনাপরিহিতা সৌভাগ্যবতীর,—প্রচুর অহঙ্কারের ব্যাখ্যা করিতেছে, কেহ ক্রোড়স্থ ক্রন্দমান শিশুকে কিছুতে শান্ত করিতে না পারিয়া স্তন্যদানে

তাহার মুখবন্ধ করিবার বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত। যে সকল বর্ষীয়সী একপ্রান্তে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কবি শুনিতেছিল এবং দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করিবার জন্য কংসদূত কারাগারে উপস্থিত হইয়া বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দালয় হইতে আনীত বালিকাকে গ্রহণ করিলে দৈবকী যে খেদোক্তি করিতেছেন তাহা শুনিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতেছিল তাহারা যুবতীগণের উক্ত প্রকার কলধ্বনিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "মা সকল, তোমাদের ব্যাগ্‌গোতা করি একটু চুপ কর, গল্প করারই যদি মতলব ছিল তা হ'লে এখানে না এলেই হ'তো ; ঠাকুর দেবতার এমন কথা ফেলে কি গল্প ভাল লাগে। কি জানি বাপু তোমাদের কেমন ধারা রীত!" শুনিয়া গল্পপরায়ণা যুবতীগণ কিয়ৎকালের জন্য নিবৃত্ত হইল।

ভোর হইয়া গেল। তখনো কবি শেষ হয় নাই, কোথা হইতে একখানা ঘোলা মেঘ আসিয়া আকাশের অনেকখানি যায়গা ঢাকিয়া ফেলিল, তাহার পর ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অগত্যা কবির দলের ওস্তাদ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে কংসপ্রেরিত মায়াবিনী পূতনার ক্রোড়ে রাখিয়াই বৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য 'দোয়ার'গণের সহিত আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিলেন।

প্রভাত হইল, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইল না। সমস্ত আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন, ছেলে হইতে বুড়োরা পর্য্যন্ত মানসা করিতে লাগিল আজ যেন দিনের বেলায় বৃষ্টি না হয়, হইলে সকল আমোদ মাটী হইয়া যাইবে। বামনঠাকুরুণেরা সকাল সকাল স্নান করিয়া আসিয়া গতরাত্রের প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করিলেন ; ওদিকে গোপালের দ্বারে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—আজ নন্দোৎসব।

বেলা আটটা বাজিতে না বাজিতে তাঁতিপাড়ার সংকীর্ত্তনের দল টিকি উড়াইয়া, ফোঁটাতিলক কাটিয়া খোল করতাল বাজাইয়া

মুখুয্যেদের গৃহদেবতা গোপালের দ্বারে আসিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—

"শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।"

দেখিতে দেখিতে পাড়ার ছেলেরা মালকোচা মারিয়া, কোমরে গামছা জড়াইয়া সেই দেবালয়প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল; বয়স্ক যুবকগণও এ আনন্দে মাতিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বুড়ো রামুঘোষ "হাতে নড়ি কাঁধে বাঁক" লইয়া নাচিতে লাগিল, তাহার মাথায় গামছাজড়ানো, বাঁকের একদিকে একটা হাঁড়িতে দধি আর একদিকে হরিদ্রাচুর্ণমিশ্রিত গোলায় হাঁড়ী পরিপূর্ণ। সে প্রাঙ্গণমধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া সুঁর করিয়া বলিতে লাগিল—

"ক্ষির ক্ষিরসে ক্ষিরের লাড়ু মর্ত্তমানের কলা
লুটিয়ে লুটিয়ে খায় যত ব্রজের বালা।
ব্রজের গোয়ালা যত গোপালকে পেয়ে
হাতে নড়ি কাঁধে বাঁক নাচে ধেয়ে ধেয়ে।"

হঠাৎ এক দুষ্ট বালক হর্ষোন্মত্ত গোপনন্দনের পিঠে এক ধাক্কা মারিল, পিচ্ছিল মৃত্তিকার উপর গোপনন্দন সটান পড়িয়া গেল, হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দই ও রঙ্গীনজল কর্দ্দমের সঙ্গে মিশিয়া গেল, তখন সেই কাদার উপর পড়িয়া সকলে পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল; যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল, আজ তাহাদেরও অব্যাহতি নাই, যাহাকে ধরিতে পারিল তাহাকেই আনিয়া ইহারা দলভুক্ত করিয়া লইল। কর্দ্দমের উপর এই উৎসবের নাম 'কাদাখেঁড়'।

'কাদাখেঁড়' শেষ হইলে সকলে নদীতে স্নান করিতে গেল। একদল ছেলে নদীর জলে পড়িয়া লম্ফন, সন্তরণ এবং প্রতিঘাত-

যাতে বর্ষার নদী আলোড়িত করিয়া তুলিল। অনেকদূরে নদীর প্রবলস্রোতে পাণিফলের এক একটা জঙ্গল ভাসিয়া যাইতেছিল, যাহারা সন্তরণপটু তাহারা সেই জঙ্গল ধরিবার জন্য সাঁতার পাড়িতে লাগিল, কেহ বাজী রাখিয়া একডুবে দশহাত জলের নীচে হইতে মাটী তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কেহ বা মৎস্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত জেলেদের ডিঙ্গীর গলুই ধরিয়া ভাসিতে লাগিল, জেলেরা বিব্রত হইয়া যতই বলে "ওগো বাবারা ডিঙ্গী ছাড়োনা।' ততই তাহারা নৌকা লইয়া টানাটানি করে। অবশেষে বহুক্ষণ জলে থাকিয়া শীত বোধ হইলে সকলে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। এবং শুষ্ক কাপড় পরিধান পূর্ব্বক এক একরাশি বড়ার শ্রাদ্ধ করিতে বসিল।

আজ দলে দলে ভিখারী বৈষ্ণব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। যে বাড়ীতেই যাক, দুই চারিটা বড়া না পাইয়া তাহারা কোন বাড়ি হইতেই শূন্যহস্তে ফেরে না। দুই চারিজন বৈরাগী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া করতাল হস্তে বাড়ী বাড়ী ফিরিতেছে এবং সদর দরজায় আসিয়া করতালে ঘা দিয়া সুর করিয়া বলিতেছে—

"হরি নাম বিনেরে গোবিন্দ নাম বিনে
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে।
কৃষ্ণ ভজিবারে ভাই সংসারে আইনু
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু।
ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে
কালরূপে বৃক্ষশাখে পক্ষবাস করে।
যেদিন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকী উদরে
মথুরায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
নন্দ রাখিল নাম—"

এমন সময় একটি মেয়ে আসিয়া বাবাজীর ঝুলিতে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া গেল, করতালধ্বনি এবং গান যুগপৎ বন্ধ করিয়া করিয়া বাবাজী অন্যবাড়ী চলিলেন—নন্দ কি নাম রাখিল তাহা আর বলিবার অবসর হইল না, শত নামত দূরের কথা।

দুফুরের সময় বৌবাজারের দল প্রতিমা লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। প্রতিমা বাহির করিবার ধুম সাধারণ নয়; গ্রাম্যজমীদারের বাড়ী হইতে সংগৃহীত থাস, নিশান, ছাতা, আড়ানী, আসা সোটা এবং কতকগুলা বাদ্যভাণ্ড আগে আগে চলিল। বড় বড় ঢাকের বাদ্যে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিতেছে ঢোলগুলি প্রাণপণ শক্তিতে তাহাদের সুরে সুর মিলাইবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁশির কাঁই কাঁই শব্দ, সানাইও নীরব নহে, মধ্যে মধ্যে তাহার বক্ষভেদ করিয়া একটা অতি তীব্রস্বর বাহির হইতেছে।

বাদ্যভাণ্ডের পরই নৌকাখণ্ড। এক গরুর গাড়ীতে একখানা পানসী নৌকা তোলা হইয়াছে, ইহাই নৌকাখণ্ড; নৌকাখণ্ডের উপর একদল "রাইবেঁশে"; স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশভূষা, পরিধানে রঙ্গীন চিত্রবিচিত্র বস্ত্র; গায়ে লালছিটের ফতুয়া; সর্ব্বাঙ্গে গিল্টির গহনা; মাথায় ঝাঁকড়া চুল নিপুণ ভাবে আঁচড়ান, তৈল নিষিক্ত, মাথার উপর সূত্রবদ্ধ পাখীর পালক, কাহারো গলে ঝুঁটো মতির কাহারো গলে সাদা লাল ও সবুজ পুতির মালা। হাতে দীর্ঘ ছড়ি তাহার দুই দিকে পালকের থোপ। নৌকাখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া, ঢুলিরা নাচনের বাজনা বাজাইতেছে, আর রাইবেঁশেরা ঘুরিয়া ফিরিয়া কখন মাথায় হাতদিয়া, কখন ওষ্ঠে তর্জ্জনিস্পর্শ করিয়া সেই বাজনার তালে তালে অদ্ভুত ভাবে নাচিতেছে, আর ছেলের দল চারিদিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া এই বিচিত্র নৃত্য দেখিতেছে।

নৌকাখণ্ডের পর দুখানা ময়ুরপঙ্ক্ষী। বাঁশের বাঁকারি দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই ময়ুর গড়ান হইয়াছে, লম্বা গলায় মাটী লেপিয়া তাহা নীলরঙ্গের কাগজে মুড়িয়া দিয়াছে, শরীরের অন্যান্য অংশও কাগজে জড়ানো, সে কাগজও চিত্রি করা। ময়ুরপঙ্ক্ষা দুখানা গোশকটে উত্তোলিত করা হইয়াছে; তাহার উপর গোয়ালা, ঘরামী রাজমিস্ত্রী ছুতার প্রভৃতি শ্রমজীবীগণ উঠিয়া বসিয়াছে, কাহারো কোলের কাছে জরির তাজ পরা পোষাকভূষিত ছোট ছেলে, কেহ প্রভুপরিত্যক্ত বহুদিনের ব্যবহারে জীর্ণ ও বিবর্ণ চাপকান গায়ে দিয়া বাবরিকাটা চুলের উপর লাল রুমাল জড়াইয়া 'সারি'-দলের 'মূল গেনে' গিরি করিতেছে, আর দুই পাশে নূতন কাপড় ও চাদরে সজ্জিত দোয়ারের দল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দুই পাশের জনস্রোত ভেদ করিয়া গরুর গাড়ী ইষ্টকবদ্ধ রাজপথে হট্ হট্ করিয়া অগ্রসর হইতেছে, 'মূলগেনে' অনুচ্চস্বরে গানের কথা বলিয়া দিতেছে, আর, দোয়ারেরা সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা নাড়িয়া ভঙ্গীপূর্ব্বক দুই হাত ঘুরাইয়া গগণভেদী সমস্বরে সেই গান ধরিতেছে, আর পথের লোকগুলা হাঁ করিয়া তাহা গিলিতেছে, কেহ শুনিয়া পরম কৌতুক বোধ করিতেছে, কেহ হাসিয়া বলিতেছে; "বড়বাজারেদের এবার ভারি জব্দ করেছে, খুব জবোর উতোর গাচ্ছে, রামলাল পরামাণিক ওস্তাদটা কি কম ?"

ময়ূরপঙ্ক্ষীর পশ্চাতে চতুর্দ্দোল; যশোদার প্রতিমাখানি চতুর্দ্দোলে তুলিয়া তাহা লালকাপড়ে সজ্জিত করা হইয়াছে, কাপড়ের উপরে স্থানে স্থানে সোণালী রঙ্গের রাঙ্গতা, প্রত্যেক ফুকরে সাদা, নীল, সবুজ রঙ্গের ছোট ছোট বেল, ব্যবধানে ছোট ছোট ঘণ্টা, ঘণ্টাগুলি পরস্পরে আঘাত লাগিয়া টুং টাং করিয়া বাজিতেছে। বিশজন

বাহকে বাঁশ বাঁধিয়া তক্তরামা ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। পথের ধারে স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকের দল, অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে কৌতুকবিস্ফারিতনেত্রে এই উৎসব নিরীক্ষণ করিতেছিল, যশোদার প্রতিমা তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবামাত্র তাহারা দুই হস্ত তুলিয়া ভক্তিভরে, ঠাকুরকে প্রণাম করিল, বিস্ময়ের সঙ্গে প্রীতি, আনন্দের সঙ্গে ভক্তির একটা কোমল মিলন তাহাদের লজ্জাতরল প্রদীপ্ত চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।

প্রতিমার চতুর্দ্দোলের পর একখানা 'তক্তারামা'—এখানিও চতুর্দ্দোলের ন্যায় লোহিত বস্ত্রমণ্ডিত, সুসজ্জিত। একটি বারো তেরো বৎসর বয়সের সুশ্রী ব্রাহ্মণ বালককে রাধিকা সাজাইয়া তক্তারামায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার দুই পাশে সমবয়স্ক দুইটি বালক সখী বেশে, গম্ভীর মুখে পান চিবাইতে চিবাইতে রাধিকাকে চামর ব্যজন করিতেছে। রাধিকা নতমুখে, স্থির দৃষ্টিতে গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিবার জন্য বারোয়ারীর পাণ্ডাগণের দ্বারা বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সমবয়স্ক সহচরবর্গের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে; চক্ষে চক্ষে মিলন হইলেই তাহার ওষ্ঠে হাসির আবির্ভাব হইতেছে, সে হাসি চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব এবং অদূরবর্ত্তী দলপতির ভ্রূকুটীকুটিল বক্রদৃষ্টি তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিতেছে না।

তক্তারামা চলিয়া গেল। পশ্চাতে একদল লোক বাউল সাজিয়া গেরুয়া রঙ্গের আলখেল্লায় সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া খঞ্জনী ও ডুগি বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইয়া চলিয়াছেঃ—

"এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল,
নদের মাঝে দেখ্‌সে তোরা,

পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব,
হেরবো রসের নব গোরা।"

বাউলের দলের পরেই সংকীর্ত্তনের দল। আড়পাড়ার সংকীর্ত্তনের দল অতি চমৎকার গাইতে পারে; বৌবাজারেরা তাই এবার তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, গায়কের সংখ্যা পনেরো ষোলটি, ছেলেবুড়ো সকলের মাথাতে দীর্ঘ এবং স্থূল টিকির গোচ্ছা—ছুই তিনটি বারো তেরো বছরের ছেলের মাথায় বার হাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচির মত অতি উৎকট টিকি। সকলেরই নাসিকায় তিলক, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মোটামোটা তুলসীর মালা; দাড়ী গোঁফ কামানো, কাহারো কাহারো রঙ্গ আবলুস কাঠের মত কাল, তেলমাখিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং বার্ণিসকরা বলিয়া বোধ হইতেছে। ছুখানা খোল জোরে জোরে বাজাইতেছে, খরবেগে করতাল চলিতেছে, আর গায়কেরা হাত তুলিয়া মাথা নাড়িয়া টিকি ছুলাইয়া গাহিতেছেঃ—

"হরিনাম বিনেরে ভাই কি ধন আছে সংসারে
বল্ মাধাই মধুর স্বরে।
হরি নামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে
মাধাই তাও কি তুমি জান নারে।"

রাজপথে সংকীর্ত্তনের দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, আর পথপ্রান্তস্থ স্ত্রীলোকেরা ভক্তিভরে গড় হইয়া প্রণাম করিতেছে। সংকীর্ত্তনের দলের পশ্চাতে ছেলেবোঝাই পাঁচ ছয় খান গরুর গাড়ী। পাকা কাঁঠালের মত গাদাগাদি করিয়া তাহাদিগকে বোঝাই করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এই কষ্টসাধ্য আমোদে বিলক্ষণ আরাম বোধ করিতেছে, কেহ কাহাকেও কিল মারিতেছে

কেহ কাহাকেও চিমটি কাটিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যেন কাহারও একটা দেখিবার সামগ্রী।

বড়বাজারেরা এবার জন্মাষ্টমী করিতে পারে নাই। বড়বাজারের মধ্যস্থলে আসিয়া বিশেষ ঘটা করিয়া ঢাক বাজিতে লাগিল, একজন ঢাকি ঢাকসমেত আর একজনকে ঘাড়ে তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঢাক বাজাইতে লাগিল। সারি গানের সুর আরো ঊর্দ্ধে উঠিল—এবং রাইবেঁশের দল বড়বাজারের হীনতার প্রতি সমুচিত উপেক্ষা প্রকাশ করিবার জন্য বেশী উৎসাহের সঙ্গে নাচিতে লাগিল। রাগ ও অপমানে বড়বাজারের পাণ্ডাদের মোটা মোটা গোঁফ ফুলিয়া উঠিল এবং বলাবলি করিতে লাগিল—"বেটাদের, ভারি আস্পর্দ্ধা, দেখা যাবে সরস্বতী পূজার সময় কার কতখানি ক্ষ্যামতা।"

সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া অপরাহ্নে উৎসব দল বৌবাজারের আড়ম্বর ফিরিয়া আসিল। উৎসবান্তে সকলে শ্রান্ত হৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরিতে লাগিল ; এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নদীজলে প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়া গেল, কিন্তু ঢাকের শব্দে আর সে উৎসাহ নাই, সেই সমুচ্চ বাদ্যও ধ্বনির মধ্যেও ক্লান্ত হৃদয়ের একটা অবসন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিল এবং সানাই তাহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া সন্ধ্যাধূসর-বনানী-শ্যামল পল্লীর গ্রামের বিজন নদীপথে বিসর্জ্জনের যে করুণ গাথা গাহিতে লাগিল ;—তাহা সমস্ত পল্লী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

উপাসনার প্রকারভেদ।

মানুষ মানুষের সহিত যুঝিয়া আসিতেছে ও মানুষ প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া আসিতেছে। অতি পুরাকাল হইতে এই সংগ্রামের আরম্ভ হইয়াছে, অদ্যাপি এই সংগ্রামের পর্য্যবসান হয় নাই। ভবিষ্যতে কবে এই সংগ্রামের পর্য্যবসান হইবে তাহা বলা যায় না।

এই জীবনব্যাপী মহাসমরের সহিত মনুষ্যজীবনের যত ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে; অন্য কোন ব্যাপারে সহিত ততদূর আছে কি না জানি না। মানুষমাত্রেই ইহা জানে, এবং মানুষের মধ্যে যারা মানুষ তারা ভাল করিয়াই জানে।

তথাপি কি কারণে জানি না মনুষ্য আপনার স্বভাবদোষে অতি প্রকাণ্ড পরিস্ফুট সত্যকে ঢাকা দিয়া গোপনে রাখিবার চেষ্টা করে। বোধ করি সত্য যখন বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মনুষ্যের সম্মুখে দাঁড়ায়, এবং তাহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের অন্য উপায় না দেখা যায়; তখন কোন রূপে কায়ক্লেশে তাহার মুখে একখানা কাল্পনিক পরদা খাটাইয়া অথবা অগত্যা চক্ষু মুদিয়া তাহার অস্তিত্বকে যথা কথঞ্চিৎ আপনার প্রত্যক্ষের বাহিরে রাখিলে কিছু শান্তি ঘটিতে পারে। শুনিতে পাওয়া যায় শশককে তাড়া করিলে যখন তাহার গত্যন্তর থাকে না, তখন ঝোপের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে আপনাকে নিরাপদ মনে করে। মানুষের অবস্থাও অনেক সময়ে সেইরূপ।

প্রকৃতির সহিত যে চিরন্তন মহাসমর চলিতেছে, সেটা বোধ হয় নিতান্ত অস্বীকার করা চলে না; কেন না মানুষ সেই সমরে চিরকাল দলিত, পীড়িত, ও বিক্ষত হইয়া ত্রাহিস্বরে ক্রন্দন করিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিবেশী সমানধর্ম্মা মানুষের সহিতই

যে তাহার তুল্যভাবে ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে; বোধ করি কতকটা লজ্জার খাতিরে সেটাকে স্বীকার করিতে চায় না। স্বীকার করিলে বুঝি আপনাকে মার্জ্জার শ্রেণীতে ও শৃগাল শ্রেণীতে নামাইয়া আনিতে হয়; অন্ততঃ প্রেমের সম্বন্ধে বক্তৃতাটা অহর্নিশ ঘটিয়া উঠে না। এবং কার্য্যে আমরা যাহাই করি, মুখে অন্ততঃ প্রেমের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে না পাইলে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়।

যাহাই হউক, মার্জ্জারস্বভাব ও জম্বুকস্বভাব যে মনুষ্যচরিত্রে অদ্যাপি পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হয়ত এমন লোক দুই একটা খুঁজিয়া মিলিতে পারে, যাঁহাতে মার্জ্জারত্ব বা শৃগালত্ব অপেক্ষা শশত্ব বা মৃগত্বেরই প্রাধান্য অধিক অথবা যাঁহার চরিত্রে পুরাণগ্রথিত কপোতধর্ম্মই কোনরূপে ফুটিয় উঠিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহাতে চতুঃপার্শ্বে ক্ষুধিত শ্বাপদকুলে পরিবৃত থাকিয়া কোন নিরীহ জীবে দীর্ঘ জীবন লাভের অধিক সম্ভাবনা নাই।

কথাটা অতিশয় সত্য, এবং এই সত্য কথাটাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া খ্যাতনামা দার্শনিক হব্‌স্ কিছুদিন পূর্ব্বে সমাজতত্ত্ব শাসনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হবসের মতে প্রত্যেক মনুষ্য প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত যুদ্ধের জন্য অষ্টপ্রহর শস্ত্র প্রহরণ ধরিয়া সজ্জিত রহিয়াছে। রাজোপাধিধারী অপ্রতিহত প্রভাব ও নিষ্করুণ শাসনকর্ত্তা বর্ত্তমান না থাকিলে এতদিন সকলে নখানখি ও দন্তাদন্তি করিয়া উচ্ছন্ন হইত।

ডারুইন সেদিন দেখাইয়াছেন, মানুষে মানুষে এইরূপ জীবন বিসংবাদ চলিতেছে—সত্য বটে, তবে তজ্জন্য মনুষ্যচরিত্রকে সর্ব্বতোভাবে দায়ী করা যায় না। এ বিষয়ে মনুষ্য কতকটা প্রকৃতির হাতে ক্রীড়াপুতুল। জীবনরক্ষার জন্য একটা প্রচণ্ড স্পৃ

মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রকৃতি ঠাকুরাণী নিহিত করিয়াছেন; এবং আহার নামক সম্পূর্ণ প্রেমবর্জ্জিত ও কবিতাবর্জ্জিত ব্যাপারকে সেই জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৎসর বৎসর যতগুলি মনুষ্যশিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহাদের সকলের আহারক্রিয়ার সম্পাদনোপযোগী খাদ্য-সামগ্রী সংস্থানের কোনরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। মানুষে কি করে, জীবনস্পৃহার উত্তেজনায় ব্যাকুল হইয়া সেই মুষ্টিমেয় খাদ্যসামগ্রী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ইহাতে তাহার দোষ কি?

দোষ থাক্ আর নাই থাক্, আমরা তাহার বিচার করিতে উপস্থিত হই নাই। কারণ যাহাই হউক, মনুষ্যসমাজের অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই এইরূপ যে একটা নিষ্ঠুর নিষ্করুণ বিসংবাদ সদাসর্ব্বদা চলিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়। সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল ব্যক্তি জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন হইয়া তাহার ম্রিয়মণ আত্মাটুকু লইয়া সমাজের প্রান্তদেশে লুক্কায়িত থাকিতেছে, কেহ তাহার মুখের পানে চাহিয়া করুণার প্রশান্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করা আবশ্যক বোধ করিতেছে না, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য কথা।

মানুষের উপর প্রকৃতির অত্যাচার অধিক কি মানুষের অত্যাচার অধিক, তাহার আপেক্ষিক পরিমাণের জন্য কোন রূপ তুলাদণ্ড আছে কি না জানি না; কিন্তু মানুষের অত্যাচারে মানুষ যত ব্যথিত হয়, অনেক সময়ে প্রকৃতির প্রবলতম পীড়নেও ততদূর ব্যথা বোধ করি লাগে না। মানুষের সম্মুখে মানুষ যেমন সঙ্কুচিত ও দরিদ্র ও দীনভাব ধারণ করে, মহাবলশালিনী ভয়ঙ্করী প্রকৃতির সম্মুখে, যাহার নিকট মানুষের দম্ভ প্রতাপ ও পরাক্রম লীন হইয়া মনুষ্যমাত্রই সমক্ষেত্রে দাঁড়ায়, সেই প্রকৃতির সম্মুখে ততটা

দীনতা ও অবসাদ প্রকাশ পায় না। মৃত্যু যখন ভ্রাতার স্নেহালিঙ্গন হইতে ভ্রাতাকে ছিন্ন করিয়া লয় অথবা জননীর অঙ্ক শূন্য করিয়া তাহার স্নেহের পুতলি কাড়িয়া লয়, তখন কিয়ৎকালের জন্য বসুন্ধরা মরুভূমে পরিণত হয় যথার্থ বটে ; কিন্তু সেই জননী আবার যখন আপনার সঞ্চিত ক্ষুধা সঞ্চিত রাখিয়া কষ্টার্জ্জিত অন্নের গ্রাস ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখে তুলিয়া দিতে যায়, এমন সময়ে সুখশয্যাশায়ী প্রভুর দারুণ হস্ত সেই অন্নের গ্রাস শিশুমুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে, তখন বিশ্বজগৎ একবারে সঙ্কীর্ণ হইয়া নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত কেন যে হয় না তাহা নিষ্করুণা প্রকৃতিদেবীই বলিতে পারেন।

প্রকৃতির পীড়নে মনুষ্যমাত্রই চিরদিন পীড়িত ; এবং সবলের পীড়নে দুর্ব্বল চিরদিন ধরিয়া ততোধিক নিগৃহীত। আত্মরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে সম্মুখযুদ্ধে উপস্থিত হইয়া শত্রুকে আহ্বান করা হয় বটে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই দুর্ব্বলের এরূপ ক্ষেত্রে যাহা একমাত্র গতি তাহারই অবলম্বন করিয়া থাকে। এবং সেই একমাত্র গতি সবলের উপাসনা। দুর্ব্বল মানুষ বোধ হয় সমাজ সংস্থিতির প্রারম্ভ হইতে সবলা প্রকৃতিকে ও সবল প্রতিবেশীকে নানা উপায়ে উপাসনা দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রসাদ লাভ কথন ঘটিয়াছে কি না জানিনা কিন্তু সবলের উপাসনায় আত্মসম্মানের যে ব্যাঘাত ঘটে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইয়াছে সংশয় নাই। মনুষ্যের উপাসনা এ প্রস্তাবের বিষয়ীভূত নহে। প্রকৃতির উপাসনার প্রকারভেদ বর্ত্তমানে আলোচ্য।

উপাসনা দ্বারা প্রসাদলাভ যে একেবারেই ঘটেনা এমন নহে। বড় লোকের উপাসনায় সময়ে সময়ে কর্ণপীড়ন সম্ভাবনা থাকিলেও মিষ্টান্ন লাভ নিতান্ত বিরল নহে। এমন কি মহাবৃক্ষের তলে

দাঁড়াইতে পারিলে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ার দূর সম্ভাবনা সত্ত্বেও ফলটা ছায়াটা সচরাচরই মিলিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় অব্যবস্থিতচিত্ততা বড় লোকের একটা লক্ষণ বা অহঙ্কার মধ্যে গণ্য হয়; এবং প্রবাদ আছে অব্যবস্থিতচিত্তের প্রসাদও বড় ভয়ঙ্কর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় যাহার বুদ্ধি আছে ও চতুরতা আছে সে আপনাকে সর্ব্ববিধ আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিয়া আপনার বাঞ্ছা পূরণ ও ইষ্ট-সিদ্ধি করিয়া লইতে পারে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রকৃতির নিকট আমরা কোনরূপ প্রসাদ বা অনুগ্রহ লাভ করি না এমন নহে। কেবলমাত্র ভ্রূকুটী ও চপেটাঘাত পাইলে এতদিন মনুষ্যজাতির সংসারে অবস্থান ঘটিয়া উঠিত না। মনুষ্য *যে এখনও ধরাতলে বর্ত্তমান* আছে এবং *ধরাতল পরিত্যাগ* করি-বার স্পৃহাও সকলের নাই, তখন প্রকৃতির মন যোগাইয়া উপাসনা করিতে পারিলে যে কিছুই প্রত্যাশা করা চলিবে না এরূপ বলা সঙ্গত নহে।

কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ততায় প্রকৃতির সহিত অন্য কোন প্রভু তুলনীয় নহে। কখন কিরূপ খেয়াল থাকিবে হিসাব করিয়া গণনা চলেনা। তাই সর্ব্বত্র উপাসনা ব্রত অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প।

সুতরাং প্রকৃতিতে যাহা কিছু প্রবল ও শক্তিমান বলিয়া বোধ কর, তাহারই উপাসনা কর। সূর্য্যের পূজা কর, চন্দ্রের পূজা কর মেঘের পূজা কর, বায়ুর, জলের, আগুনের সকলেরই পূজা কর। বৃক্ষ পর্ব্বত নদী সমুদ্র কেহই যেন ফাঁক না যায়। কাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে, কাহার শক্তি কিরূপ তাহা কে জানে? যাহাকে সম্মুখে দেখ, তাহারই উপাসনা কর। সাপ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, ইট, পাথর, কেহ যেন বাদ না পড়ে। সাবধান ব্যক্তি কড়া

ক্রান্তি হিসাব করিয়া চলেন, কেহ যেন বাদ না পড়ে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় দেবতা প্রতিষ্ঠা কর। শস্যশালিনী পৃথিবী অখিল ভূতের জননী স্বরূপা, তিনি মহাদেবী, তাঁহার পূজা কর। অনন্ত সীমাহীন আকাশ পৃথ্বীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি মহাদেব, পরম পিতা, তাঁহার পূজা কর। দেবতার সংখ্যা কত কে জানে? তিন কি তেত্রিশ কি তেত্রিশ কোটী কে বলিতে পারে? প্রত্যক্ষে না পোষায় কল্পনার আশ্রয় লও। অলিম্পস্ বা কৈলাস, স্বর্গ বা পাতাল, কোথায় কে আছেন কে বলিতে পারে?

জগতের কাণ্ডকারখানা সবই অপূর্ব্ব। কোথায় হইতে কি হয় মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত, মানুষের গণনার অতীত। সূর্য্যদেব কোথা হইতে একচক্র রথে হরিদশ্ব যোজিত করিয়া অরুণ সারথিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া জগতের তিমিররাশি ভেদ করিতে উপস্থিত হয়েন, অগ্রে চারুহাসিনী উষা বনের ফুল ফুটাইয়া, মন্দমারুতে বনস্থলী প্রকম্পিত করিয়া সুপ্ত জীবকুলকে প্রবোধিত করেন। এই বা কি আশ্চর্য্য। নৃত্যপরা উষাসুন্দরী বর্ণ কান্তিতে দিঙ্মণ্ডল আলো করিয়া চঞ্চলচরণে উপস্থিত হইতেছেন; উঠ উঠ সুপ্ত মানব অর্ঘ্যপাত্র হাতে লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কর, তাঁহার চরণতলে শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে, তাঁহার নিশ্বাসসৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইতেছে, তাঁহার অনাবৃত চারুগঠন বক্ষোদেশ হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতেছে। উঠ আর সময় নাই, ঐ দেখ হরিদশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া উষাদেবীর রূপরাগে আকৃষ্ট হইয়া দিবাকর তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। রূপমুগ্ধ ভগবান্ দিবাকর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, সমুদয় আকাশমার্গ অতিক্রম করিয়া জ্যোতিঃপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া চলিলেন। ঐ দেখ পশ্চিমাকাশে যখন সন্ধ্যার রক্তিমরাগে জগৎ নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে,

তখন ভগবান্ দিবাকর ক্লান্ত শরীরে উষার সহিত সঙ্গত হইলেন। দেবীর সহিত দেব মিলিত হইলেন। কিন্তু হায় এ কি হইল। কি নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল, উষা যে দেবদেবের নন্দিনী। দিবাকর জগৎপিতা, উষাদেবী জগন্মাতা কিন্তু উষাদেবী যে দিবাকরের আত্মজা। তবে কি সৃষ্টিক্রিয়া একটি মহাপাপের নামান্তর; তবে কি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মহাপাতক হইতে উৎপন্ন। কে বলিতে পারে? সূর্য্য জগতের স্রষ্টা, তিনি লোকপিতামহ ব্রহ্মা। উষা-দেবী জগতের স্রষ্টা, তিনি সাবিত্রী। ব্রহ্মা জগতের স্রষ্টা, তিনি সাবিত্রীরও জনক। তিনি সাবিত্রীকে অনুসরণ করি-লেন। ইদিপসের বৃত্তান্ত স্মরণ কর। মহানগরী থীবসের ধ্বংস কাহিনী স্মরণ কর। সেই পুরাতন কাহিনীরই অনুবৃত্তি নয় কি? কবিতা উষাদেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন। জগৎ অন্ধকারে ডুবিল, ব্রহ্মাণ্ড লজ্জাভয়ে আঁধারে মুখ লুকাইল। পরে কেবল আঁধার আর আঁধার। কোথা সেই শোভা, কোথা সেই বৈচিত্র্য। কে-বলই আঁধার। পরিণাম বিরস; হরিষে বিষাদ। সবিতা উষা দেবীর অন্বেষণে চলিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সীতাদেবীর অন্বেষণে চলিয়াছিলেন। হেলেনিক বীরগণ সাগরপারে হেলেনা সুন্দরীর অন্বেষণে চলিয়াছিল। সর্ব্বত্র একই চেষ্টা সর্ব্বত্র একই পরি-ণাম। দিবাকর পশ্চিমাকাশে দেবীর সহিত মিলিত হইলেন। ফুলশয্যা নির্ম্মিত হইল। কিন্তু হায় সেই ফুলশয্যাই অন্তিমের মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইবে কে জানিত। উহা সন্ধ্যা নহে, দিবা-করের চিতানল জ্বলিয়া উঠিয়া ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়াছে মাত্র; পরক্ষণেই বিশ্বজগৎ গভীর শ্বাস ফেলিয়া বিষাদের কালিমা ধারণ করিল। মহাবীর হীরাক্লীস বিজয়ান্তে প্রণয়িনীর নিকট আসিলেন। প্রণয়িনী তাঁহাকে অঙ্গরাখা কবচ পরিতে দিলেন।

কে জানে সে কবচ প্রাণহন্তারক হইবে। মহাবীর কবচ পরিধান করিয়া চিতারোহণ করিল। ঈজীয়. সাগরের পশ্চিম কূলে মহাবীরের চিতা জ্বলিল। সমুদ্রের স্থির নিশ্চল জলরাশির উপরে স্থিরনিশ্চল অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই চিতাবহ্নির রক্তরাগ পূর্ব্বকূল পর্য্যন্ত দীপ্ত করিল। বালডারের মৃতদেহ বহন করিয়া সমুদ্র বাহিয়া পশ্চিমমুখে তাঁহার নৌকাখানি চলিতেছে। নৌকার উপরে সজ্জিত চিতানলে বালডারের দেহখানি ধীরে ধীরে পুড়িতেছে। বালটিক সাগরের আঁধার পৃষ্ঠ সেই চিতালোকে দীপ্ত হইতেছে। রাবণের চিতা আজও নিবায় নাই। বালডারের চিতা কি নিবাইয়াছে? দুরন্ত শীতের মধ্যভাগে যখন পৃথিবীর উত্তরভাগ দিবালোকবর্জ্জিত হয়, দিবাকর যখন হীনপ্রভ হইয়া দক্ষিণাকাশে দেখা দেন বা দেখা দেন না; সেই সময়ে, নোর্স জর্ম্মানেরা সেদিন পর্য্যন্ত বালডারের চিতা জ্বালিত। সে দিনও ঠিক্ সেই সময়ে খ্রীষ্টানেরা মহর্ষি জোহনের স্মরণার্থ সেই আগুন জ্বালাইত। অদ্যাপি যখন মার্ত্তণ্ড গ্রীষ্মঋতুর মাঝখানে দক্ষিণায়নগামী হয়েন, তখন সমগ্র ইউরোপের লোকে সেই চিতার অনল জ্বালাইয়া থাকে।

দেব দিবাকর অস্ত গেলেন, আর কি ফিরিবেন না? বালডারের দেহ ভস্মীভূত হইল, আর কি তিনি পুনর্জ্জীবন পাইবেন না। পাগল! দেবতার কি নাশ আছে? অমরের কি মৃত্যু আছে? দেব গিয়াছেন অধোভুবনে, পাতালপুরে; পতিতের উদ্ধারের জন্য, নষ্টের পুনর্জ্জীবনের জন্য। আপোলো দেব পাতালপুরে নামিয়াছেন, আলকেষ্টির উদ্ধারার্থ; উদ্ধারের পর আবার ফিরিবেন। থর অধোভুবন গিয়াছিলেন, ফিরিয়াছেন, ওধিন অধোভুবনে গিয়াছিলেন, ফিরিয়াছেন; স্বয়ং বিধাতৃপুত্র যীশুখৃষ্ট

নরক প্রবেশ করিয়াছিলেন, অনুগতগণকে তুলিয়া আনিবার জন্য। ভয় নাই, আপোলো ফিরিয়াছিলেন বালডারও ফিরিবেন।

মেসায়া আবার আসিবেন। কল্কিদেব আবার আসিয়া বসুন্ধরার পাপভার সংহার করিবেন। বুদ্ধ গিয়াছেন, মৈত্রেয় আবার আসিবেন। যোহন বলিয়াছিলেন, আমি যাইব, তিনি আসিবেন, আমার ক্ষয় হইবে, তাঁহার বৃদ্ধি হইবে, সে কথা কি মনে নাই ? মহাবীর অদূসীয়স্ ত্রয় নগরে পরস্ত্রীহারকের দমনের জন্য গিয়াছেন। সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, মহাসাগর পার হইয়া স্বদেশে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। পেনিলপী, তোমার চিন্তা নাই; তোমার পাণিস্পর্শলোভী দুরাত্মাদিগের, চন্দ্রপ্রয়াসী বামনদিগের যথাকালে দমন হইবে। আর্থর কি মরিয়াছেন ? তিনি পৃথিবীর প্রান্তদেশে আবালন দ্বীপে বাস করিতেছেন; সেখানে মর্ত্ত্যভূমের ঝঞ্ঝাবায়ু বহে না, সেখানে সারা বৎসর মলয় পবন সুরভি বহন করে, সারা বৎসর সেখানে বসন্তের ফুল ফুটে। সময় হইলে আর্থর আবার ফিরিবেন।

দিবাকর চিরতরে অস্ত যান নাই। কাল আবার ফিরিবেন। আবার তাঁহার মস্তকোপরি কনক মুকুট জ্বলিবে, আবার স্ফুরৎ প্রভামণ্ডলে তাঁহার শিরোদেশ শোভিত হইবে। আঁধার ও মেঘ ও কুজ্ঝটিকা তাঁহার উদয়ে বাধা দিবে, কিন্তু তীব্র করজালে তিনি বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া আবার আকাশপথে হরিদশ্বরথে আরোহণ করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় চলিতে থাকিবেন। আকাশপটে কি দেখিতেছ ? সিংহরাশির পর কন্যা রাশি। কন্যারাশিতে দিবাকরের উদয়। মিশরবাসিগণ, প্রবুদ্ধ হও; আনন্দোৎসবে মত্ত হও; ভবিষ্যজ্জগত তোমাদের মুখপানে আশা ধরিয়া চাহিয়া আছে। কন্যাগর্ভে দেবের উৎপত্তি। সিংহপৃষ্ঠে

কন্যাকুমারী। তাঁহার গর্ভে দেবসেনাপতির উদ্ভব। কৃত্তিকা তাঁহাকে স্তন্যদুগ্ধে লালন করিবেন। সেনাপতি তারকাসুর বধ করিবেন দেবগণকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কন্যাগর্ভে ঈশ্বরপুত্রের জন্ম হইয়াছে। বেথলহীমে তারকার উদয় হইয়াছে। সপ্তর্ষি অর্ঘ্য হস্তে পূজা করিতে যাইতেছেন। মায়াদেবীর অঙ্কে শিশু শাক্য শোভা পাইতেছেন। শিশু শাক্য বুদ্ধ হইবেন, জগৎকে প্রবোধিত করিবেন। মারবধূ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না। দেবকীগর্ভে ভগবানের জন্ম হইয়াছে। দেবগণ তাঁহার অর্চ্চনাপর, দৈত্যগণ তাঁহার অসূয়াপর। যশোদা তাঁহার মুখগহ্বরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখিলেন। গোপী তাঁহার ভজনা করে, গোপীর অভিলাষ তিনি পূর্ণ করেন। কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার ও নির্ম্মল। ধর্ম্মরাজ্য তাঁহাকে সংস্থাপন করিতে হইবে। ভূভার তাঁহাকে হরণ করিতে হইবে।

মানবজাতি, উত্থান কর; দিবাকর উদিত হইয়াছেন; তিনি জগতের চক্ষুস্বরূপ, তিনি বুদ্ধির প্রেরণা করেন। তাঁহার উপাসনায় অগ্রসর হও। অদ্য ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী, সুখের শরতের আরম্ভ, গোকুলবাসী নন্দোৎসবে প্রবৃত্ত। অদ্য শরতে মহাষ্টমী; বর্ষাপগমে জগৎ নির্ম্মলমুখশ্রী ধরিয়া হাসিতেছে; মহাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছে, প্রবুদ্ধশক্তির আরাধনা কর। অদ্য কোজাগরী পূর্ণিমা। মহালক্ষ্মীর শ্রীচরণক্ষেপে জগৎ-শতদল বিকশিত হইয়াছে, এমন রাতে কি ঘুমায়? অদ্য শারদোৎফুল্লমল্লিকা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী, বসুন্ধরা চন্দ্রিকাবিধৌত শুভ্রবসন পরিধান করিয়া যৌবনরাগ বিকাশ করিয়া প্রিয়তমের প্রতি অভিসারে চলিয়াছে, ও প্রিয়সঙ্গমে রাসরসে খল খল হাসিতেছে, ও তরলতরঙ্গে নাচিতেছে। অদ্য উত্তরায়ন সংক্রান্তি, হিমঋতু অবসানোন্মুখ, দেবগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। নববর্ষের

আগমন হইবে, মানবের উদ্ধারার্থ ঈশ্বর তাঁহার পুত্রকে পাঠাইবেন! অর্দ্ধ পৃথিবী আনন্দে উৎফুল্ল; ঘরে ঘরে আলো জ্বাল, প্রিয়প্রসঙ্গে সুরাপাত্রে মদিরা ঢাল। আজ বাসন্তী পঞ্চমী, মলয় বহিয়াছে, কুহুস্বর শোনা গিয়াছে, বাগ্বাদিনী বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছেন, অর্দ্ধ ভূমণ্ডল সেই সঙ্গীতে মুগ্ধ হইতেছে। আজ আবার বাসন্তী পূর্ণিমা, মদনের উৎসব দিন। জগন্নিয়ন্তা এই উৎসবে যোগ দিয়াছেন। বহ্নু্যৎসবের দিন, আকাশে খধূপ উৎক্ষেপ কর। ফাগ কই, রঙ কই, নরনারী যে হোলিরঙ্গে মাতিয়াছে।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, আলোর পর আঁধার, আঁধারের পর আলো। জন্ম হয় মৃত্যুর জন্য, কিন্তু মৃত্যু হয় আবার জন্মের জন্য। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ান্তে সৃষ্টি। মনুষ্য চিন্তা করিও না। প্রকৃতির এই বিধান, প্রকৃতির উপাসনা কর। প্রকৃতি তোমাদের জননী, প্রকৃতির স্তন্যধারায় তোমরা বাঁচিতেছ, প্রকৃতির শোণিতে তোমাদের উৎপত্তি ও তোমাদের পুষ্টি। প্রকৃতি জননী তোমাদের জন্য আত্মোৎসর্গপরায়ণ। বিশ্বব্যাপার এক মহাযজ্ঞ। দক্ষকন্যা প্রজাপতি ইহার হোতা বিশ্বেদেবা ঋত্বিক্, এই যজ্ঞে প্রজাপতি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আবার দেবতার হিতের জন্য, জগতের হিতের জন্য, পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। আত্মোৎসর্গ বিনা যজ্ঞ হয় না, আত্মবলিদান বিনা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। বলিদান ধ্বংসের জন্য নহে, বলিদান নবীকরণের জন্য, বলিদান পবিত্রতাসাধনের জন্য। যজ্ঞের বধ বধ নহে। প্রজাপতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যজ্ঞে আপনাকে বলি দিয়াছিলেন। মানবের পাপপ্রক্ষালনের জন্য বলির প্রয়োজন, বিধাতা নিজ পুত্রকে বলিস্বরূপে ধরায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার রক্তে মানববংশ পবিত্র হইয়াছে, তাহার পাপরাশি ধুইয়া গিয়াছে।

সুতরাং বলিদানের আবশ্যকতা সুতরাং আত্মোৎসর্গের প্রয়োজনীয়তা। শুনঃশেফের কাহিনী মনে আছে? আইফিজিনিয়ার পুরাণ কথা মনে আছে? জেফথার দুহিতার কথা কি মনে নাই? প্রকৃতি বলি উপহার চাহেন, তোমার যাহা কিছু প্রিয়তম, প্রকৃতির খর্পরে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃতির প্রসাদন কর!

প্রকৃতির উপাসনায় বলিদানের প্রয়োজনীয়তা, কিন্তু উপাসনার অন্যবিধ প্রকারভেদ ও প্রণালীভেদ আছে।

মরণের রহস্য মনুষ্যের চিন্তা সকলের আগে অধিকার করে। মানুষ মরিয়া যায় কেন? মরিয়া আবার কোথা যায়? জীয়ন্তে কি সেখানে যাওয়া যায় না? সেখানে যাইবার কি কোন উপায় নাই? সে পুরী কোথায়? বৈতরণীর অপরপারে, বালটিক্ সাগরের অপর পারে। জাহ্নবীনীরে প্রিয়তমের ভস্মরাশি ভাসাইয়া দাও; দেহখানি ভেলায় চাপাইয়া আগুন ধরাইয়া বালটিকের জলে ভাসাইয়া দাও। হয়ত সেই পুরীতে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু মৃত্যুই কি মানুষের পরিণাম? কে বলিল? সর্ব্বত্রই ত যাহা যায় তাহা ফিরিয়া আসে। কিছু দিন মৃতবান্ধবের জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিতে হয়। আর কি সমাগম, আর কি তাহার মিলন ঘটে না?

শোভাময় শরৎ ঋতু বনস্থলীকে হাসাইতে থাকে। কোথা হইতে দারুণ শীত আসিয়া সুন্দরীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পৃথিবীমাতা কান্দিতে থাকে। পৃথিবী মাতা তাহার নন্দিনীর শোকে বিষাদের কুজ্ঝটিকায় মুখ ঢাকিয়া, সর্ব্বত্র তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। সুন্দরী পার্সিফনী সহচরীপরিবৃতা হইয়া বনে বনে ফুল তুলিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ ধরাতল বিদীর্ণ হইল। ভূগর্ভ হইতে কাহার হস্ত উঠিয়া কুমারীকে লইয়া গেল। সখীগণ হাহাকার করিয়া

উঠিল। পৃথিবীমাতা হাহাকার করিতে লাগিলেন। সাক্ষী ছিলেন চন্দ্রমা, তাঁহার অন্ধতমসাবৃত গুহার ভিতর হইতে; সাক্ষী ছিলেন সূর্য্য, তাঁহার সুদূর নির্জ্জন শিবিরাবাসে। জননী পৃথিবী কন্যা-শোকে জলে স্থলে কাননে আলো হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে সন্ধান দিলেন। অধোভুবনে দেবরাজ তাঁহার কন্যাকে লইয়া গিয়াছেন। জননী দীমীতীর ক্রোধ করিলেন। শোকে ও ক্রোধে ম্রিয়মাণা হইলেন। সংসার হইতে লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করিলেন, গাছে আর ফুল হয় না, ভূমি আর শস্য দেয় না, জীবকুল নিরানন্দ হইল। দেবরাজ ভীত হইলেন। মাতার হস্তে কন্যাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। একটা বন্দোবস্ত হইল। সেই অবধি বৎসরের মধ্যে আটমাস কন্যা মায়ের নিকট থাকে, চারি মাস অধোভুবনে স্বামী দেবরাজের নিকট বাস করে। চারিমাস পৃথিবী শ্রীহারা হইয়া কাঁদে আট মাস পৃথিবী শ্রীযুতা হইয়া হাসে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া দীমীতীর কন্যা পাইয়াছিলেন। এমনি করিয়া দেবী আইসিস্ তাঁহার স্বামী অসাইরিস্‌কে পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। সহজে কি স্বামী পাইয়াছিলেন? আইসিস্‌কেও তাঁহার স্বামীর অনুসন্ধানে কিছু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। সাবিত্রী সতীও এইরূপে তাঁহার সত্যবানকে যমের হাত হইতে ফিরাইয়া আনেন; সেও কি সহজে? তিনি ভর্ত্তৃ বিনা সুখ প্রার্থনা করেন নাই, ভর্ত্তৃবিনা তিনি জীবিতাভিলাষ ছাড়িয়াছিলেন।

প্রকৃতি দেবী রোদন করেন। প্রকৃতির রোদনে আমাদিগকে যোগ দিতে হয়। নহিলে কি উপাসনা হয়? নহিলে প্রকৃতি মাতা রাগ করিবেন। পৃথিবী মাতা মশাল হাতে আঁধারে আঁধারে বেড়াইয়াছিলেন। আমাদিগকেও তেমনি মশাল হাতে আঁধারে হারানিধির সন্ধানে বেড়াইতে হইবে। কৃষ্ণ ব্রজধাম ছাড়িয়া মথুরা

গিয়াছিলেন। গোপাঙ্গনাগণ আত্মহারা হইয়া রথের পশ্চাৎ ছুটি-য়াছিল; রথের চাকা ধরিয়া টানিয়াছিল। বালডার মৃত্যুর পর হেলহাইমে অবস্থান করিতেছেন। সহজে কি তিনি সেখান হইতে ফিরিবেন? 'যে যেথানে আছ রোদন কর; বনের পশু, গাছের পাখী, তরুলতা, যে যেথানে আছ রোদন কর। মাটি ফাটিয়া শোকাশ্রুর উৎস উঠিতেছে; বালডরের জন্য নির্জীব শিলাদণ্ড দ্রবীভূত হইতেছে।

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়ব্যক্তির সন্ধান করিতে হইবে। যাহা-দিগকে ভাল বাসিতাম তাহারা কোথায় আছে কে জানে? কোন আঁধার পুরে তাহারা বসতি করিতেছে; আঁধারে কি তাহারা পথ চিনিতে পারিবে? হাতে হাতে মশাল ধর। ঘরে ঘরে আলো জ্বালো। আজ ঘোর অমানিশা, প্রিয়গণ গন্তব্য পথ চিনিতে পারিবে না; দীপমালায় অন্ধকার বিনষ্ট কর। গঙ্গাস্রোতে দীপগুলি ছাড়িয়া দাও। স্রোতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাক্। প্রেতপুরুষগণ তাহা ধরিয়া লইবেন।

শুধু শোক করিলে যে যায় সে কি ফিরিয়া আসে? মৃত্যুর উপরে যে রহস্যের আবরণ আছে তাহা উন্মোচন করিতে হইবে। সে যে বড় দুর্ভেদ্য রহস্য। মানুষের সামান্য জ্ঞানে সে তত্ত্ব নির্ণীত হইবে না। বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিতে হইবে। তবে মরণ-তত্ত্ব ও জন্মতত্ত্ব জানিবে। যদি মরণতত্ত্ব জানিতে চাও নিজে অমৃত পান কর। সোমলতা হইতে সুধা নিষ্কাসন কর; দ্রাক্ষালতা হইতে অমৃতরস বাহির কর। গৌড়াপৈষ্টিও অভাবে চলিবে। অমৃত-পানে অমরত্ব লাভ করিবে বুদ্ধি প্রদীপ্ত হইবে, মোহাবরণ অপসৃত হইবে, রহস্যের উদ্ভেদ হইবে। ইহার নাম গুপ্তবিদ্যা। গুপ্ত-বিদ্যা লাভে যথাবিধি দীক্ষা চাই। যে সে ইহাতে অধিকারী নহে।

দীক্ষিতের মধ্যে জাতিভেদ নাই, ধর্ম্মবিচার নাই, অপক্ষপাত সাম্য প্রতিষ্ঠিত। সাবধান অনধিকারী যেন এখানে প্রবেশ লাভ না করে। পশু যেন মনুষ্যের প্রয়াসী না হয়। যে অধিকারী সে মহামন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিতেছে সে সাধু, সে সিদ্ধ, পশুবিদ্যা তাহারই, ব্রহ্ম-বিদ্যা তাহারই। সোমরস ব্রহ্মবিদ্যার পার্থিব মূর্ত্তি, সোমযাগ ব্রহ্মবিদ্যা সাধনের একমাত্র অনুষ্ঠান।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, ঢাকঢোল নিনাদিত করিয়া, নৃত্যগীত উৎসব, হাসি কান্নার দ্বারা প্রকৃতির উপাসনা চলিতে পারে। ধূপধূনা জ্বালাও, নররক্তে, পশুরক্তে, মহীতল সিক্ত কর; তাহাতে প্রকৃতিদেবীর তৃপ্তি হইতে পারে। গুপ্তবিদ্যা সাধন কর, অন্তঃ-করণ প্রবোধিত, দীপিত কর, তাহাতে প্রকৃতির রহস্যভেদে অধিকার জন্মিতে পারে। কিন্তু তাহাতেই কি দেবীর পূর্ণ তৃপ্তি ঘটিবে? প্রাচীন কিনিশিয়ায় প্রকৃতিপূজা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল দেখ। স্বয়ং এল দেব জগতের হিতের জন্য আপন পুত্রের কণ্ঠ-শোণিতে মহীতল সিক্ত করিয়াছিলেন। ফিনিকেরা তাহা জানিত, ফিনিকদের স্মৃতিমধ্যে তাহা জাগরূক ছিল। যখনই কোন দৈবী অথবা মানুষী আপদ আপতিত হইয়া স্বদেশের আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইত, তখনই পিতা আপন পুত্র আনিয়া দিত, মাতা আপন কন্যা আনিয়া দিত। নরকণ্ঠনিঃসৃত তপ্তলোহে প্রকৃতি-দেবীর তৃপ্তিসাধনের উপায় বিধান হইত। কিন্তু তাহাতে বুঝি মহাদেবীর তৃপ্তিলাভ ঘটিত না। তিনি অন্যবিধ বলি উপহার চাহিতেন। সে উপহার ভয়াবহ। ধন্য মনুষ্যের কল্পনা, ধন্য মনুষ্যের সাধনা।

গুপ্তবিদ্যায় যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপন সাধনা মন্দিরের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া অনধিকারীর চক্ষু হইতে

গুপ্ত রাখেন। সেই দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার দরকার নাই। গুপ্ত সাধনা গুপ্ত থাকুক। ফিনিকেরা এষ্টার্টির মন্দিরে যাহা অনুষ্ঠান করিত, সাইপ্রস্ দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী সাগরফেণোদ্ভবা আফ্রুজিৎ দেবীর উপাসনা ব্যাপারে যাহা অনুষ্ঠিত হইত, পার্সিফণীর বিরহ-বিধুরা জীমীতারের শোকবার্ত্তার স্মরণার্থ সমগ্র আথেন্স ইলিউসিসে সমবেত হইয়া অষ্টাহ ব্যাপিয়া যে অভিনয় সম্পাদন করিত, তাহা মানবের ইতিহাসে অতীত ঘটনা নহে। এখনও সেই প্রকৃতি-পূজার পদ্ধতি মনুষ্য পরিত্যাগ করিতে সাহস করে নাই। সমাজের অন্তস্তলে, কি জানি কি রূপে মনুষ্যের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া, এখনও সেই অন্তঃস্রোতস্বিনী ফল্গুধারার ন্যায়, যে এক স্রোত প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কবে তাহার গতিরুদ্ধ হইবে জানি না। তবে শুষ্ক বালুকা উৎখাত করিয়া সেই প্রবাহের আবিষ্কারের কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতিপূজার মন্দির-দ্বার অর্গলবদ্ধ রহুক।

ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক।

ভোজনের মাত্রা পরিপাকশক্তির সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহাতে লাভ নাই বরঞ্চ ক্ষতি, একথা অত্যন্ত পুরাতন। এমন কি, স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে একেবারে ষোলো আনা ক্ষুধা মিটাইয়া আহার করাও ভাল নহে, দুই এক আনা হাতে রাখাও কর্ত্তব্য। মানসিক ভোজন সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে একথাও নূতন নহে।

আমাদের এই দরিদ্র দেশের ছেলেদের আহারের পরিমাণ

যেমনই হোক, ইংরাজি শিক্ষার দায়ে পড়িয়া পড়াশুনাটা যে নিরতিশয় গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ডাক্তর ডেলি সাহেব কিছুকাল বাঙ্গালী ছাত্রদের শিক্ষকতা করিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌পত্রে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে, এই বলপূর্ব্বক শিক্ষা গলাধঃকরণের হাস্যজনক অথচ সুগভীর শোচনীয় ফল প্রমাণিত হইতেছে। অনেক বাঙ্গালী ডেলি সাহেবের উক্তপত্র হইতে শিক্ষাগ্রহণের চেষ্টা না করিয়া অযথা রোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অভিমান, দুর্ব্বলহৃদয় বাঙ্গালীচরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ। হিতৈষীদের নিকট হইতেও তিলমাত্র আঘাত আমরা সহ্য করিতে পারি না।

অন্ততঃ এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাঙ্গলায় অধীত হয় তবে শিশুপীড়ন অনেকটা দূর হইতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ছাত্রবৃত্তি দিয়া যাহারা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় তাহারা ভাল ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রথমতঃ, তাঁহাদের কথার সত্যতাসম্বন্ধে উপযুক্তরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত যেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল না হইবারই কথা। ১১।১২ বৎসর বয়সের মধ্যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগকে যে পরিমাণে বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, এমন বোধ হয় আর কোথাও নাই। নিম্নে আমরা দেশীয় ভাষা ভিত্তিমূলক এণ্ট্রেন্স স্কুলের সহিত সেণ্ট্‌ জেভিয়ার কলেজাধীন এণ্ট্রেন্স স্কুলের শ্রেণীপর্য্যায় অনুসারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা পাশাপাশি বিন্যাস করিলাম। প্রথমোক্ত স্কুলে এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত নয়শ্রেণী, দ্বিতীয় স্কুলে ইন্‌ফ্যাণ্টক্লাস বাদদিলে আট শ্রেণী। অতএব সেণ্টজেভিয়রের ইন্‌ফ্যাণ্টক্লাসকে আমরা প্রথমোক্তস্কুলের নবমশ্রেণীর সহিত তুলনা করিলাম। যদি ষোলবৎসর বয়সকে

এণ্ট্রেন্স দিবার উপযুক্ত বয়স বলিয়া ধরা যায় তবে সাত বৎসর বয়সের সময় স্কুলের পাঠ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

বাঙ্গলা স্কুল।

নবম শ্রেণী।

(৭ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। প্যারি সরকারের ফার্ষ্ট বুক।
২। Modern spelling book ; Word lessons.
বাঙ্গলা। ৩। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কৃত বর্ণপরিচয়।
৪। শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ।
৫। শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ।
গণিত। ৬। পাটিগণিত।
৭। ধারাপাত।
ভুগোল। ৮। মৌখিক।

সেণ্ট্ জেভিয়র স্কুল।

ইন্ফ্যাণ্ট্ ক্লাস।

(৭ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's Infant Reader.
২। Longman's Second Primer.
গণিত। ৩। এক শত পর্য্যন্ত গণনা। যোগ বিয়োগ এবং গুণ।

৮ম শ্রেণী।

(৮ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। প্যারি সরকারের সেকেণ্ড্ বুক।

২। Modern spelling book.

৩। গঙ্গাধর বাবুর Grammar and Composition.

বাঙ্গলা। ৪। চন্দ্রনাথ বাবুর নূতন পাঠ।

৫। চিরঞ্জীব শর্ম্মার বাল্যসখা।

৬। তারিণীবাবুর বাঙ্গলা ব্যাকরণ।

গণিত। ৭। পাটিগণিত।

৮। শুভঙ্করী। .

৯। মানসাঙ্ক।

ইতিহাস।১০। রাজকৃষ্ণবাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস।

ভূগোল। ১১। শশীবাবুর ভূগোল পরিচয়।

বিজ্ঞান। ১২। কানিংহ্যামের স্বাস্থ্যের উপায়।

ফার্ষ্ট্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড্।

(৮ বৎসর বয়স)

ইংরাজী। ১। Longman's new Reader. No. 1

২। Arithmetical Primer. No. 1

৭ম শ্রেণী।

(৯ বৎসর বয়স)

ইংরাজী। ১। Royal Reader No. 2

২। Child's Grammar and Composition.

বাঙ্গলা। ৩। সাহিত্যপ্রসঙ্গ।

৪। পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ;

৫। বাঙ্গলা ব্যাকরণ।

গণিত। ৬। পাটিগণিত।

৭। শুভঙ্করী।

৮। মানসাঙ্ক।

৯। সরল পরিমিতি।

১০। ব্রহ্মমোহনের জ্যামিতি।

ইতিহাস। ১১। বাঙ্গলার ইতিহাস।

১২। ভূগোল-পরিচয়।

১৩। বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বিজ্ঞান। ১৪। কৃষি সোপান।

১৫। স্বাস্থ্যের উপায়।

১৬। ভারতচন্দ্রকৃত স্বাস্থ্যশিক্ষা।

সেকেণ্ড্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড্।

(৯ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's new reader No. 2.

২। Arithmetical Primer No. 1.

ইতিহাস। ৩। বাইবেল ইতিহাস।

৬ষ্ঠ শ্রেণী।

(১০ বৎসর বয়স)

ইংরাজী। ১। Royal Readers No. 3.

২। Macleod's Grammar.

৩। Stapley's Exercises.

বাঙ্গলা। ৪। সীতা।

৫। কবিগাথা।

৬। সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ।

গণিত। ৭। পাটিগণিত।
৮। শুভঙ্করী।
৯। সরল পরিমিতি।
১০। জ্যামিতি।
ইতিহাস। ১১। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
ভূগোল। ১২। শশীবাবুর ভূগোল প্রকাশ।
১৩। যোগেশবাবুর প্রাকৃতিক ভূগোল।
বিজ্ঞান। ১৪। সরল পদার্থ বিজ্ঞান।
১৫। কানিংহামের স্বাস্থ্যের উপায়।
১৬। রাধিকাবাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা।

থার্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড।

(১০ বৎসর বয়স)

ইংরাজী। ১। Longman's new Readers No. 3.
২। Arithmetical primer No. 2.
ইতিহাস। ৩। বাইবেল্ ইতিহাস।
৪। Stories from English History No. 1.
ভূগোল। ৫। Geographical primer No. 2.

পঞ্চম শ্রেণী।

(১১ বৎসর বয়স)

ইংরাজী ১। Lethbridge's Easy selection.
২। Macleod's Child's Grammar.
৩। Stapley's Exercises.
বাঙ্গলা। ৪। প্রবন্ধকুসুম।

৫। সদ্ভাবশতক।

৬। সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ।

৭। রচনা সোপান।

গণিত। ৮। পাটিগণিত।

৯। শুভঙ্করী।

১০। জ্যামিতি।

১১। পরিমিতি।

ইতিহাস। ১২। ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১৩। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ভূগোল। ১৪। ভূগোল প্রকাশ।

১৫। ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ।

১৬। প্রাকৃতিক ভূগোল।

বিজ্ঞান। ১৭। সরল প্রাকৃতদর্শন।

১৮। স্বাস্থ্যরক্ষা।

১৯। স্বাস্থ্যের উপায়।

ফোর্থ ষ্ট্যাণ্ডার্ড।

(১১ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's new readers No. 4.

লাটিন। ২। Dictionary for conjugation.

৩। Arithmetic for beginners.

ইতিহাস। ৪। বাইব্‌ল্‌ ইতিহাস।

৫। Stories from English History No. 2.

ভূগোল। ৬। First Geography.

এইখানেই বাঙ্গলা পড়া শেষ হইল, অতএব আর উর্দ্ধে যাই-

ধার আবশ্যক নাই। ইংরাজি স্কুলে ইংরাজিই মাতৃভাষা, সেখানে অন্যভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই সেই জন্য তুলনাস্থলে বাঙ্গলা স্কুলের পাঠ্য তালিকা হইতে ইংরাজি বহিগুলা বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা দিয়াও পাঠকেরা দেখিবেন, বাঙ্গালী শিশুর স্কন্ধে কিরূপ বিপরীত বোঝা চাপানো হইয়াছে। অথচ তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের এমনি সস্নেহ দৃষ্টিপাত যে, তিনজনের রচিত তিনখানা স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ ছাত্রদিগকে মুখস্থ করাইয়া তবে তাঁহার তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ঐ তিনখানি পুস্তকই যদি উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে সেই পরিমাণে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গলা স্কুলগ্রন্থকারদিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা আর কেহ যেন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর একখানা বহি তৈরি করিয়া না বসেন, বরঞ্চ ছাত্রগণের পিতামাতা-গণ বর্ষে বর্ষে তাঁহাদের অরচিত গ্রন্থের সম্ভাবিত মূল্য ধরিয়া দিতে পারেন ; তাহা হইলেও ডাক্তার খরচটা লাভ থাকে।

যাঁহারা সাধারণ মফস্বল স্কুলপাঠীদিগের নিরতিশয় দারিদ্র্য-সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন এইরূপ রাশীকৃত অনাবশ্যক গ্রন্থভারে ছাত্রদিগকে নিপীড়িত করা কিরূপ হৃদয়হীন বিবেচনাহীন নিষ্ঠুরতা। কত ছাত্রকে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া পাঠ্যগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। এই-রূপে নির্ব্বাসনে অনশনে কঠোর পরিশ্রমে বিদেশী খণি হইতে জ্ঞান সংগ্রহে যাহারা বাধ্য তাহাদের ভার যত লঘু, পথ যত সুগম করিয়া দেওয়া যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। অল্পবয়সে শিক্ষার যাঁতায় বাঙ্গালীর ছেলের শরীর মন সম্পূর্ণ জীর্ণ নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এক হাস্যহীন ক্রীড়াহীন স্বাস্থ্য-হীন অকালপক্ক প্রবীণতার অন্ধকার কলিযুগ অবতীর্ণ হইতেছে।

দেশের রোগ, বিদেশের শিক্ষা, ঘরের দারিদ্র্য এবং পরের দাসত্ব এই সব কটায় মিলিয়া আমাদের স্বল্পায়ু জীবনটাকে শোষণ করিতেছে। ইহার উপরে যদি আবার পাঠ্যনির্ব্বাচন সমিতির স্বদেশীয় সভ্যগণও বাঙ্গালীর দুরদৃষ্টক্রমে নির্ব্বিচারে বাঙ্গালীর ছেলের স্কন্ধে হেয়ার-প্রেস-বিনির্গত সকল প্রকার শুষ্ক বিদ্যার বোঝা চাপাইতে থাকেন তবে আমাদের দেশের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

অনেক ছাত্রবৃত্তিস্কুলে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য মহেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করা হইয়াছে ; তাহাতে ছেলেদের বিদ্যা প্রায় পূর্ব্ববৎ থাকে এবং পদার্থও শরীরে বড় অবশিষ্ট থাকে না। যখন দেখা যায় তিন বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের উনবিংশ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে এবং যখন কল্পনা করি অন্ততঃ অষ্টাদশ সহস্র হতভাগ্য বালককে এই গ্রন্থের পাষাণ সোপানের উপর জল হইতে উত্তোলিত মীনশাবকের ন্যায় আছাড় খাইতে ও খাবি খাইতে হইয়াছে, তখন শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যে সকল ভীষণ প্রান্তরে প্রাচীনকাল হইতে দস্যুসম্প্রদায় নিরুপায় পান্থদিগের প্রাণসংহার করিয়া আসিয়াছে, সেই অস্থিসঙ্কুল সুবিস্তীর্ণ দুর্গম প্রান্তর দেখিলে হৃদয় যেরূপ ব্যাকুল হয়, এই পদার্থবিদ্যার উনবিংশ সংস্করণ দেখিলেও মনের মধ্যে সেইরূপ করুণামিশ্রিত ভীষণ ভাবের উদ্রেক হইতে থাকে।

মফস্বলের দরিদ্রস্কুলে কিরূপ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সেখানে বিজ্ঞান সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইবার কিরূপ উপকরণ পাওয়া যায় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এমন অবস্থায় যাঁহারা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের পদার্থবিদ্যা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাঁহারা বিনাপরাধেই শিশুপালবধের জন্য

প্রস্তুত। বিশ্বজগতে অনেকগুলি দুর্ব্বোধ বিষয় আছে। যথা, নারিকেলের মত এমন উপাদেয় ফল শাখাসংস্থানহীন বৃক্ষশিরে পঞ্চাশ হস্ত উর্দ্ধে ঝুলাইবার কি উদ্দেশ্য ছিল; হীরকের মত এমন উজ্জ্বল রত্ন খনিগর্ভে দুর্গম অন্ধকারের মধ্যেই বা নিহিত থাকে কি অভিপ্রায়ে; ধান্য গোধূম যবের জন্য এত শ্রম সহকারে চাষের প্রয়োজন হয় কেন আর কাঁটা গাছগুলা বিনা চেষ্টায় অজস্র উৎপন্ন হইয়া কি উপকার সাধন করে; হিমালয়ের নির্জ্জন শীত-প্রদেশে এত প্রচুর বরফ কি কাজে লাগে অথচ কলিকাতায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ বরফের যোগান বন্ধ হইয়া যায় কেন; যখন চোর পালায় তখন হঠাৎ বুদ্ধি বাড়িয়া উঠিয়া ফল কি; গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরদিনে পরিহাসের উত্তর যোগায় কেন;

এবং ছাত্রবৃত্তিস্কুলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের রচিত পদার্থবিজ্ঞান প্রচলিত হইবার কারণ কি?

উপরিউক্ত কয়টা বিষয়ই দুর্ব্বোধ, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা ও বিষয়বিন্যাস এই সকল কয়েকটি প্রহেলিকা হইতেই দুর্ব্বোধতর।

এই গ্রন্থখানি শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে যে কতদূর নিষ্ঠুর তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই কয়েকপৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ছাত্রদের অনেকের মা বাপ আছে কি না জানিনা, কিন্তু শিক্ষা-বিভাগ, যে, তাহাদের মা বাপ নহেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিলাতে সুকুমারমতি বালকদিগকে সহজে বিজ্ঞানশিক্ষা দিবার বিচিত্র উপায় আছে; তথাপি ইংরাজি ভাষায় প্রথম শিক্ষার্থী-দিগের জন্য হক্স্‌লিসাহেবের সম্পাদকতায় যে বৈজ্ঞানিক প্রথম পাঠগুলি রচিত হইয়াছে তাহা কিরূপ আশ্চর্য্য সরল!—তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যারণ্যের জটিলতা ও ভাষার দুর্গমতা লেশমাত্র নাই।

কারণ, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। মুখ্যরূপে ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহাতে ভাষার কৌশল ও কাঠিন্য আবশ্যক হইতে পারে—কিন্তু যে বিজ্ঞান আমাদের দেশের ছাত্রদের পক্ষে সহজেই অত্যন্ত দুরূহ তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব সহজ করা উচিত, নতুবা ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির অন্যায় এবং নির্দ্দয় অপব্যয় সাধন করা হয়। এবং মাঝে হইতে না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া তাহারা ভাষাও শেখে না বিজ্ঞানও শেখে না, কেবল মনকে ক্লান্ত, সময়কে নষ্ট ও শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া অপরাপর শিক্ষার ব্যাঘ্যাত করে মাত্র।

আমরা ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক শক্তির এই অন্যায় অপব্যয় নিবারণের উদ্দেশেই এণ্ট্রেন্সস্কুলে বাঙ্গলা ভাষায় বিষয় শিক্ষা দিতে অনুরোধ করি। এই প্রণালীতে, ছাত্রগণ যে সময় ও শক্তি হাতে পাইবে তাহা ইংরাজি শিক্ষায় প্রয়োগ করিয়া উক্ত ভাষা অনেক ভাল করিয়া শিখিবে সন্দেহ নাই এবং সেই সঙ্গে বিষয়গুলিও সহজে ও সম্পূর্ণতররূপে আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহাদের শরীরও অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইবে এবং মনোবৃত্তির চর্চ্চাও অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে।

আমরা ও তোমরা।

১

'আমরা' খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই গো,

আর, 'তোমরা' বসিয়া খাও ;

আমরা ছুপ'রে আপিসে লিখিয়া মরি গো,
আর, তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে 'আমরা'ই পড়ে' লড়ি গো,
'তোমরা' গহনাপত্র ও টাকাকড়ি গো
অমায়িকভাবে গুছায়ে, পাল্কি চড়ি' গো,
ধীরে চম্পট দাও।

২

সম্পদে ছুটে কোথা হ'তে এসে পড় গো,
(আহা) যেন কতদিন-চেনা ;
তোমরা দোকানী, সেক্‌রা, পসারী ডাক গো,
আর, আমাদের হয় দেনা ;
সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি' গো—
—নবকার্ত্তিক আর কি—আদরে গলি' গো—
'প্রাণবল্লভ' 'প্রিয়তম' 'নাথ' বলি' গো,
কৃতার্থ করি' দাও।

৩

তোমরা অবাধে যা' খুসি বলিয়া যাও গো,
(ভয়ে) আমরা স্তব্ধ রই ;
আমরা কহিতে—পাছে কি বেফাঁস বলি গো—
সদা, সেই ভয়ে সারা হই ;
কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি গো ;
আমরা—না বুঝি করেছি কি অপরাধই গো—
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া সাধি গো,
তবু ফিরে নাহি চাও।

৪

আমরা বেচারী— ব্যবসা চাকরি করি গো,—
আর, তোমরা কর গো 'আয়েস' ;
আমরা সাহেবমুনিববকুনি খাই গো,
আর তোমরা খাও গো—'পায়েস' ;
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত গো
কার্য্য করিয়া না পুরাই মনোরথ গো,
অবহেলে চলি' যাও নাড়ি দিয়া নথ গো
অথবা মারিতে ধাও।

৫

আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতিবাড়ে গো—
রোজ, জ্বালাতন হয়ে' মরি ;
তোমরা—সে ভোগ ভুগিতে হয় না—থাক গো
খাসা, বেশবিন্যাস করি ;
আমরা দুটাকা জোড়ার কাপড় পরি গো—
তোমাদের চাই সোণা দশ বিশ ভরি গো—
'বোম্বাই' 'বারাণসী' বছর বছরই গো—
তবু মন উঠে নাও।

ধারা স্নান।

আমরা যেখানে থাকি সে স্থানটার নাম মেজিয়া, দামোদরের তীরে। এখান হইতে রাণিগঞ্জ তিন মাইল। মেজিয়া হইতে সুশুনিয়া ষোল মাইল পথ। দুইটা ঘোড়ার ডাক বসাইলে আড়াই ঘণ্টায় পৌঁছান যায়। প্রথম আট মাইল কাঁচা রাস্তা বলিয়া একটু

বেশী সময় লাগে। শেষ আট মাইল যাইতে আমাদের ঠিক এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

ভোরে উঠিয়া সমস্ত ঠিক ঠাক করিয়া লইতে আমাদের প্রায় ৭½ সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। পূর্ব্ব দিন একটা ঘোড়া এখান হইতে আট মাইল দূরে "কুস্থলের" বাংলায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গাড়ী ছাড়া গেল। পলাশবনের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। অনেক দিন এ দিকে আসি নাই। আজ এখানে আসিয়া অতীতের কত মধুময় স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। স্নিগ্ধশ্যামোজ্জ্বল সেই বনস্থলীর মাঝে সহসা কয়খানি সরল সুন্দর হাসিমাখা মুখ মনে পড়িয়া গেল। ভবিষ্যৎ জীবনে বাল্যের স্মৃতি বড় মধুর। আর বাল্যের সেই সহচরগণ তাদের ভালবাসার প্রভাব জীবনে কখন মুছে না। জীবনের প্রত্যেক ছোটখাট সুখে দুঃখে তাহাদের সুন্দর মুখগুলি সুখে একাগ্রতা দুঃখে সান্ত্বনা আনিয়া দেয়। এমনি আরও কত কি ভাবিতে ভাবিতে আমরা একটী ছোট নদীর ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম, শুষ্ক বালুকাশয্যার উপর দিয়া নদীর ক্ষীণ প্রবাহ বহিতেছে। বর্ষায় কিন্তু মূর্ত্তি অন্যরূপ। তখনকার সেই উদ্দাম জলরাশির সহিত এ শান্ত প্রবাহের কোন তুলনাই হয় না। এ নদীটীর নাম "গাইঘাটার জোড়"। এ দেশে ছোট নদীকে "জোড়" বলে। জোড় অর্থে আমার বোধ হয় সেই সকল ছোট ছোট নদী যাহাদিগের একত্র সম্মিলনে একটী বড় নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এইখানে আসিয়া আমি প্রথম রাজকবি টেনিসনের "The Brook" পড়ি। এইখানে পড়িয়াছিলাম বলিয়া এখন পড়িয়া যাহা বুঝি তাহা অপেক্ষা বেশী তখন বুঝিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম নদী কেন কবির কাছে বলিয়াছিল "For men may come and

men may go but I go on for ever." নদীর এই নাস্থটা বড় মনোরম। অদূরে পাহাড় শ্রেণী আধ আধ ছায়া মাখিয়া মানুষের কাছে তাহাদের রহস্যময় জীবনের পরিচয় দিতেছে। আর "ছায়া-মসীমাখা" গ্রামগুলি রেখার ন্যায় সুদূর দিগন্তের কোলে ঘুমা-ইয়া রহিয়াছে।

নদী পার হইয়া যে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম সেখানে আমি পূর্ব্বে কখন আসি নাই। কত গ্রাম, কত মাঠ, কত বন, কত বাগানের মধ্য দিয়া এই সরল রাজপথ কোন অজানা উদ্দেশ্য বুকে করিয়া চলিয়াছে।

বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা 'কুস্থলের' বাংলায় পৌছিলাম, এখান হইতে সুশুনিয়া পর্য্যন্ত বেশ ভাল রাস্তা। দুইধারে ঘন বন, তার মাঝে কাঁকরের রাস্তা গিয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টিপতনে সেই সুন্দর বনপথ আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। পথপার্শ্বে একস্থানে একটী সাঁওতাল পল্লী। ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহগুলি গাছপালার মধ্য হইতে ছবির ন্যায় দেখাইতে-ছিল, দেওয়ালের গায়ে লাল রঙ্গের আলিপনার কত লতাপাতা ফুল ফল, পশুপক্ষীর চিত্র। এই অসম্পূর্ণ চিত্রাঙ্কন আমাদের কাছে অশিক্ষিত সাঁওতালদিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক না হইলেও এই সকল চিত্রের প্রতি তাহাদের একটা গাঢ় অনুরাগ দেখিয়া মনে হয় ইহাদিগের সৌন্দর্য্যস্পৃহা অতিশয় বলবতী। সাঁওতালদের কত ছেলে মেয়ে গাড়ী দেখিতে ছুটিয়া আসিল কেহ "গাড্ডী গাড্ডী" বলিয়া হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল। দেখি-লাম একটা বড় অশ্বত্থ গাছের নীচে কতকগুলি সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া গান গাহিতেছে আর মাদলের তালে তালে নাচিতেছে। এই স্বভাবশিশুদের সেই শুভ্র কোমল হাসি ও

গান আমার কাছে সমস্ত সভ্য জগতের তাললয়সংশ্লিষ্ট রাগিণী ও উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা অনেক মূল্যবান মনে হইয়াছিল। সেই মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশতলে সেই প্রথম বসন্তের সূর্য্যালোকউদ্ভাসিত বনপথে অসভ্য সাঁওতালদের যে গান শুনিয়াছিলাম তাহা এখনও যে কোন স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গীতলহরীর মত আমার কাণে বাজিতেছে। এমনি করিয়া সেই স্বপ্নদুর্লভ সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া বেলা ১০টার সময় আমরা গন্তব্যস্থানে পৌছিলাম। রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে আমার কবিত্ব ছুটিয়া গিয়াছিল, কাজেই 'সুশুনিয়া' পৌছিয়াই স্নান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

আমরা যেখানে উঠিলাম সে একটা 'কুঠী'। একজন সাহেব কুঠীয়াল এইখানে পাথর কাটাইবার জন্য কারবার খুলিয়াছিলেন। তিনি এখন এখানে থাকেন না। একজন সর্দ্দারের দ্বারা কাজ চলে। কলিকাতার ফুটপাথের পার্শ্বে দিবার জন্য যে পাথর ব্যবহৃত হয় তাহা এখান হইতে যায়। এই কুঠীর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অনেক অবশেষ এখনও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। আমরা বাঙ্গালী বুঝিতে পারি না কেন সাহেব এত অর্থ ব্যয় করিয়া এই নির্জ্জন রৌদ্রতপ্ত দেশে কয়দিনের জন্য এই সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা ত আমাদের চির-আবাসও এমন করিয়া সাজাই না। কেহ বলিলে গম্ভীরভাবে উত্তর দিই "আর কি জান, গোটা চল্লিশেক বছর কোন গতিকে চোক মুখ বুজে কাটিয়ে দেওয়া।" বাঙ্গালী ও ইংরাজে প্রভেদ এইখানে।

তার পর এই বার আমার ধারাস্নান। আমি কুঠীর সেই সর্দ্দারের সঙ্গ লইলাম। লোকটী বেশ মিষ্টভাষী তার কাছে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া গেল। সে বলিল প্রথমে এই ধারা সুশুনিয়া পাহাড়ের বড় একটী ঝরণা ছিল। সাহেব সেই ঝরণার মুখে

একটী ব্যাঘ্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মুখ দিয়া ঐ জলধারার পথ করিয়া দেন। নির্ম্মিত ব্যাঘ্রমূর্ত্তির কায় ৭।৮ ফিট, নিম্নে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছা। এই চৌবাচ্ছার এক কোণে একটী বড় ছিদ্র আছে। ঝরণার জল চৌবাচ্ছায় থাকিতে পায় না ছিদ্রমুখে কৃত্রিম পয়োনালী দিয়া বাহির হইয়া যায়। সাহেবের ইচ্ছা ছিল এই জলস্রোত তাঁহার উদ্যানের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করাইবেন। কিন্তু তাঁহার সে সাধ মিটে নাই। ঐ পয়োনালী ভাঙ্গিয়া ইহা আর একদিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

এই ধারাস্নান করিতে বৎসর বৎসর বারুণীর দিনে বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য সাহেব আসিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানটার একটী ছোট খাট তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। একজন সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে আসিয়া এইখানে বাস করিতেন তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা কেহই জানিত না। তবে লোকে তাঁহাকে পরমহংস বলিত। এইখানে তাঁহার দুইটী কুটীর আছে। একটী ঝরণার উপরে আর একটী নীচে চৌবাচ্ছা হইতে হাত দশেক দূরে।

সন্ন্যাসী এখন এখানে থাকেন না। তথাপি পাহাড়িদিগের যত্নে সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও পাতাটি পর্য্যন্ত পড়িয়া নাই।

বড় বড় শাল তমাল আম্র ও মহুয়া বৃক্ষে বেষ্টিত হইয়া এস্থানটী অতি মনোরম। বাহিরে রৌদ্রের উত্তাপে মাটীতে পা দেওয়া যায় না। হুহু করিয়া আগুনের হল্কার মত বাতাস বহিতেছে আর মাঝে মাঝে ঘুঘুর সকরুণ ক্রন্দন শুনা যাইতেছে। এখানে কিন্তু "পৃক্তস্তুষারৈর্গিরি-নির্ঝরাণাং অনোকহা-কম্পিতপুষ্পগন্ধি" সমীরণ আর কোকিলের অশ্রান্ত মধুবর্ষী সঙ্গীত ; একটী বৃক্ষতলে

কতকগুলি সিন্দুরমাখান দেবতা আর অদূরে তাহাদেরই তৃপ্তির জন্য বলির যুপকাষ্ঠ। দূরে একটী মহুয়া গাছের নীচে কতকগুলি কাষ্ঠা-হরণবিরতা সাঁওতাল যুবতী বসিয়া জটলা করিতেছিল, মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ উঠিতেছিল। সে যুবতীসুলভ হাস্যলহরী পাহাড়তল কম্পিত করিতেছিল। যুবতীদিগের মধ্যে অনেকেই অতি সুশ্রী। সুশ্রী বলিলাম বলিয়া হয়ত সৌন্দর্য্যসমালোচকগণ আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। বন্ধুবর্গ আমাকে দিনকতক "মধ্যম-নারায়ণ তৈল" ব্যবহারের উপদেশ দিবেন। বঙ্গসুন্দরীগণ ঈষৎ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন—"আহা! সৌন্দর্য্য দেখতে আর যায়গা পেলেন না। রূপের ত সীমা নেই; রং যেন ধানসিদ্ধ হাঁড়ির তলা।" সত্য কথা বলিতে কি আমিও তখন ইহাই ভাবিতে-ছিলাম। কোন লেখক দুঃখ করিয়াছেন—

"এই কালা আদমীর দেশে কথায় কথায় তুষার এবং কৌমুদী মিলনের চেষ্টাটা কিছু বাড়াবাড়ি রকমের হইয়া উঠিতেছে। আ-দর্শ বড় বিকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" খাসবাঙ্গালার যুবতীগণ মাপ করিবেন। এইখানে একটা উপমার লোভ আমার পক্ষে অসম্বর-ণীয়। আমার মনে হয় এই সকল পাহাড়িয়া যুবতী "কুলু কুলু কল নদীর স্রোতের মত" আপন গরবে আপনি ভোর, ইহাদের সঙ্গিনী পার্ব্বত্য নদীর মত ইহারা ভরা বর্ষায় কিছু চঞ্চল; গতি ঈষৎ তীব্র; দুকূল ভাসাইয়া লইয়া যায়। আমাদের বঙ্গসুন্দরীগণের সহিত আমি বাঙ্গালার খাল ডোবা বিলের সহিত তুলনা দেই। ইহারা কিছু গম্ভীর, কিছু গভীর, স্রোত নাই, বাঁধাজল ম্যালেরিয়ার আকর হিষ্টিরিয়ার লীলাভূমি।

যাক ওসব বাজে কথা। এইবার আমার বহুকালের সাধ মিটিল। আমি ধারাতলে স্নান করিতে বসিলাম। স্নান করিবার

লোক কেহ ছিল না কাজেই আমি বসিয়া বসিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিলাম। স্নান করিয়া এত সুখ কখন পাই নাই। ইহা অপেক্ষা দীর্ঘক্ষণব্যাপী স্নান অনেকবার করিয়াছি। কিন্তু স্থান ও কালমহিমায় সেদিনকার সুখ অতুল্য মনে হইয়াছিল। হঠাৎ কুঠীর সেই সর্দ্দারের ডাকে আমার চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া উঠিলাম। কুঠীতে আসিয়া দেখি আহারের উদ্যোগ হইয়াছে। সেদিনকার সেই পাচকপ্রবরের রন্ধনপারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া শাপভ্রষ্ট কোনও রাজর্ষি সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ রান্না সে কোথায় শিখিয়াছে। উত্তর—আমি নিজে শিখিয়াছি। আমি অবাক।

বেলা ৪টার সময় আমরা একজন পথপ্রদর্শক লইয়া পাহাড়ে উঠিলাম। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর ১০৮০ ফিট, মধ্যপথে একটী গুহা, শুনিলাম গুহাদ্বারে একটী সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। গুহা দেখা আমাদের ঘটে নাই। সে পথটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া আমাদের একটু ঘুরিয়া যাইতে হইল।

সেই ১০৮০ ফিট উচ্চে বসিয়া নিম্নস্থ পৃথিবীর জীবজন্তুকে ছোট ছোট খেলার সামগ্রী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া হাস্য সম্বরণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। মানুষগুলোকে লিলিপুটনিবাসী মনে হইতে লাগিল। বনস্পতিদিগকে তদ্দেশীয় বৃক্ষের সহিত, নদীগুলোকে সবুজ কার্পেটের উপর পুঁতির লতার সহিত তুলনা দিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। সে মুহূর্ত্তে জগতের মধ্যে কেবল আমাদের সেই উন্নত আসন এবং সর্ব্বাপেক্ষা সেই আসনস্থ আপনাদিগকে উচ্চ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমনি পদমাহাত্ম্য!

পাহাড় হইতে ফিরিতে আমাদের সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা

ধারায় গেলাম। দিনের আলোক পড়িয়া আসিয়াছিল। বাহিরে তখনও অন্ধকার হয় নাই। সন্ধ্যার ছায়া এখানে কিছু গাঢ়তর। পত্রাবকাশে কচিৎ দুই একটা সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল। চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্রকিরণ সেই ঘন পত্রান্তরালে তেমন প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সন্ধ্যা সমীর ধীরে ধীরে ঈষৎ কম্পিত বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্য দিয়া বহিতেছিল। সেই জলধারার অবিশ্রাম পতন-ধ্বনি এবং বৃক্ষরাজির গম্ভীর শাখাসঞ্চালনশব্দ তাহার উপর সন্ধ্যার তরলআঁধারে স্থানটাকে এক অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া শেষে শ্রান্ত পদে ধীরে ধীরে কুঠিতে ফিরিলাম।

বহুপত্যাত্মক বিবাহ।

একজন পুরুষের বহু পত্নী, এরূপ বিবাহপ্রণালীতে আমরা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত, এবং এখনও পৃথিবীতে এই প্রণালীর বিবাহ বহুপ্রচলিত, তাই ইহাতে আমরা কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা বা নৈতিক কদর্য্যতা দেখিতে পাই না। পুরুষের বহুবিবাহ আমরা দোষাবহ, নিন্দনীয় এবং উচ্চনীতিবিগর্হিত মনে করিতে পারি, কিন্তু যে সকল সমাজে এই প্রথা প্রচলিত, সেই সকল সমাজকে প্রেতসমাজ বলিয়া মনে হয় না। প্রথাটার অনুমোদন করি না বটে, কিন্তু ইহাতে বীভৎস কোন কিছু দেখিতে পাই না।

কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি—কথাটা মনে করিতে অন্তরাত্মা যেন শিহরিয়া উঠে। মানব সমাজে যে এরূপ বীভৎস, এরূপ পৈশাচিক

প্রথা প্রচলিত থাকিতে পারে, ইহা সহজে ধারণা করা যায় না। অকাট্য প্রমাণ না থাকিলে, ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা বুঝি আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইত। দ্রৌপদীর বিবাহ বৃত্তান্তের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত বটে, কিন্তু সে একটা আগন্তুক উদ্ভট ঘটনা; কতকগুলি আকস্মিক, অনিবার্য্য, দৈব কারণে সংঘটিত হইয়াছিল। যে সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তখনও উহা এতই অবিশ্বাস্য,এতই অসম্ভব ছিল, যে মহাভারতকার বা তাঁহার পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্তাংশবিন্যাসকারীদিগকে ইহার ব্যাখ্যার জন্য অনেক শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, অনেক অত্যদ্ভুত উপন্যাস সৃজন করিতে হইয়াছিল,অনেক অলৌকিক ব্যাপারের কল্পনা ও অবতারণা করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ, যে সময়ে ও যাঁহাদের মধ্যে এই অদ্ভুত বিবাহ ঘটিয়াছিল বা কল্পিত হইয়াছিল, সে সময়েও তাঁহাদের পক্ষে সকলই সম্ভব ছিল। তখন কেবল মন্ত্রবলে যজ্ঞকুণ্ড হইতে পুত্রকন্যা সমুদ্ভূত হইত, দেবতারা সশরীরে মর্ত্ত্যে আসিয়া মানবীর গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিতেন, গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব করিয়াও কৌমার রক্ষিত হইত, স্বয়ং নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়া সারথ্য করিতেন, সে এক কাল ছিল। তাঁহারা স্বয়ং রুদ্রের সহিত দ্বৈরথ্য যুদ্ধ করিতেন, অমরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন, সশরীরে স্বর্গে যাইতেন— তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ঠিক আমাদের মতন মানুষ ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে যে অসম্ভব ঘটিবে, ইহাই সম্ভব। তাঁহাদের মধ্যে কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিলেও, তদ্দ্বারা এই কলিকালের সামান্য মানুষের কোন সামাজিক রীতির ব্যাখ্যা হয় না। দ্রৌপদী বহুপতিবতী ছিলেন বলিয়া বহুপত্যাত্মক বিবাহপ্রণালী আমাদের পক্ষে সহজবোধ্য হইয়া উঠে না।

সহজবোধ্য হউক বা না হউক, বহুপত্যাত্মক বিবাহ পৃথিবীর

অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে এবং ছিল। হোটেন্‌টট্‌দিগের মধ্যে, ডামারাদিগের মধ্যে, মিরি, ডোফলা, বুতিয়া, সিসি আরব, খাসিয়া এবং সাঁওতালদিগের মধ্যে এই প্রণালীর বিবাহ প্রচলিত আছে। সিউয়ালিক পর্ব্বতে, সির্‌মুরে, নাদাথে, জৌনসার এবং বাওয়ারের পার্ব্বত্য প্রদেশে, কুনোয়ারে, কোটেপড়ে, তিব্বতে, আরবে, সাইবিরিয়ার পূর্ব্বাংশে, এবং আরও অনেক স্থানে ইহা প্রচলিত আছে। সিংহল দ্বীপে এই প্রণালীর বিবাহ কিছুকাল পূর্ব্বে বহুপ্রচলিত ছিল তবে যে সকল শ্রেণীর লোকের অবস্থা স্বচ্ছল তাহাদেরই মধ্যে এবং দ্বীপের দূর অভ্যন্তরভাগেই অধিক প্রবল ছিল। ইহাদের স্ত্রীলোকের পতিসংখ্যা তিন হইতে আট পর্য্যন্ত হইতে পারিত। ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগিজদিগের প্রযত্নে এই প্রথা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে তিরোহিত হয়। দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ হইতেও যাহাতে এই কদর্য্য প্রথা বিলুপ্ত হয়, তজ্জন্য ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর সর্ হেন্‌রি ওয়ার্ড এক রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ইহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। স্কিনর সাহেব লিখিয়াছেন যে, যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থলে একটি বলিষ্ঠকায় পার্ব্বত্য জাতির বাস। ইহারা হিন্দু; কিন্তু বহুপত্যাত্মক বিবাহপরায়ণ। ইহাদের একটি স্ত্রীলোককে সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--"তোমার স্বামী কয়টি?" স্ত্রীলোকটি বলিল—"সবে চারটি।" সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"সকলেই কি জীবিত?" উত্তর—"কেন থাকিবে না।" প্রাচীন ব্রিটনদিগের সম্বন্ধে জুলিয়স্ সিজর লিখিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে একই স্ত্রীলোকের দশ বার জন স্বামী; ভ্রাতায় ভ্রাতায় এবং পিতা-পুত্রেও একই স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে এই বিবাহপ্রথার দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে

পারে, কিন্তু তাহার বোধ হয় আবশ্যক নাই। যে গুলির উল্লেখ করা গেল, একটি প্রবন্ধের জন্য তাহাই পর্য্যাপ্ত।

বহুপত্যাত্মক বিবাহপদ্ধতিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক, যে স্থলে পতিরা পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃ-সম্বন্ধযুক্ত। দ্বিতীয়, যে স্থলে স্বামিগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বা জ্ঞাতিত্ব কোনরূপ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজনীয় নহে; স্ত্রী আপন ইচ্ছানুসারে যাহাকে অভিরুচি পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বহুপত্যাত্মক বিবাহ তিব্বতে প্রচলিত বলিয়া ইহা সাধারণত 'তিব্বতীয় বহুপত্যাত্মক বিবাহ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু তিব্বতের নামে বিকায় বলিয়া ইহা যে তিব্বতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, এরূপ নহে। চীন হইতে কাশ্মীর ও আফ্গানি-স্থানের অধীনস্থ প্রদেশসমূহ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই প্রণালীর বিবাহ প্রচলিত। তিব্বতীয় ভাষা যে সকল প্রদেশের অধিবাসীদিগের মাতৃভাষা, সে সকল প্রদেশেই বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে। তবে, সিকিমে এবং ভারতবর্ষের সংলগ্ন আরও কোন কোন প্রদেশে যে এই বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই, তাহার কারণ, এই সকল প্রদেশের অধিবাসীরা হয় আর্য্যবংশসম্ভূত, না হয় আর্য্য রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নহে। পৃথিবীতে যে সকল জাতির মধ্যে বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে, নায়র, খাসিয়া এবং সাপরোজীয় কোসাক্ জাতি ছাড়া আর সকলেই এই তিব্ব-তীয় প্রণালীর অনুবর্ত্তন করে। এই প্রণালীর বিবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ। সর্ব্বাগ্রজ ভ্রাতা স্ত্রীনির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করে, এবং এই বিবাহ নিবন্ধনই সেই স্ত্রী বিবাহিত পতির অনুজদিগেরও পত্নিত্ব প্রাপ্ত হয়। জ্যেষ্ঠের কৃত বিবাহেই অনুজদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়; তজ্জন্য স্বতন্ত্র কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়

না। কিন্তু অনুজ ভ্রাতাদিগের এটুকু স্বাধীনতা আছে যে, তাহাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই এজ্‌মালি বিবাহে যোগ না দিতেও পারে, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের বিবাহিত স্ত্রীর পতিত্বগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে; কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়ম প্রচলিত থাকায় এই স্বাধীনতার ব্যবহার করা অনুজদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য। সহোদরদিগের সাধারণ পত্নীর পতিত্বগ্রহণে অসম্মত হইলে পৈতৃক সম্পত্তিতে এবং ধনাধিকারী জ্যেষ্ঠের আশ্রয় হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে হয়, সুতরাং এই স্বাধীনতার ব্যবহার নিতান্তই বিরল। যাহারা পতিত্ব স্বীকার করে, তাহারা সর্ব্ব বিষয়ে এবং সম্পূর্ণরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধীন হয়। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী, সম্পত্তি এবং প্রভুত্ব, সকল তাঁহার অব্যবহিত অনুজ প্রাপ্ত হয়। যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা মাতার পতিদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে পিতৃসম্বোধন করে, এবং তাঁহার অনুজদিগকে খুল্লতাত বলে। কোথাও বা সকলকেই পিতা বলে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বহুপত্যাত্মক বিবাহ মালাবারের নায়র জাতির মধ্যে প্রচলিত। তিব্বতীয় প্রণালী আমাদের চক্ষে যতই কেন অদ্ভুত হউক না, নায়র প্রণালী আরও অদ্ভুত। নায়র বালিকাদের বিবাহ প্রায়ই বয়ঃসন্ধি সময়ে, অর্থাৎ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে, হইয়া থাকে। পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে, বিলক্ষণ আনন্দোৎসবের মধ্যে সমারোহ করিয়াই এই বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, অথচ এই বিবাহকে বিবাহ না বলিয়া বিবাহের পূর্ব্বানুষ্ঠান বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। এই বিবাহ অতি অল্প কাল মাত্র স্থায়ী। কৌমার মোচন ব্যতীত এই প্রথম বিবাহের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বিবাহান্তে চারি পাঁচ দিন মাত্র এই নবপরিণীতা পত্নীর সহিত

একত্র বাস করিয়া বরটিকে জন্মের মত বিদায় হইতে হয়। কন্যা আপন পিতৃগৃহেই থাকে। এই রূপে যৌন সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইয়া নায়র বালিকারা, প্রথম কয় দিনের সেই কৌমারহর পুরুষ ব্যতীত আর যাহাকে ইচ্ছা পতিরূপে বরণ করিতে পারে। প্রত্যেক নায়র রমণীর স্বামিসংখ্যা সচরাচর চারিটি হইতে বারটি পর্য্যন্ত দেখা যায়। পক্ষান্তরে, এই সকল পতিদিগের মধ্যে সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুসারে অন্য কোন রমণীর পতিদলভুক্ত হইতে পারে। এই সকল স্বামীগণের পরস্পরের সহিত কোন প্রকার নিকট জ্ঞাতি সম্বন্ধ থাকে না। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, নায়রদিগের পিতৃনিরূপণ হওয়া ত অসম্ভব বটেই, পিতৃবংশ নিরূপণ হওয়াও অসম্ভব। সেই জন্য ইহাদের মধ্যে পুত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত নহে। কিন্তু, কে কাহার ঔরসজাত, ইহা স্থির করা অসম্ভব হইলেও, কে কাহার গর্ভজাত তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। সেই জন্য ইহাদের উত্তরাধিকার নিয়মানুসারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার ভাগিনেয় প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে সম্পর্কের হিসাবও মাতাকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পৃথিবীর সমস্ত বহুপত্যাত্মক বিবাহপ্রথা হয় তিব্বতীয় ভাবাপন্ন, না হয় নায়র ভাবাপন্ন; কিন্তু কোন কোন স্থলে কিছু কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধের অঙ্গ-হীনতা দোষ পরিহারার্থে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এইখানে দেওয়া যাইতেছে।

নীলগিরির তোড়া জাতির মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা তিব্বতীয় প্রথারই অনুরূপ; তবে, ইহার বিশেষত্ব এই যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহিতা পত্নী যেমন তাহার অনুজদিগেরও পত্নিত্ব প্রাপ্ত হয়, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্বামিগণও তেমনি তাহার অনুজা ভগিনী-

দিগেরও পতিত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাদের বিবাহ প্রথাকে বহু-পত্ন্যাত্মক বিবাহ ও বহুপত্যাত্মক বিবাহের মিশ্রণ বলা যাইতে পারে। মহিশূরের কুর্গ জাতির বিবাহ প্রথাও অবিকল এই-রূপ।

হাসিনিয়ে আরবদিগের মধ্যে এক প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে আংশিক বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহে, সপ্তা-হের মধ্যে কোন্ কোন্ দিন কন্যা বরের স্ত্রী থাকিবে, তাহা বিবাহ-কালেই নির্দ্ধারিত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিন ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিন সেই স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বাধীন, এবং এই সকল ছুটির দিনের জন্য সে যাহাকে ইচ্ছা আত্মসমর্পণ করিতে পারে। গুয়ানা নামক জাতির বিবাহও প্রায় এইরূপ ছিল। ইহাদের মধ্যে, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার পক্ষ হইতে চুক্তিটা খুব টানাটানি করিয়া স্থির করা হইত। স্বামীর জন্য তাহাকে কি কি করিতে হইবে, কি পরি-মাণে করিতে হইবে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণীত হইত;—স্বামীর জন্য তাহাকে কি পরিমাণে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে, কি পরিমাণ কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইবে, সে একমাত্র পত্নী হইবে কি না, সে ইচ্ছা করিলে আরও স্বামীগ্রহণ করিতে পারিবে কি না; যদি পারে, তাহা হইলে প্রথম স্বামী তাহার কতখানি সময় অধিকার করিতে চাহেন? এই দুই জাতির বিবাহ যে নায়র ভাবাপন্ন, তাহা না বলিলেও চলে।

বহুপত্যাত্মক বিবাহপ্রসঙ্গে আর একটি অতিমাত্র বিস্ময়কর প্রথার উল্লেখ না করিলে চলে না। দক্ষিণ ভারতবর্ষে 'রেদ্দি' বলিয়া একটি জাতি আছে; তাহাদের মধ্যে এক অত্যদ্ভুত বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে। প্রাপ্তযৌবনা বিংশতি বা ততোধিক বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীলোকের একটি পাঁচ বা ছয় বৎসরের বালকের সহিত

বিবাহ হয়। বালকস্বামীর যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে তাহার স্ত্রীকে গর্ভধারণে নিরস্ত থাকিতে হয়, এরূপ নহে। সেই স্ত্রী তাহার স্বামীর মাতুল গোষ্ঠীর কোন যুবার সহবাসে—কখন কখন সেই বালক-স্বামীর পিতার সহবাসে—গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করিতে থাকে। সন্তানগুলি যদিও এইরূপে উৎপন্ন, তথাপি সেই বালক-স্বামীর সন্তান বলিয়াই পরিগণিত হয়। সেই বালক যখন প্রাপ্তযৌবন হয়, তখন হয়ত তাহার পরিণীতা ভার্য্যা গর্ভ-ধারণের বয়সের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সে তখন অন্য কোন বালকের যুবতী স্ত্রীর সহবাসে সন্তানোৎপাদন করিতে থাকে। কোইম্বাতুর অঞ্চলের 'ভেল্লালা' জাতির মধ্যেও এইরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, শুনা যায়। রুষিয়ার কৃষিজীবীদিগের মধ্যেও কিছু কাল পূর্ব্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

বহুপত্যাত্মক বিবাহের কথায় আমাদের নীতিবুদ্ধি ও সংস্কার যে এতটা বিস্মিত চমকিত, শিহরিত হয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে, সামাজিক রীতিনীতির বিচারকালে আমরা ভুলিয়া যাই যে, এ সকলের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনাধীন হইয়া থাকে। যে রীতি, যে প্রথা, সে সমাজের আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অব-স্থার উপযোগী, সে সমাজে তাহাই প্রচলিত হয়। না হইলে উপায় নাই, রক্ষা নাই। আমরা যাহাকে সুনীতি বলি, নিসর্গের নিয়ম তাহার মুখাপেক্ষা করে না। অবস্থাধীন যাহা সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের নীতিবুদ্ধির চক্ষে সুই হউক আর কুই হউক, তাহা সমাজকে অবলম্বন করিতেই হইবে; না করিলে সমাজের অমঙ্গল—ক্ষয় ত ধ্বংস—অবশ্যম্ভাবী। বহুপত্যাত্মক বিবাহে আমাদের বিস্মিত হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমরা বড়ই কথার দাস। আমাদের সমাজে ও অপরাপর সুসভ্য ও উন্নত

সমাজে বহুপত্যাত্মক বিবাহ নামে কোন অনুষ্ঠান অভিহিত নহে বলিয়া আমরা মনে করি যে, বহুপত্যাত্মক বিবাহ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাও আমাদের বা অন্য উন্নত সমাজে নাই। কিন্তু এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষে উপগত হওয়ার দৃষ্টান্ত কোন সমাজেই বিরল নহে; তবে সমাজ এবং রাজবিধি ইহাকে অপরাধ বলে, বিবাহ বলে না, এবং এ প্রকার যৌন সম্মিলন ঢাক ঢোল বাজাইয়া, মন্ত্র পড়িয়া, সমাজকে ও দেবতাদিগকে সাক্ষী করিয়া নিষ্পন্ন হয় না। সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত না হউক, এবং কথাটা ব্যবহৃত নাই হউক, জিনিষটা সর্ব্বত্রই আছে। তলাইয়া বুঝিলে এ প্রকার বিবাহের নামে শিহরিত হইবার কিছুই থাকে না।

এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপ অবস্থায় এবং কি কি কারণে এইরূপ বিবাহ প্রয়োজনীয়, সুতরাং অবলম্বিত হয়। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, কোন সমাজে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার বিশেষ ও অযথা তারতম্য হইলে, অর্থাৎ স্ত্রীসংখ্যার অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক হইলে, সকল পুরুষের স্ত্রীলাভের দুইটি মাত্র পথ থাকে—হয় নিকটবর্ত্তী অন্য সমাজ হইতে ছলে বলে কৌশলে স্ত্রীসংগ্রহ করিতে হয়, না হয় নিজের সমাজের স্ত্রী অপরের সহিত ভাগে ভোগ করিতে হয়। প্রথমোক্ত পথে বিপদ অনেক; তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহাদির সম্ভাবনা, এবং প্রতিশোধার্থ অন্য জাতি কর্তৃক স্বসমাজের স্ত্রীলোক অপহৃত হইবারও সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, প্রদেশ বিশেষে যে জাতি বা সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী, অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের স্ত্রীহরণ তাহাদেরই সাজে। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সমাজ এ পথ অবলম্বন করিলে, প্রতিবিধিৎসার অনলে অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপন সমাজে বহুপত্যাত্মক বিবাহের প্রচলন ব্যতীত তাহাদের

আর উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার এমন গুরুতর ও অযথা তারতম্য—পুরুষের অযথা আধিক্য এবং স্ত্রীসংখ্যার অযথা অল্পতা—কি কারণে ঘটে ?

স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার তারতম্য নানা কারণে ঘটিতে পারে। কতকটা স্বভাবতঃই হয়; দেশভেদে, ব্যবসায়ভেদে পুত্রসন্তান, কোথাও কন্যাসন্তান, অধিক জন্মে। কিন্তু স্বাভাবিক কারণে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার যে তারতম্য হয়, তাহা অতি সামান্য। অসভ্য সমাজে স্ত্রীসংখ্যার অল্পতার প্রধান কারণ, কন্যাসন্তান হত্যা। অনেক অসভ্য ও কিঞ্চিদুন্নত সমাজে এই নৃশংস প্রথা বহু প্রচলিত। এমনও জাতি দেখা যায়, যাহারা আপনাদের সমস্ত বা অধিকাংশ কন্যাসন্তান হত্যা করে। বঙ্গদেশের 'গন্দ' জাতির সম্বন্ধে ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইহাদের অধ্যুসিত প্রদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে একটিও বালিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল জাতির মধ্যে এই অস্বাভাবিক প্রথা প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা স্ত্রীলোকের অভাব কাজেই হইবে। কিন্তু এমন অনেক অসভ্য সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে কন্যাহত্যার প্রথা প্রচলিত থাকিলেও তত প্রবল নহে। এরূপ স্থলে আর একটি কারণে স্ত্রীসংখ্যার অল্পতা ঘটে। সে কারণ, কন্যাবিক্রয়। মনে রাখিতে হইবে যে, অসভ্য সমাজে স্ত্রীলোক একটা সম্পত্তি মাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় স্ত্রীলোকও একটা ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী। রূপ, গুণ এবং কর্ম্মিষ্ঠতার পরিমাণ অনুসারে তাহাদের একটা মূল্য থাকে। সে মূল্য পাঠাইলেই দরিদ্র পিতামাতা কন্যাসন্তান বিক্রয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। যে সকল অসভ্য জাতি বড় দরিদ্র, তাহারাই অধিক কন্যাবিক্রয়পরায়ণ। বলিতে

কি, কন্যাহত্যা এবং কন্যাবিক্রয়, এই উভয়বিধ পাপ প্রথারই মূল কারণ দারিদ্র্য। কিন্তু যেমন এক কণ্টকের দ্বারা অন্য কণ্টকের উদ্ধার হয়, এস্থলেও তেমনি এক পাপের দ্বারা অন্য পাপের হ্রাস হইয়াছে। অনেক সমাজতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের মত এই যে, কন্যাবিক্রয়প্রথা প্রচলিত হওয়াতেই কন্যাহত্যা প্রথা অল্পে অল্পে পরিত্যক্ত হইয়াছে—মূল্যবান পণ্যদ্রব্য কেহ সাধ করিয়া বিনষ্ট করে না, বরং ঘষিয়া মাজিয়া তাহার মূল্যবৃদ্ধিরই চেষ্টা করে। এখন, জাতীয় দারিদ্র্যই যখন কন্যাবিক্রয়ের কারণ, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে কন্যার উপযুক্ত বা অভিলষিত মূল্য দিতে পারে এরূপ লোক সেই জাতির মধ্যে বড়ই বিরল হইবে। এরূপ অবস্থায়, হয় অনেক কন্যা অন্য জাতীয় লোকের দ্বারা ক্রীত হইয়া আপন জাতির বাহিরে চলিয়া যায়, সুতরাং স্ত্রীসংখ্যার অল্পতা ও তন্নিবন্ধন বহুপত্যাত্মক বিবাহের প্রয়োজন হয় অথবা যদি এই কন্যাগুলিকে আপন জাতির মধ্যে রাখিতে হয় তাহা হইলেও, এক জনের সাধ্যাতীত বলিয়া পাঁচজনে মিলিয়া প্রয়োজনীয় মূল্যের সংস্থান করে। যাহা পাঁচজনের অর্থে ক্রীত তাহা কজেই পাঁচ-জনেরই সম্পত্তি হয়। এই জাতি যদি অন্তর্বিবাহপরায়ণ (endogamous) হয়; তাহা হইলে বহুপত্যাত্মক প্রণালী অবলম্বন ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর থাকে না।

কন্যা হত্যানিবন্ধন আরও এক প্রকারে স্ত্রীসংখ্যার অল্পতা হয়। শারীরিক প্রকৃতি অবস্থাধীন বিবর্তিত হয় বলিয়াই হউক, বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, ইহা দেখা যায় যে, যে জাতি দীর্ঘকাল ধরিয়া কন্যা সন্তান হত্যা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে কন্যাসন্তান অল্প জন্মে। অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; আমরা এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইব। নীল-

গিরির 'তোড়া' জাতি পূর্ব্বে কন্যাহত্যাপরায়ণ ছিল। এখনও তাহাদের মধ্যে কন্যা অপেক্ষা পুত্রসন্তান অধিক জন্মে।

দারিদ্র্য হইতেও এইরূপ ফল ফলে। জন্মকালে পুত্র কন্যার আপেক্ষিক ন্যূনাধিক সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিবিধ মত প্রচারিত, আদৃত ও অবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ডাক্তার ডুসিঙ্গের মত বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। তিনি বলেন যে, জীবজগতে যে প্রকার প্রকৃতিনিবন্ধন পুংসন্তান বা স্ত্রীসন্তানের আধিক্য বা অল্পতা হয়, তাহার চরম নিয়ামক, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই সমান সংখ্যক পুং ও স্ত্রীসন্তান উৎপাদনের দিকেই স্বভাবের গতি। কিন্তু জীবমাত্রই আপন পারিপার্শ্বিক অবস্থার এতই উপযোগী, যে, সেই অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে, যেখানে যেরূপ সন্তানের অধিক প্রয়োজন, সেখানে সেইরূপ সন্তানই অধিক জন্মে। যে জাতির আহার্য্যের অপ্রতুল নাই, তাহাদের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি জাতির পক্ষে হিতকর। যাহাদের আহার্য্যের অপ্রতুল আছে, তাহাদের পক্ষে প্রজাবৃদ্ধি বিশেষ অনিষ্টগর্ভ—ইহার অনিবার্য্য ফল, চির-সংগ্রাম বা চির-অভাব। কিন্তু, সন্তানসংখ্যার ন্যূনাধিক্য স্ত্রীসংখ্যার ন্যূনাধিক্যের উপর নির্ভর করে—গর্ভধারণের লোক অধিক না থাকিলে অধিক সন্তান জন্মিতে পারে না। সেইজন্য দেখা যায় যে, যেখানে আহার্য্য প্রচুর এবং সহজলভ্য, সেখানে কন্যাসন্তান অধিক জন্মে। যেখানে আহার্য্য অপ্রচুর এবং দুর্লভ, সেখানে অধিক পুত্রসন্তান জন্মে। খাদ্যের প্রাচুর্য্যের স্থলে যে কন্যাসন্তান অধিক জন্মে, এবং অপ্রাচুর্য্যের স্থলে যে পুত্রসন্তান অধিক জন্মে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। নগরবাসীদিগের তুলনায় পল্লিবাসীরা যে সাধারণতঃ দরিদ্র, একথা বোধ

স্বীকার কেহই অস্বীকার করিবে না। পল্লিবাসী জনসাধারণ স্বাস্থ্যকর আহার্য্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হয় না; সেরূপ সঙ্গতি তাহাদের নাই। কিন্তু নগরে স্বাস্থ্যকর আহার্য্যের অপ্রতুল নাই, এবং নগরবাসীদিগের আর্থিক অবস্থা ভাল বলিয়া তাহারা তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারে; এবং ইহা একটি অবিসম্বাদিত সত্য, যে, পল্লিগ্রামে অধিক সংখ্যক পুত্রসন্তান এবং নগরে অধিক সংখ্যক কন্যাসন্তান জন্মে। সমাজতত্ত্ববিদেরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সমাজে যে সকল শ্রেণীর লোক সঙ্গতিশালী, তাহাদের মধ্যে কন্যাসন্তান অধিক জন্মে; যাহারা দরিদ্র, তাহাদের মধ্যে পুত্রসন্তান অধিক জন্মে। এই কারণেই বোধ হয় সমতল প্রদেশ অপেক্ষা পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিক সংখ্যক পুত্রসন্তান জন্মে, কেননা পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক সাধারণতঃ দরিদ্র।

কন্যাহত্যার ন্যায় দারিদ্র্য হইতেও এই দ্বিবিধ কারণে সমাজমধ্যে স্ত্রীসংখ্যার অল্পতা ঘটে। ইহা ছাড়া আরও দুই একটি কারণ আছে। অসভ্য সমাজে সংসারের শ্রমসাধ্য সকল কাজ স্ত্রীলোকদিগকেই করিতে হয় এবং অতিশ্রমে তাহাদের অকাল-মৃত্যু সচরাচরই ঘটে। টুংথা জাতির সম্বন্ধে কাপ্তেন লিউইন্ লিখিয়াছেন যে, ইহাদের পুরুষেরা খুব দীর্ঘজীবী, কিন্তু অবিশ্রাম কঠোর শ্রমে স্ত্রীলোক অল্প বয়সেই মরিয়া যায়। কুচিনদিগের সম্বন্ধে কার্বি সাহেবও ঠিক এই কথা লিখিয়াছেন। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য সমাজে যাহারা ক্ষমতাশালী বা সঙ্গতিসম্পন্ন, তাহারা আপন ইচ্ছা ও ক্ষমতানুসারে বহুসংখ্যক স্ত্রী আত্মসাৎ করে। এই সকল কারণে সমাজমধ্যে জনসাধারণের পক্ষে বিবাহযোগ্য স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়া যায়। সকলকে স্ত্রীলাভ করিতে হইলে বহুপত্ন্যাত্মক বিবাহপ্রণালী অবলম্বন

ব্যতীত আর উপায় থাকে না। ইহা না করিলে ব্যভিচার স্রোত অযথা প্রবল হয়, এবং তদানুসঙ্গিক কলহ বিবাদ মারামারি কাটা-কাটিতে সমাজ উৎসন্ন হইয়া যায়। বহুপত্যাত্মক বিবাহের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা যে এইরূপে হয়, তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, যে সকল প্রদেশে এই প্রণালীর বিবাহ প্রচলিত আছে, সেই সকল প্রদেশই হয় অত্যন্ত অমুর্ব্বর এবং দরিদ্র, অথবা সেখানে কন্যা-হত্যা প্রথা প্রচলিত আছে বা পূর্ব্বে ছিল।

আলোচনা।

নূতন সংস্করণ।

নব্য হিন্দুদের বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা উন-বিংশ শতাব্দীর নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া, পুরাতনের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা হারান নাই বটে, কিন্তু রুচির পরিবর্ত্তন হওয়াতে তাঁহারা উহাকে অধুনাতনের সঞ্চিত মলিন আবরণশুদ্ধ গ্রহণ করিতে বড়ই কুণ্ঠিত।

মনুষ্যজীবনকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কবিত্বময় কল্পনার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উহাকে সংসারের দৈনিক বৈষয়িক ভাবনার কালুষ্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য্য ও আবশ্যকতা বুঝিয়াও, সেগুলিকে তাহাদের আধুনিক অর্থশূন্য কবিত্ববিহীন অসুন্দর আকারে অবলম্বন করিতে তাঁহারা কিছুতেই প্রস্তুত নহেন।

সম্প্রতি বোম্বাই অঞ্চলের একদল নব্য হিন্দু এই সমস্যা মীমাং-

শার যেরূপ উপায় স্থির করিয়াছেন তাহা পাঠকদের বিবেচনার নিমিত্ত বিবৃত করা যাইতেছে। তাঁহারা পুরাতন গঠনের আদিম সৌন্দর্য্যকে তাহার হীন ও মলিন বেশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিতে চাহেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও উপায় স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

রাম নবমীর দিনে রামকে দেবতারূপে পূজা করায়, দেবাধিদেব পরমেশ্বরের মহিমা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের সাহিত্য-মর্য্যাদা যুগপৎ খর্ব্ব হওয়াতে তাঁহারা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু রাম-নবমীর দিন উৎসবে যোগ না দিয়া প্রচলিত কুসংস্কারকে গালি দিয়া তাঁহারা কোন সান্ত্বনা অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত শুভদিবস উপলক্ষ্যে উৎসবক্ষেত্রে সকলে উপস্থিত হইয়া, ভোজনাদি আমোদ প্রমোদরূপ উৎসবের বাহ্য অঙ্গের পরে, কথকতা কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা রামায়ণের কবিত্ব-রসাস্বাদন করিবেন এবং প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনাদির দ্বারা উহার সাহিত্যনৈপুণ্য ও নীতি-মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন।

শ্রাবণ মাসের দিনবিশেষে ব্রাহ্মণদের পুরাতন উপবীত পরি-ত্যাগ করিয়া নূতন উপবীত গ্রহণ করিবার রীতি আছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা প্রভাবে, এইরূপ সূত্রগুচ্ছ পরিবর্ত্তন এবং তাহার সহিত মন্ত্র উচ্চারণ ও পুরোহিতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিলেও তাঁহারা কোন প্রকার আমোদ বা তৃপ্তি অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহারা এই দিবসকে মহৎ সঙ্কল্প স্থির করিবার ও ব্রত গ্রহণ করিবার কার্য্যে উৎসর্গ করিতে চাহেন; একত্র মিলিত হইয়া স্মরণ করিতে চাহেন যে গলায় উপবীতধারণ করিয়া নিজেকে সর্ব্বোচ্চ জাতির মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করা কি দারুণ দাম্ভিকতার কাজ; এবং বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এই একবার

অনুভব করিতে চাহেন যে, যে পবিত্র উপবীত পূর্ব্ব মহর্ষিরা ধারণ করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত হইতে গেলে, অতি বিনীত ভাবে নিজ হীনতা স্বীকার করিয়া, ব্রাহ্মণ জন্মের সুমহৎ দায়িত্ব বুঝিয়া জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সত্যের ও মহত্বের প্রতি কায়মনোবাক্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

বোম্বাইয়ের নব্য হিন্দু সম্প্রদায় এইরূপে প্রত্যেক উৎসব ও পবিত্র দিবসকে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। উল্লিখিত সমস্যার এইরূপ সুন্দর মীমাংসা আমাদের দেশে প্রচলিত হইবার উপযুক্ত। আমাদেরও প্রত্যেক শুভকার্য্যের সহিত যে সকল সুরুচিবিরুদ্ধ ও অপ্রীতিকর প্রথা জড়িত আছে তাহা পরিত্যাগ করিলে নব্য হিন্দুরা নব উৎসাহে সেগুলিতে যোগ দিতে পারেন।

জাতিভেদ।

ষ্টেট্স্ম্যান্ পত্রে কিছু দিন ধরিয়া জাতিভেদ ও বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

দেখা গিয়াছে, লেখকদিগের মধ্যে অনেকে এই বলিয়া আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথার সমর্থন করিয়াছেন যে, য়ুরোপ প্রভৃতি অন্য সকল সভ্য দেশেই নানা আকারে জাতিভেদ বিরাজ করিতেছে।

সভ্য মনুষ্য যেমন ইট কাঠের ঘরে থাকে, তেমনি তাহার সামাজিক ঘর আছে; সেই ঘরগুলির নাম সম্প্রদায়। সামাজিক মনুষ্য দেখিতে দেখিতে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তাহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সভা, সমিতি, ধর্ম্মসম্প্রদায়, রাজনৈতিক সম্প্রদায়, আচারগত সম্প্রদায়,—বৃহৎ সমাজমাত্রেই এমন নানা-

বিধ বিভাগের সৃষ্টি হয়। যে মূল নিয়মের প্রবর্ত্তনায় মানুষ সমাজ-বন্ধনে বদ্ধ হয়, সেই নিয়মেরই প্রভাব সমাজের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে কার্য্য করিয়া তাহার মধ্যে স্বভাবতই বিচিত্র শ্রেণীভেদ জন্মাইতে থাকে। সমাজবন্ধনের ন্যায় সম্প্রদায়বন্ধনও মানুষের স্বাভাবিক গৃহ, তাহার আশ্রয়স্থল।

কিন্তু গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেমন ছাদ প্রাচীর গাঁথিতে হয়, তেমনি দরজা জান্‌লা বসানও অত্যাবশ্যক। গৃহ যেমন কতক অংশে বদ্ধ, তেমনি তাহা কতক অংশে মুক্ত। এই জানলা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে গৃহ গোরস্থানে পরিণত হয়। উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

সম্প্রদায়-গৃহের মধ্যেও যাতায়াতের দ্বার থাকা চাই; ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার ও বাহির হইতে ভিতরে আসিবার পথ থাকিলে তবেই তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা হয় নতুবা তাহা মৃত্যুর আবাস-ভূমি হইয়া উঠে।

য়ুরোপে বিশেষ গুণ বা কীর্ত্তিদ্বারা সাধারণ শ্রেণীর লোক অভিজাতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের দেশে জন্ম ব্যতীত জাতিবিশেষের মধ্যে অন্য কোনরূপ প্রবেশোপায় নাই।

প্রতিবাদকারীগণ বলেন, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না, এবং দেশের স্বাধীন রাজা থাকিলে এরূপ থাকিত না। কিন্তু এ বৃথা তর্কে আমাদের লাভই বা কি, সান্ত্বনাই বা কোথায়?

বিবাহে পণগ্রহণ।

পুরুষ যখন কোন বিশেষ কন্যাকে বিবাহ করে অবশ্যই তাহার কোন বিশেষ কারণ থাকে। হয়, তাহাকে ভালবাসে,

নয়, তাহার কুলশীল রূপগুণ অথবা অর্থের আকর্ষণে বদ্ধ হয়। আমাদের দেশে বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়স অল্প, এবং তাহার সহিত বিবাহযোগ্য পুরুষের পরিচয় থাকে না সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে ভালবাসার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কন্যার কি কি গুণ আছে এবং কালক্রমে কি কি গুণ ফুটিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা, তাহা কেবল কন্যাকর্ত্তারা এবং অন্তর্যামীই জানেন। রূপ জিনিষটা দুর্লভ এবং বাল্য-সৌন্দর্য্য যুবকের চিত্তে অনতিক্রমণীয় মোহসঞ্চার করে না। আজকালকার ছেলেদের কাছে কুলগৌরবের বিশেষ কোন মর্য্যাদা নাই। তবে একজন বুদ্ধিমান্ জীব কি দেখিয়া আমৃত্যু কালের জন্য সংসারভার মাথায় তুলিয়া লইবে? সে কি পঞ্জিকার বিশেষ একটা দিনস্থির করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া যে কোন কন্যাকে সম্মুখে দেখিবে তাহাকেই বিবাহ করিবে? সে কি কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যাভার মোচনের জন্যই সংসারে আগমন করিয়াছিল?

মনুর বিধানের ফলে আমাদের দেশে একটি বিবাহযোগ্য পুরুষকে যখন কন্যার পিতা দশজনে আসিয়া আক্রমণ করে তখন তাহাকে কোন একটা বিশেষ সদ্বিবেচনার নিয়ম অবলম্বন করিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইবে—যদি তাহা না করে তবে সে গর্দ্দভ, এবং দশটি কন্যাদায়িকেরই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র অথবা বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে বিবাহের ফাঁদে ফেলিবার জন্য টানাটানি চলিতে থাকে। তখন তাহার সম্মুখে তরঙ্গসঙ্কুল অকূল সংসার, এবং সেই সঙ্কট সমুদ্রে পার হইবার উপায় অর্থ তরণী। তুমি নিজের স্কন্ধ হইতে একটি ভার লইয়া আর একটি বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট জীবের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে ঐ অকূল সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া

দিতে চাও; সে সহজেই বলিতে পারে, আগে নৌকার সন্ধান দাও তাহার পরে তোমার বোঝাটি লইয়া আমি এই পারাবারে অবতীর্ণ হইতে পারি নতুবা ওটিকে কাঁধে করিয়া আমি সন্তরণ করিতে পারিব না—আজকালকার দিনে নিজের ভার সম্বরণ করাই দুঃসাধ্য।

এই প্রস্তাবের জন্য ছেলেটিকে নিন্দা করা যায় না। অথচ যে সম্বন্ধ চিরজীবনের নিকটতম সম্বন্ধ আরম্ভকালেই সে সম্বন্ধকে ইতর দোকানদারীর দ্বারা কলুষিত করিয়া তুলিতে আত্মসম্মানজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই ধিক্কার অনুভব করা স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীতে সকল সম্বন্ধের মূলেই হয়, প্রীতি, নয়, স্বার্থ। যেখানে প্রীতিসম্বন্ধের পথ নাই সেখানে স্বার্থ সম্বন্ধ ব্যতীত কি আশা করিতে পারি!

অতএব, দোষ দিতে হইলে সমাজবিধানকেই দোষ দিতে হয়, যে ব্যক্তি পণ লইয়া বিবাহ করে তাহাকে নহে। একটু সবুর কর, যুবকটিকে নিজের চেষ্টায় ও উপার্জ্জনে স্বাধীন হইতে দাও, তাহার পরে সে যখন নিজের হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে তখন যদি টাকার জন্য হাত বাড়াইয়া বসে তবে তাহাকে নির্লজ্জ অভদ্র অর্থলোলুপ অযোগ্য বলিয়া তিরস্কার করিতে পার। যতক্ষণ তাহার পক্ষে কোন বিশেষ আকর্ষণ নাই এবং তোমার পক্ষে স্বার্থ, ততক্ষণ স্বার্থের বিনিময়েই স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে হইবে ইহাই সংসারের নিয়ম। এ নিয়মকে কোন আইন অথবা আবদারের দ্বারা পরাহত করা সম্ভাবনা নহে।

ইংরাজের কাপুরুষতা।

আসানসোল্ ষ্টেষনে একটি দেশীয় বালিকার প্রতি পাশব অত্যাচার করা অপরাধে কয়েকজন রেলওয়ে সংক্রান্ত ইংরাজ

অথবা ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী অভিযুক্ত হয়। হাজির আসামীগণ জুরির বিচারে খালাস পাইয়াছে। এ সংবাদ যে কোন ভারতবর্ষীয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে সকলেরই অন্তর্দাহ উপস্থিত করিয়াছে।

আমাদের ধারণা ছিল, বলিষ্ঠ স্বভাববশতঃ অবলাজাতির প্রতি ইংরাজ পুরুষের একটি বিশেষ স্নেহ আছে। কিন্তু উক্ত নিদারুণ পাশবাচারে ভারতবর্ষীয় ইংরাজের পক্ষ হইতে যখন তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, অপরিসীম বিজাতিবিদ্বেষে ও উচ্ছৃঙ্খল প্রভুত্বগর্ব্বে বীরজাতিরও পৌরুষ নষ্ট করে।

আমাদের প্রভুরা বলিতে পারেন, আইনমতে যাহার বিচার হইয়াছে তাহার উপরে আর কথা কি! ধরিয়া লইলাম সুবিচার করা হইয়াছে, আইন এবং অভিযুক্ত ইংরাজ উভয়েই রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু দেশের ইংরাজ এবং সমস্ত ইংরাজি সংবাদপত্র এসম্বন্ধে এমন নীরব উদাসীন কেন? এ ঘটনায় তাঁহাদের মনে তিলমাত্র ঘৃণা রোষের উদ্রেক হয় নাই? বালিকা যদি ইংরাজ ও উপদ্রবকারী যদি দেশীয় হইত তাহা হইলে ভারত জুড়িয়া তাঁহারা যেরূপ তুরি ভেরি পটহ নিনাদ করিয়া ভীষণ রণবাদ্য বাজাইতেন ততটা নাই আশা করিলাম কিন্তু কাহারও মুখে যে একটি শব্দ মাত্র নাই।

দুর্গম চিত্রলের যুদ্ধ জয় লইয়া ইংরাজ দেশে বিদেশে বীরত্বের আস্ফালন করিতেছেন; কিন্তু নিঃসহায় রমণীর প্রতি নির্দ্দয়তম অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ যে আন্তরিক কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছেন যুদ্ধজয়গৌরবের অপেক্ষা তাহা অনেকগুণে গুরুতর। চিত্রল জয় করিয়া তাঁহারা শত্রুকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিরুপায় অধীন জাতির প্রতি

এইরূপ মনুষ্যত্ববিহীন অবজ্ঞার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা আপন রাজ্যতন্ত্রের ভিত্তিমূলে স্বহস্তে পরম শত্রুতার বীজ রোপণ করিয়া রাখিতেছেন।

নগর-সংগীত।

কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত
নব নির্ম্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বলনীল বসনপ্রান্ত
সুন্দর শুভ ধরণী!
আকাশ আলোক-পুলকপুঞ্জ,
ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ,
কোথা নিয়ে এল তরণী!
ওইরে নগরী, জনতারণ্য,
শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি, কতই পণ্য
কত কোলাহল-কাকলি!
কত না অর্থ, কত অনর্থ
আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত্য,
তপনতপ্ত ধুলি-আবর্ত্ত
উঠিছে শূন্য আকুলি'।
সকলি ক্ষণিক, খণ্ড, ছিন্ন,
পশ্চাতে কিছু রাখেনা চিহ্ন,

পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন,
ছুটিছে মৃত্যু-পাথারে।
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য,
প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য,
চলিছে কাতারে কাতারে।
স্থির নহে কিছু নিমেষ মাত্র,
চাহেনাক পিছু প্রবাসযাত্র,
বিরামবিহীন দিবসরাত্র
চলিছে আঁধারে আলোকে।
কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,
তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত
ছুটেছে বৃদ্ধ বালকে।
এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড,
আকাশে আলোড়ি' শিখার শুণ্ড
হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড
ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া।
নরনারী সবে আসিয়া তূর্ণ,
প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ
বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ
জীবন আহুতি ঢালিয়া।
চারিদিকে ঘিরি যতেক ভক্ত,
—স্বর্ণবরণ-মরণাসক্ত—

দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত,
সকল শক্তি সাধনা।
জ্বলি' উঠে শিখা ভীষণ মন্দ্রে,
ধূমায়ে শূন্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে ;
লুপ্ত করিছে সূর্য্য চন্দ্রে
বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।
বায়ু দলবল হইয়া ক্ষিপ্ত
ঘিরি ঘিরি সেই অনল দীপ্ত
কাঁদিয়া ফিরিছে অপরিতৃপ্ত,
ফুঁসিয়া উষ্ণ শ্বসনে।
যেন প্রসারিয়া কাতর পক্ষ
কেঁদে উড়ে আসে লক্ষ লক্ষ
পক্ষী জননী, করিয়া লক্ষ্য
খাণ্ডব-হুত-অশনে!
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র,
মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র
খুলেছে জীবন-যজ্ঞ রুদ্র
আবাল-বৃদ্ধ রমণী।
হেরি এ বিপুল দহন-রঙ্গ
আকুল হৃদয় যেন পতঙ্গ,
ঢালিবারে চাহে আপন অঙ্গ
কাটিবারে চাহে ধমনী।

হে নগরী, তব ফেনিল মদ্য
উছসি' উছলি' পড়িছে সদ্য,

যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে!
আমি নির্ম্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।
মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী
আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি,
রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি,
কোন ভেদ নাহি উভয়ে।
ধনসম্পদ করিব নস্য,
লুণ্ঠন করি আনিব শস্য,
অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব
ছুটাব বিশ্বে অভয়ে!
নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা,
নিত্যনূতন কর্ম্মনিষ্ঠা,
জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা
উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল কুটিল চলেছে পন্থ,
নাহি তার আদি, নাহিক অন্ত,
উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত,
সিন্ধু শৈল সরিতে।
শুধু সম্মুখ চলেছি লক্ষ্যি'
আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,

অনর্থক নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনা করা ভালও বলি না, তাহাতে আমাদের সাহসও হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষ কারণে জড়পদার্থ শব্দটা ব্যবহার করিতে পারি না। কারণ, জড়ত্ব "ম্যাটারের" একটি বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত; কিন্তু ম্যাটারের গুণগুলি সম্বন্ধে যখন তর্ক উঠিতে পারে তখন উহার এমন কোন নাম দেওয়া উচিত যাহা বিশেষ গুণবাচক নহে। আমরা সে জন্য আশান্বিত চিত্তে সাহিত্যপরিষদ সভার পারিভাষিক সমিতির মুখ চাহিয়া রহিলাম; আপাততঃ আমাদের এই হাতের কাজটি উদ্ধার করিবার জন্য ম্যাটার শব্দের তর্জ্জমাস্থলে "বস্তু পদার্থ" শব্দটি ব্যবহার করিলাম।

এক সময়ে বস্তু পদার্থটা স্থূল জড় অকর্ম্মণ্য বলিয়াই গণ্য ছিল। তখন ফোর্স্ অর্থাৎ শক্তির খ্যাতির সীমা ছিল না। লোকে বলিত বস্তু মহাদেবের মত নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে এবং শক্তিই মহামায়ার ন্যায় তাহার বক্ষ আশ্রয় করিয়া কাজ করে, নৃত্য করে। আলোক, উত্তাপ, তাড়িতশক্তি, রাসায়নিক আসক্তি, প্রাণশক্তি, ইহারাই অক্ষম বস্তুপদার্থের উপর ভর করিয়া তাহাকে বিচিত্রভাবে চালনা করে। গুরুত্বধর্ম্ম নামক যে ধর্ম্মবশতঃ জগতের প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণুকে আকর্ষণ করে, তাহা আকর্ষণ শক্তি নামক এক বিশেষ শক্তির কার্য্য বলিয়া কথিত হইত। চুম্বকধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল। উত্তাপ ব্যাপারটা কি ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা "ক্যালরিক" নামক একটা ভারবিহীন কিম্ভূত পদার্থের কল্পনা করিয়াছিলেন; স্থির করিয়াছিলেন বস্তুপদার্থ এই ক্যালরিককে শোষণ করিয়া উত্তপ্ত ও ত্যাগ করিয়া শীতল হয়।

এমন সময় বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ডেভি এবং কাউন্ট্

স্বতন্ত্র জাতিভেদ নাই, সকলই উক্ত ঈথরের তরঙ্গ। ঈথরের সকল তরঙ্গই উত্তাপ চালনা করে, এবং তাহার সকল তরঙ্গই ফোটোগ্রাফের কাচফলকের উপর রাসায়নিক কার্য্য করিয়া থাকে। আর যেটাকে আমরা আলোক বলি সেটা আমাদের চক্ষুর ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মমাত্র; অর্থাৎ আমাদের চক্ষু না থাকিলেও ঈথরের তরঙ্গ থাকে, কিন্তু সে তরঙ্গ আলোক নামক একটা ইন্দ্রিয়বোধ উৎপন্ন করিতে পারে না। অতএব আলোক আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র; পদার্থ-বিজ্ঞানের সহিত বস্তুতঃ উহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই কারণেই অধ্যাপক নিয়ুকোম্ব আলোক শব্দটাকে পদার্থবিজ্ঞান হইতে নির্ব্বা-সিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

এখন দেখা যাইতেছে, বস্তুর পরমাণুগুলির কম্পনগতিই উত্তাপ; সেই কম্পনগতি চারিদিকের ঈথরকে আন্দোলিত করিয়া দেয়, সেই আন্দোলনকে ঈথর্ ঢেউয়ের আকারে এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে সঞ্চারিত করিয়া দিতে থাকে।

ঈথরের ঢেউগুলির মধ্যে প্রভেদ কেবল এই আছে, যে, তাহার কোনটি হ্রস্ব কোনটি দীর্ঘ। বস্তুর পরমাণুগুলির স্পন্দন যদি অপেক্ষাকৃত ধীরে হয় তবে সেই স্পন্দনের আঘাতে ঈথরের ঢেউগুলি দীর্ঘতর হয়, আর যদি স্পন্দন দ্রুততর হয় তবে সেই আঘাতে ঢেউগুলি হ্রস্বতর হইতে থাকে। এই ভিন্ন ভিন্ন ঢেউ-গুলি আপন হ্রস্ব দীর্ঘতার প্রভেদ অনুসারে নানাবস্তুর উপর নানা প্রকারের ক্রিয়া উৎপাদন করে। মূল কথাটা এই যে, বস্তুপদার্থেরই স্পন্দন উদ্যম (vibratory energy) ঈথরে তরঙ্গ আকারে পরিণত হয়।

পূর্ব্বে, বৈদ্যুৎ ব্যাপারকেও একটা স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক শক্তির কার্য্য বলিয়া প্রচার করা হইত। পণ্ডিত ম্যাক্স্‌ওয়েলের সময়

অর্থাৎ, সে সক্রিয়, সে নিজের বলেই বিচিত্র কাজ করিতে পারে।

অনেকে মনে করেন, বস্তুমাত্রেই কাঠিন্য ঘনত্ব প্রভৃতি গুণ আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে গুলি বস্তুর পরমাণুর গুণ নহে, পরমাণুদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুণ। পরমাণুদের কাঠিন্য আছে এমন কথা বলা যায় না; অণুগুলির মধ্যে পরস্পর সংসক্তির মাত্রা অনুসারে তাহারা যতই দৃঢ়ভাবে পিণ্ড বাঁধে, ততই তাহার মধ্যে আমরা কাঠিন্য অনুভব করি।

পণ্ডিতেরা প্রায় সত্তর রকমের বস্তুপদার্থ বাহির করিয়াছেন, তাহাদিগকে রূঢ়পদার্থ (elements) নাম দেওয়া হইয়াছে। আমরা যত কিছু বস্তু জানি তাহা এই সকল রূঢ়পদার্থ অথবা তাহাদের মিলন মিশ্রন মাত্র। এই রূঢ় পদার্থগুলি প্রত্যেকেই আপন বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা অন্য সকলগুলি হইতেই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ কি? ইহাদের পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত একথা বিজ্ঞানে অথবা দর্শনে সঙ্গত জ্ঞান করে না; পরমাণুগুলির আকার ও আয়তনের ভেদ বশতঃ এই স্বাতন্ত্র্য, তাহাও মনে লয় না; কারণ, একটা পাথরকে যত রকম বিচিত্র আকার ও বিভিন্ন আয়তনে ভাগ করা যাক্ না কেন, তাহার প্রত্যেক টুক্‌রার আপেক্ষিক ঘনত্ব সমানই থাকিবে; অতএব এই রূঢ় পদার্থগুলির পরমাণুর আকার আয়তনভেদে তাহাদের গুণগত ভেদ জন্মিয়াছে একথা উপযুক্ত বোধ হয় না।

বোধ করি, রূঢ়বস্তুপদার্থের বিভিন্নতার মধ্যে ঈথরের কোন হাত থাকিতে পারে। যখন দেখা যাইতেছে বস্তু পদার্থের সহিত ঈথরের একটা ঘনিষ্ঠ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যোগ আছে তখন তাহাদের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এবং পূর্ব্বোক্ত রূঢ় বস্তু পদার্থের ভিন্নতাটা, বস্তুর সহিত ঈথরের বিশেষ রূপ সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে তাহাও প্রতীত হয়।

বস্তুর সহিত ঈথরের সম্বন্ধটা কি প্রকারের সে বিষয়েও একটা বিশেষ মত আছে। সে মতটার নাম আবর্ত্তচক্রবাদ (Vortex-ring theory)। এই মতের পক্ষে প্রমাণ প্রতিদিনই প্রবল হইতেছে এবং ইহার প্রতিকূলে এপর্য্যন্ত কোনরূপ প্রামাণ্য যুক্তি পাওয়া যায় নাই।

এই মতবাদে বলিতেছে পরমাণুগুলি ঈথরের মধ্যে ঈথরের আবর্ত্তচক্র। স্রোতের জলের মধ্যে নাভি-আকারের যেমন ছোট ছোট ঘূর্ণী দেখা যায় সেইরূপ। কিন্তু বস্তুর পরমাণু যদি ঈথরের আবর্ত্তচক্র হইবে তবে তাহারা ধ্বংসহীনরূপে চিরস্থায়ী থাকে কেন? তাহার কারণ, ঈথর পদার্থের মধ্যে লেশমাত্র সংঘর্ষ নাই, সেই জন্য তাহার মধ্যে একবার ঘূর্ণা উৎপন্ন হইলে অনন্তকালে তাহার ধ্বংসের কোন কারণ থাকে না। জলের সংঘর্ষে জলের ঘূর্ণাবেগ প্রতিমুহূর্ত্তে বাধা পাইয়া শেষকালে থামিয়া যায়, ঘূর্ণাবাতাস সম্বন্ধেও সে কথা খাটে, কিন্তু ঈথর সম্পূর্ণরূপ সংঘর্ষহীন পদার্থ।

এই পরমাণুরূপী আবর্ত্তচক্রগুলির আকার আছে, স্থিতিস্থাপকতা আছে, ঈথরের উপর কাজ করিবার ও ঈথরের দ্বারা ক্রিয়াবান্ হইবার ক্ষমতা আছে। ফলতঃ তাহারা মূর্ত্তিমান্ উদ্যমমাত্র; এমন কি, তাহাদের হইতে উদ্যমটি উঠাইয়া লইলে কেবল মুক্ত ঈথরমাত্র থাকে; তাহার স্বতন্ত্র কোন ধর্ম্ম থাকে না।

এই মতঅনুসারে বস্তু পদার্থকে কোন ক্রমেই জড়পদার্থ বলা যায় না, বরঞ্চ তাহার বিপরীত। একটা উদ্যমমাত্রকে যদি জড় নামে অভিহিত করা যায় তবে এমন অন্যায় লাইবেল্ আর কি

হইতে পারে? বলা আবশ্যক এই ঈথরের প্রকৃতি, এবং বস্তু-বিশেষে কতখানি ঈথর কি পরিমাণ বেগে ঘুরিতেছে তাহা এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

ঈথর সম্বন্ধে সাধারণতঃ কথিত হয়, যে, তাহা মহাকাশব্যাপী, সংঘর্ষহীন, পরমাণুহীন, অখণ্ড, একাকার, কঠিন এবং বহমান (fluid) উভয়বিধ পদার্থের ন্যায়ই কর্ম্ম করিতে সক্ষম, তাহাতে টান পড়িতে পারে. তাহা স্পন্দনউদ্যমকে এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে, এবং গুরুত্বউদ্যমকে তদপেক্ষা দশ লক্ষ গুণ বেগে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারে, অথচ কোন রূপে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না।

এই ঈথরকে মনে মনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম বস্তুরূপে কল্পনা করা মহাভ্রম। তাহাতে বস্তুত্ব কিছুই নাই। পরমাণুর সাধারণ ধর্ম্ম যে গুরুত্ব, *তাহা ঈথরে লেশমাত্র লক্ষিত হয় না। ভারত্বের প্রথম* নিয়ম এই যে, জগতের প্রত্যেক কণা অপর সমস্ত কণাকে আকর্ষণ করে। যদি দেখা যায় জগতে এমন কোন পদার্থ আছে যাহা একেবারেই এই আকর্ষণের অধীন নহে তাহাকে কোন মতেই বস্তু বলা যায় না।

যদি আবর্ত্তচক্রবাদ সত্য হয় তবে একথা স্বীকার করিতে হয় বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে ঈথর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সে ঈথরে আবর্ত্ত জন্মিল কি করিয়া? যাহার ভার নাই, সংঘর্ষ নাই, তাহাতে আবর্ত্ত গতির সঞ্চার কোন প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা বুঝা যায় না; আর একটি কোন স্বতন্ত্র জাতীয় কারণ স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

যাহাই হোক, আবর্ত্তচক্রবাদ সত্য হোক বা না হোক এ কথা নিশ্চয় যে, বস্তুপদার্থ নিষ্ক্রিয় জড় ধর্ম্মাবলম্বী নহে, এবং ঈথরের

ধর্ম্ম বস্তুর ধর্ম্মের দ্বারা কোন রূপে অনুমেয় নহে। বস্তুরও সমস্ত গুণগুলি আমরা ভাল করিয়া জানিনা। এমন স্থলে বস্তু ও ঈশ্বরের শক্তিসীমা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিয়া দিবার কোন উপায় নাই।

গ্রন্থ সমালোচনা।

কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বিদ্যাপতির এবং সংক্ষেপে অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব কবির জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে যতগুলি আলোচনা বাহির হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার সকলগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। বক্ষ্যমান বিষয় সম্বন্ধে আমাদের নিজের ভালরূপ অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসজ্ঞ ত্রৈলোক্যবাবু এই গ্রন্থে যেরূপ সতর্কতা ও ভূয়োদর্শন সহকারে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে সাহসপূর্ব্বক তাঁহার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন কবির জীবনী স্বতন্ত্র ভাগ না করিয়া দেওয়াতে ইচ্ছামত বিষয় খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ হইয়াছে;—গ্রন্থে একখানি সূচিপত্র থাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

প্রসঙ্গমালা। মূল্য চারি আনা। }
মনোহর পাঠ। মূল্য ছয় আনা } শ্রীহরনাথ বসুপ্রণীত।

এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থ দুটি-নীতিপ্রসঙ্গ, প্রাণীপ্রসঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বিভক্ত। বিষয়গুলি সরস করিয়া লেখাতে এই দুইখানি পুস্তক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের মনোরম হইয়াছে সন্দেহ নাই। গল্পগুলির অধিকাংশই আমাদের দেশীয় গল্প হইলে ভাল হইত। প্রসঙ্গমালায় "স্পষ্টবাদিতা" নামক গল্পে যে একটু কৌতুক-কৌশল আছে তাহা বালক বালিকাদের বোধগম্য হইবে না। গ্রন্থ দুই-খানি বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার উপযোগী হইয়াছে কেবল আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে ভূরি পরিমাণ ছাপার ভুল সংশোধিত হইবে।

ন্যায় দর্শন। গৌতমসূত্র, নূতন টীকা, বঙ্গ ভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা। ১

এতৎশীর্ষক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। কেন না, এ যাবৎ বাঙ্গলা ভাষায় গোতমের ন্যায় অনুবাদিত হয় নাই এবং উহার নূতন টীকাও এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। ভরসা করি, এই পুস্তক প্রচারিত হইলে সাহিত্য সংসারের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

অনেক বঙ্গীয় পাঠক (যাহারা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন নহেন) গোতমের ন্যায় কি রূপ তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন, এই পুস্তকের দ্বারা তাঁহাদের সে ইচ্ছা বহু পরিমাণে পূর্ণ হওয়া সুসম্ভব।

গৌতমের সূত্রনিচয় আমাদের সমালোচ্য নহে। নূতন টীকাও তাহার বাঙ্গালা ভাষার ব্যাখ্যা সমালোচ্য হইলেও ন্যায় বিষয়ে অল্পাধিকার থাকায় আমরা ঐ দুই অংশের যথোচিত সমালোচনা

১ সুশিক্ষিত সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে ও উদ্যোগে শ্রী কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ির দ্বারা বরাহ নগরে প্রকাশিত ॥

অর্থাৎ গুণদোষ বিচার করিতে অক্ষম। তবে পুস্তক পাঠে যাহা বোধগম্য হইয়াছে তাহা সাধারণ সমক্ষে ব্যক্ত করা দোষাবহ নহে বিবেচনায় ঐ দুই বিষয়ে অল্প কিছু বলিলাম।

কোন গভীর বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে গেলে যে দোষের সম্ভাবনা থাকে সে দোষ ব্যতীত অন্য কোন দোষ প্রাপ্ত ন্যায়দর্শনের নূতন টীকায় লক্ষিত হইল না। নূতন টীকার ভাষাটী বিশেষ সুখবোধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা ব্যাখ্যাও বিশেষ মনোরম ও নির্দ্দোষ হইয়াছে। প্রাচীন টীকাকারেরা যে রীতিতে শব্দ বিন্যাস করিতেন, ন্যায় দর্শনের টীকা যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ না হইলেও সাধারণতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, নূতন টীকাটী মন্দ হয় নাই। কেন না, কোথাও পদার্থের বৈপরীত্য ঘটনা হয় নাই। চতুরস্রা বুদ্ধির অথবা বহুদর্শনের অভাবে যে সকল গুণের অভাব হইয়াছে, তাহার একটী এই –

টীকালেখক প্রথম সূত্রের টীকায় "প্রমাণপ্রমেয়াদীনাং ষোড়শ পদার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ অসাধারণধর্ম্মপ্রকারেণাবধারণাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ মোক্ষপ্রাপ্তি র্ভবতীত্যর্থঃ" এই মাত্র লিখিয়াছেন। এই স্থানে অন্ততঃ এরূপ একটা কথা লেখা উচিত ছিল যে, বস্তুতস্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞানাদেব মোক্ষঃ। কেননা, আত্মাতিরিক্ত প্রমেয়ের জ্ঞানে মোক্ষ হয় না, একথা বোধ হয় সকল লোকেই জানে। দেখুন উক্ত সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যায় কেমন সুসমঞ্জস কথা আছে।

"যদি পুনঃ প্রমাণাদিপদার্থতত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সং স্যাৎন মোক্ষ্যমাণা মোক্ষায় ঘটেরন্। নহি কস্যচিৎ কচিচ্চ তত্ত্বজ্ঞানং নাস্তীতি। তস্মাৎ আত্মাদ্যেব প্রমেয়ং মুমুক্ষুণাং জ্ঞেয়ম্ ইতি।" বার্ত্তিক

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অতি সমঞ্জসরূপে ঐ কথার সঙ্গতার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থং যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্। ইহ তু অধ্যাত্ম-বিদ্যায়াং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ অপবর্গঃ।"

বার্ত্তিককার ঐ ভাষ্যের আরও অধিক বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"সর্ব্বাসু বিদ্যাসু তত্ত্বজ্ঞানমস্তি নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চেতি। ত্রয্যাং তাবৎ কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? তত্ত্বজ্ঞানং তাবৎ অগ্নিহোত্রাদিসাধনানাং সাধ্যত্বাদিপরিজ্ঞানং অনুপহতত্বাদিপরিজ্ঞানঞ্চ। নিঃশ্রেয়সাধিগমোপি স্বর্গ-প্রাপ্তি। তথাহ্যত্র। স্বর্গঃফলং শ্রূয়তে। অথ বার্ত্তায়াং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? ভূম্যাদিপরিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং কৃষ্যাদ্যধিগমশ্চ নিঃশ্রেয়সমিতি তৎফলত্বাৎ। দণ্ডনীত্যাং কিং তত্ত্বজ্ঞানকেশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? সামদানদণ্ডভেদানাং যথাকালং যথাদেশং যথাশক্তি বিনিয়োগ স্তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পৃথিবীজয়াদি। ইহ তু অধ্যাত্মবিদ্যায়াং আত্মজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সমপবর্গ ইতি।"

নিঃশ্রেয়স শব্দের মোক্ষ অর্থ গ্রহণকালে অন্যান্য পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান কারণ কোটিতে পরিত্যক্ত হয়। কেন না, একমাত্র আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। নিঃশ্রেয়স শব্দের মঙ্গল সাধারণতার্থ গ্রহণকালে অন্যান্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সেই সেই প্রকারে উন্নয়ন করিতে হয়। কেননা, বিশেষ বিশেষ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ফল নির্দ্দিষ্ট আছে।

এইরূপ ত্রুটি আরও কতিপয় স্থানে লক্ষিত হয়, সে সকল পরিহৃত হইলে পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইতে পারে।

কাতন্ত্রব্যাকরণম্।

ভাবসেনত্রৈবিদ্যবিরচিতরূপমালা-প্রক্রিয়াসহিতম্।

ব্যাকরণমিদং বাঙ্গৈঃ পণ্ডিতৈঃ কলাপব্যাকরণমিত্যাখ্যায়তে। স্বীকুর্ব্বন্তি চাস্য ব্যাকরণস্যোৎকৃষ্টত্বং পণ্ডিতাঃ ক্রান্তি চাস্য হেতুরুৎকৃষ্টত্বে সারল্য-